যাত্রিদল

জগদীশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

মুদ্রক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ, ১৩৬৭

দাম : ৬.৫০

যিনি একদিন আলোক-বর্তিকা হস্তে বাঙলা দেশের

বহু সাধককে পথ দেখিয়েছিলেন—

সেই আজীবন-সংগ্রামী সাধক—

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

প্রণাম জানাই।

জগদীশ

ভূমিকা

লেখাটি অনেক দিন পূর্বে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পুস্তকাকারে কেন আত্মপ্রকাশ করেনি—সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ আলোচনা না করাই ভাল। লেখাটিতে ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসকে অবলম্বন করে কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে এবং যথাসম্ভব ইতিহাসের ধারাবাহিকতাও রক্ষা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নয়। নিজে কিছুটা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, আমাকে এই রচনার জন্য বহু প্রখ্যাত দেশকর্মীর সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীনিখিলরঞ্জন গুহ রায়, শ্রদ্ধেয় শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর নিকট এ জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী। উপন্যাসখানি ১৯৪৩ সালে ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বসে লেখা। জেলের হৈহল্লার ভিতরেও যাতে একটু স্থির হয়ে বসে লিখতে পারি সে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ফরিদপুর জেলার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শ্রীনরেশচন্দ্র বসু। আমার অন্যতম বন্ধু, সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় লেখাটি জেল থেকে অদ্ভুত উপায়ে বাইরে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনীকান্ত দাশ মহাশয় লেখাটি আগাগোড়া দেখে—এর ধারাবাহিকতার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। দেশ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক

শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকায় লেখাটি স্থান দিয়েছিলেন—ইঁহাদের সকলের নিকট আমার গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শ্রীগুরু লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীভুবনমোহন মজুমদার মহাশয়কে লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আমার পরম বন্ধু সুকবি শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস—যিনি পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছেন, তাঁকেও অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

চাকদহ—নদীয়া
১৫ই অগ্রহায়ণ
১৩৬৭

জগদীশচন্দ্র ঘোষ

প্রথম অধ্যায়

শেষরাত্রে মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া অসিত প্রশ্ন করিল—তারপর কি হলো মা? আত্রেয়ী ভাল করিয়া লেপখানি অসিতের গায়ে জড়াইয়া দিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—কিসের রে অসি?

—সেই যে মা, কাল বলেছিলে সিপাই আর ইংরেজদের যুদ্ধের কথা? তোমার ছোট কাকুর কথা।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—তুই দেখ্‌ছি ভুলিস নি অসি?

—ভুলবো কি মা, আমি যে কাল সারাটা দিন ধরে তোমার ছোটকাকুর কথাই ভেবেছি। আঃ, আমি যদি তখন এত বড়টি হতাম মা—আমি ঠিক বলছি তোমার ছোট কাকুর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ঘাড়ে করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম।

আত্রেয়ীর বুক মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে আবার বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন—তুই কেন যেতে যাবি অসি—সবতো শুনিস্‌নি—সে যে কি কষ্ট!

অসিত বলিল—এত কষ্টই যদি, তবে তোমার ছোট কাকু কেন গিয়েছিল? থাক তোমার বাজে কথা—এখন গল্প বলো মা।

আত্রেয়ী আরম্ভ করিলেন—সিপাইরা তখন ক্রমে ক্রমে পালাতে লাগ্‌লো। কতক দলে দলে বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। উদ্দেশ্য ছিল এমনি করে পালিয়ে নিজেরা আবার দলবদ্ধ হ'য়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে। আমার ছোট কাকুও এই দলে ছিলেন। মীরাট থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে এক জঙ্গলে গিয়ে নিলেন তাঁরা আশ্রয়। এদিকে কাকুর নাম ইংরেজদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়্‌লো।—বাবা ছিলেন ইংরেজের ফৌজের একজন ক্লার্ক, মীরাটে ছিল তাঁর বাসা—ইংরেজরা তাঁকে সন্দেহ করে

মীরাটের এক বাড়ীতে আমাদের সকলকে বন্দী করে রাখ্‌লো। আমি তখন মায়ের কোলে—বয়স মোটে এক বছর। তারপর পাহারাওয়ালাদের ঘুষ দিয়ে আমরা পালিয়ে এলাম কলকাতায়।

ছোট কাকু বনে জঙ্গলে কতদিন বেড়ালেন ঘুরে—কত দুঃখ পেলেন, কত কষ্ট পেলেন, কিছু কিছু তার লোকের মুখে জানা গিয়েছিল। হয়তো আসল দুঃখের কথাই কেউ জানতে পারেনি—দিনের পর দিন—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে অবশেষে ইংরেজ সৈন্যের বন্দুকের গুলিতে গেলেন তিনি মারা। কোথায় মারা গেলেন—তাও কেউ জানে না—তারপর কি হ'লো তারও কোন সাক্ষী নেই—হয়তো দেহ তাঁর বনে জঙ্গলে পড়েছিল—শিয়াল, শকুনে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল—কেউ তার খবর নেয়নি। বড় কাকু, মেজ কাকু কিন্তু তাঁর নাম মুখেও আনতেন না। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন মোটা মাইনের সরকারী চাকুরে—বাবা তাই সকলের আড়ালে কাঁদতেন। আমরা বড় হয়েও তাঁকে অমনি করে কতবার কাঁদতে দেখেছি। বলিতে বলিতে আত্রেয়ীর দুই চোখ দিয়া ফোঁটাকয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অসিত এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—তোমার ছোট কাকু যে সত্যি সত্যি মারা গেছেন তাই বা তোমায় কে বল্লে মা? সেই যে সেদিন তুমি পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প করেছিলে—যেখানে ইচ্ছে সে উড়ে যেতে পারতো, হয়তো তেমনি করে তোমার ছোটকাকু তাঁর সেই আরবী ঘোড়ায় চড়ে সারা দেশের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—মাথায় তাঁর আজও তেমন বাবরি চুল পাঁচ হাত লম্বা শরীর, আর সোনার মতন গায়ের রং, পিঠে আছে বন্দুক ঝোলান, কোমরে বাঁকা তলোয়ার, বনে জঙ্গলে যে সব সেপাই আজও লুকিয়ে আছে তাদের ডেকে ডেকে এক সঙ্গে করছেন—বলছেন, "ভয় নেই।" আমি যদি সত্যিই তখন বড় হতাম মা—ছোট্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে তোমার ছোট কাকুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতাম—কত বন, কত পাহাড়, কত পাহাড়ী ঝরণা—সেই ঝরণার পাশে তিনি আর আমি গাছের

ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতাম—কত সোনার রংএর হরিণ আসতো জল খেতে—আমি বন্দুক উঁচু করে গুড়ুম করে গুলি করতাম আর হরিণগুলো তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়তো।

আত্রেয়ী বলিলেন—ইস্, তুই কি নিষ্ঠুর, অসি? গুলি করে এমন সুন্দর হরিণগুলোকে মেরে ফেলতিস?

অসিত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তাইতো মা! হ্যাঁ, তবে আমি আর তোমার ছোট কাকু গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে হরিণগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম—তারা দলে দলে নেচে নেচে ছুটে বেড়াত—আমাদের দেখে একটুও ভয় করতো না। কেমন তাই না, মা?

মা হাসিয়া বলিলেন—হাঁরে তাই, এখন চুপ করে শুয়ে থাক—ফর্সা হ'য়ে গেছে—আমি এবার উঠি। বলিয়া আত্রেয়ী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন—অসিত তেমনি করিয়া লেপের তলায় গুঁটি শুটি মারিয়া চোখ বুজিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

বেলা তখন প্রহরখানেক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন—অসিত খাইয়া ইস্কুলে যাইবে। হঠাৎ বাহিরের দিকে কাহার চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। আত্রেয়ী বাহিরে আসিয়া দেখেন, বড় বাড়ির বিরজাদিদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরির হাত ধরিয়া তাহাদের বাহিরের উঠানে আসিয়া চেঁচাইতেছেন। কারণ বুঝিতে না পারিয়া আত্রেয়ী আগাইয়া যাইতেই বিরজাদিদি একেবারে মারমুখী হইয়া উঠিলেন—বলি, তোদের ব্যাপারখানা কি বলতো শুনি বউ?

আত্রেয়ী প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে দিদি?

বিরজাদিদি তেমনি চোখ পাকাইয়া হরিনাথকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—দেখ না তোর গুণধর ছেলের কীর্তি—ছেলেটার সারা গা একেবারে নখ দিয়ে আঁচড়ে একাকার করে দিয়েছে না!

আত্রেয়ী তাকাইয়া দেখিলেন—সত্যই হরিনাথের বুকে ও মুখে

কয়েক স্থানে কাটিয়া গিয়াছে। একটু দূরে আম বাগানের ধারে অসিত দাঁড়াইয়াছিল—সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন—আয় আগে আজ বাড়ি—তারপরে দেখে নেব—তোর বড় বাড় হয়েছে না?

বিরজাদিদি পুনরায় এক ঝট্‌কা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—ছেলেপেলে আর কুকুর নাই দিলে মাথায় ওঠে—তোদের আস্কারা না পেলে কি অমনি হয় না? আমাদের অমনি ছেলে হলে কবে কেটে কুচি কুচি করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিতাম—বলিয়া বিরজাদিদি পুনরায় হরিনাথের হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। শিবনাথ বোধ হয় রোগী দেখিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ বাড়ির বাহিরে বিরজাদিকে, স্ত্রী আত্রেয়ীকে এবং পুত্র অসিতকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া—একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। বিরজাদিদিকে প্রশ্ন করিতেই, তিনি আর এক দফা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়া এবং নিজের পুত্র হইলে অসিতকে কি কি শাস্তি দিতেন—তাহার তালিকা দিয়া দেহের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গি প্রকট করিয়া প্রস্থান করিলেন। শিবনাথ অসিতের নিকটে আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন—হরিকে মেরেছিস কেন রে? অসিত রাগে গজ গজ করিতেছিল। কোনক্রমে জবাব দিল—ও আমাকে আগে মারলে কেন?

শিবনাথ একহাত দিয়া তাহার কান ধরিয়া গালের উপর ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলেন, তারপর তাহাকে হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—আজ সারাদিন বাড়ী থেকে বেরুতে পারবি নে—সারাদিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকবি।

সেই হইতে এতক্ষণ অসিত ঘরের খুঁটীতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, শিবনাথ তেল মাখিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। আত্রেয়ী রান্না করিতেছিলেন, এখন বাহির হইয়া আসিয়া অসিতকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন—ছিঃ কাউকে কি মারতে আছে, বাবা! কেন শুধু শুধু হরিকে মারলি বলতো? অসিত স্নেহের স্পর্শ পাইয়া এবার একেবারে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া

ফেলিল—হাঁ, অমনি মেরেছি কিনা? এই দেখ না—আমার হাত ও আগে কেমন করে কামড়ে দিয়েছে? আত্রেয়ী অসিতের হাতখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন—সত্যই তো তিন চারটি দাঁত যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। অসিতকে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া খানিকটা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—কি হয়েছিল রে অসি?

অসিত চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—আমরা সেপাই যুদ্ধ খেলছিলাম মা।

আত্রেয়ী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—সে কি রে—সে আবার কি খেলা?

—কেন, সেপাই আর ইংরেজের যুদ্ধ। হরিরা ইংরেজ আর আমরা সেপাই। ওদের দলের সেনাপতি হলো হরি; আর আমি কি হয়েছিলাম জান মা? আমি হয়েছিলাম তোমার ছোট কাকু—শঙ্কর, পারবে কেন আমার সঙ্গে—হরিকে চিৎ করে ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে বসেছিলাম। ও তখন ঠকে গিয়ে আমার হাতখানা এমনি করে কামড়ে দিলে—আমিও তাই আঁচড়ে দিয়েছি।

আত্রেয়ী অবাক হইয়া পুত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন—ওসব নিয়ে খেলা করতে তোকে কে বলে দিলে, অসি? অসিত মায়ের মুখের প্রশ্ন কাড়িয়া লইয়া বলিল—খেলা করতে কেউ বলে দেয় নি। তবে একটা কথা শুনবে মা—তুমি তো ভোর বেলায় আমাকে বিছানায় রেখে চলে গেলে, আমি শুয়ে শুয়ে তোমার ছোট কাকুর কথাই কেবল ভাবছিলাম—ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম—তোমার সেই ছোট কাকু এসে আমায় ডাকছেন, অসিত! আমি উঠে দেখলাম মা, তিনি সত্যিই তোমার ছোট কাকু—মাথায় সেই লম্বা লম্বা চুল, লম্বা চেহারা—সোনার মত রঙ—কোমরে তাঁর বাঁকা তলোয়ার, পিঠে বন্দুক; আমাকে বললেন—সেপাই হবি অসিত? আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—হবো। তারপর তাঁর কোমরের তলোয়ার কাঁধের বন্দুক খুলে

আমার কোমরে আর কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি বললাম—আমার ঘোড়া কই দাদু ?

তিনি হেসে বললেন—ঘোড়া তো আজ আনি নি ভাই, বড় হ'লে পাবি।

আমি বললাম—তুমি কোথায় থাক দাদু ?

তিনি বললেন—অনেক দূরে হিমালয়ের চূড়ায়।

আমি বললাম—আমাকে তুমি নিয়ে চল দাদু, তোমার সাথে।

তিনি বললেন—আজ নয় ভাই, আগে বড় হ, তারপর আমার খোঁজ করিস, ডাকলেই এসে দেখা দেব। তারপর তোমার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অসিত এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই—এখন মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখে, তাঁহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

সে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল—কি হলো মা, কাঁদছো কেন ?

আত্রেয়ী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—কিচ্ছু হয়নি, বাবা, কিন্তু একটা কথা শুনবি অসি ?

অসিত বলিল—কেন শুনবো না মা—কোন্ কথা তোমার না শুনি বলতো ?

—আর কোন দিন আমার ছোট কাকুর কথা ভাববি নে বল, আর কোন দিন সেপাই যুদ্ধ খেলবি নে।

—সে কি মা, তোমার ছোট কাকু যে মস্ত বড় বীর—দাদু বলতেন, তাঁর বংশের গৌরব, সৎ ছেলে—তাঁকে ভাবলে দোষটা কি শুনি ?

—সে সব শুনে তোর কাজ নেই, অসি—তুই বল—আমাকে ছুঁয়ে বল—আর ভাববি নে তাঁদের কথা ? অসিত মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তুমি যদি ব্যথা পাও মা, তা হলে আর ভাববো না। আত্রেয়ী পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—অসি আমার লক্ষ্মী ছেলে! বেলা হলো—যা এখন স্নান করে আয়।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শিবনাথ প্রত্যহ পাশার

আড্ডায় গিয়া বসিতেন আর ফিরিতেন সন্ধ্যার পূর্বে, আজিও অন্যদিনের ন্যায় যথারীতি চাদরখানা গায়ে ফেলিয়া বাহির হইতেছিলেন—এমন সময় পুত্রের হাত ধরিয়া আত্রেয়ী ঘরে ঢুকিলেন।

—বলি তখন তো ছেলেকে মারলে—কিন্তু ওর হাতখানা একবার দেখতো, কামড়ে একেবারে রক্ত বের করে দিয়েছে যে!

—কিন্তু ও হতভাগা ওদের সঙ্গে মিশতে যায় কেন শুনি?

—বেশ ও আর ওদের সঙ্গে মিশতে যাবে না—কিন্তু ওকে রাধানগরের হাই ইস্কুলে ভর্তি করে দাও—তোমাদের বড় বাড়ির ইস্কুলে আর ও যাবে না।

শিবনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—কেন যাবে না শুনি?

—ও বড় বাড়ির জমিদারীর চাল আমার সহ্য হয় না বলে। যারা বাড়ি বয়ে এসে বিনা কারণে আমার ছেলেকে কেটে গাঙে ভাসিয়ে দিতে বলে—তাদের ইস্কুলে আমার ছেলেকে আমি যেতে দেব না, তাছাড়া ওখানে পড়াশুনোও কিছু হয় না।

—কে বল্লে, হয় না?

—আমিই বলছি—আর কে বলবে?

শিবনাথ তেমনি রাগিয়া বলিলেন—ছেলে যেমনি তোমার, তেমনি আমারও—লেখাপড়া হয় কি না হয়,—সে খেয়াল আমার আছে। কথায় কথায় আত্রেয়ীরও জেদ বাড়িয়া গিয়াছিল—তিনি তেমনি শক্ত হইয়াই জবাব করিলেন—তাই যদি থাকতো, তাহলে আর আমাদের কথা বলতে হতো না। লেখাপড়া করে আর কি হবে—বামুনের ছেলে ভিক্ষে করলে তো আর জাত যাবে না। না হয় রাজা জমিদার দেখে মো-সাহেবী করবে। কিন্তু কথাটি বলিয়া ফেলিয়াই আত্রেয়ী বুঝিতে পারিলেন—এ ভাল হইল না। শিবনাথ একেবারে রাগে চোখ পাকাইয়া উঠিলেন—বলিলেন—দিন দিন কথা তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে দেখছি—আমি ভিক্ষে করি—মো-সাহেবী করি? নিজের বিদ্যের গৌরবে তুমি আর

কিছুই চোখে দেখতে পাও না। কিন্তু অসি এই ইস্কুলেই পড়বে—লেখাপড়া হয় কি না হয়—সেও আজ থেকে আমিই দেখবো। বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। একটা কথাও না বলিয়া আত্রেয়ী কিছুক্ষণ সেখানেই নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শেষ বেলায় গৃহকর্ম সারিয়া আত্রেয়ী চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন। শিবনাথ সেই যে পাশার আড্ডায় গিয়াছিলেন—আর হয়তো সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিবেন না। বড় ছেলে অমিয় ছ'সাত মাইল দূরে তাহার পিসিমার বাড়ি থাকিয়া লেখাপড়া করে। বাড়িতে একমাত্র বৃদ্ধা শাশুড়ী—তিনি বাতের বেদনায় অচল হইয়া আজ ৪।৫ বৎসর ঘরে পড়িয়া আছেন। এক অসিতকে বুকে করিয়া আত্রেয়ীর দিন কোনক্রমে কাটিয়া যায়। অসিত যেন কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। আজ নানা কারণে আত্রেয়ীর মন ভাল ছিল না। স্বামীর সহিত ছোটখাট ব্যাপার লইয়া মনোমালিন্য—এতো তাহার নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু আজিকার কথা সম্পূর্ণ আলাদা—এতদিন নিজের মনের নিভৃত কোণে যে কাহিনী সঞ্চিত হইয়াছিল আজ হঠাৎ কোন অসতর্ক মুহূর্তে অসির কাছে তাহাই কতকটা গেল প্রকাশিত হইয়া। তবু যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে তাহার কতটুকু মাত্র এবং যেটুকু বলা হয় নাই—তাহার ছত্রে ছত্রে যে কত বড় দুঃখের ইতিহাস লুকান আছে—তাহার পরিমাপ কে করিবে? আত্রেয়ীর মনে পড়ে তাহার পিতার মৃত্যুশয্যার কথা। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না, পিতা তাহার একখানা হাত নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইয়া সমস্ত দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—আত্রেয়ী, যদি আমার পুত্র থাকতো মা, তা'হলে একথা তোকে বলতে হতো না—কিন্তু তোর যদি পুত্র হয় মা, তাকেই বলিস—সে যদি পারে এর প্রতিশোধ যেন নেয়। এ অনুরোধ আমার তোর উপরে রইলো মা, তোর অনাগত সন্তানের উপরে আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইল—তোর ছোট কাকুর আশীর্বাদ

রইলো মা—সে যেন মানুষ হয়—সে যেন সত্যিকারের বীর হয়ে জন্মগ্রহণ করে আর রইল তোর নির্যাতিতা জননীর আকুল প্রত্যাশা। আত্রেয়ী সেদিন চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। হয়তো সেই উত্তেজনার মুহূর্তে পিতার নিকটে সম্মতি দিয়াছিল—হয়তো দিয়াছিল না। কিন্তু সেদিন তো সে সন্তান কোলে পায় নাই—জননীর যে কি ব্যথা—সন্তান যে জননীর কত বড় অংশ তাহা বুঝিতে পারে নাই। অমিয় ছোটবেলা হইতে যেমনি রুগ্ন, তেমনি ভীরু—তাহাকে আত্রেয়ী অসিতের মতো এমনি করিয়া কখনও ভালবাসিতে পারে নাই। অমিয়ও বড় একটা মায়ের ধার ধারিত না—ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। কিন্তু যে কথা আজ সে তাহার এই পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের অন্তরের অন্তস্তলে গোপন করিয়া রাখিয়াছে—আজ পনর ষোল বৎসর ধরিয়া যাহা প্রতিদিন ভুলিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই খানিকটা আজ কেমন করিয়া তাহারই প্রাণাধিক পুত্রের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল? বাড়ির সম্মুখ দিয়া শীতের ক্ষীণস্রোতা চন্দনার স্বচ্ছধারা তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তাহারই পরপারে দূরপ্রসারী মাঠের প্রান্ত-সীমায় অস্পষ্ট বনানীর শ্যামচ্ছায়া কি এক গভীর মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আত্রেয়ীর চোখ বারে বারে জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পর কোথা হইতে অসিত ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল—ওমা—মাগো!

আত্রেয়ী ব্যগ্র বাহু মেলিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—কি বাবা?

অসিতের চপলতা এক মুহূর্তে একেবারে নিভিয়া গেল—ওকি তুমি কাঁদছো মা?

আত্রেয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কে বল্লে কাঁদছি আমি?

—ওই যে তোমার চোখে জল! কি হয়েছে মা?

আত্রেয়ী তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—কিছুই তো হয়নি বাবা!

আত্রেয়ী রান্না ঘরে পাকের যোগাড় করিতেছিলেন—শিবনাথ পিছন হইতে গিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত বউ! আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া জবাব দিল—কেন?

শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—তোমার কথাই ঠিক পণ্ডিত বউ, অসিতকে রাধানগরের ইস্কুলেই ভর্তি করে দেব।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন,—হঠাৎ যে মত বদলালো?

শিবনাথ বলিলেন,—আমিও আর ওদের বাড়ির পাশার আড্ডায় যাব না স্থির করেছি।

আত্রেয়ী উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কেন কিছু হয়েছে নাকি আজ? স্বামীর একটা রূপকে আত্রেয়ী খুব ভাল করিয়াই জানিতেন—সে তাঁহার তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। ইহার জন্য শিবনাথ যে তাঁহার জীবনে কত হারাইয়াছেন—সমস্ত গ্রামময় কত দুর্নাম কিনিয়াছেন, তাহা আত্রেয়ীর অজানা নয়। আজ আবার এমনি কিছু ঘটিল কিনা—এই ছিল তার আশঙ্কা। শিবনাথ আত্রেয়ীর প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া বলিলেন,—ওদের পুকুর উৎসর্গের সময় ওদের গোমস্তা নিধু মিত্তির বাবাকে কি একটা ঠাট্টা করেছিল, তারিণী সান্যালও সেখানে ছিল—কিন্তু নিধুকে একটা কথাও বলেনি, বরং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসেছিল। বাবা সেদিন প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবনে ওদের পুকুরের জল খাবেন না। ওদের বাড়ি অন্ন গ্রহণ করবেন না। নিজেদের আত্মীয় ওরা, এসব সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছিলেন।

আত্রেয়ী আগাইয়া আসিয়া শিবনাথের একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া বলিলেন—বল, কারো সঙ্গে ঝগড়া করনি?

—না ঝগড়া করিনি বউ, মনে করেছিলাম বাবার ঝগড়ার জের আর আমি টেনে নিয়ে বেড়াব না—কিন্তু এখন দেখছি তা ভুল—

অর্থের গৌরব ওদের—বংশের গৌরব ওদের—তা থেকে এক চুলও কমেনি। তারিণী সান্যালের ছেলেরা তারিণী সান্যালের জের এখনও টেনে চলছে—তা নিয়ে মানুষকে আঘাত দিতে ওরা আজও ছাড়ে না।

আত্রেয়ী বলিলেন,—বেশ, যেয়ো না। ও পাড়ায় গিয়ে পাশা খেলো—তারপর নিজের হাতের মুঠোয় শিবনাথের হাতখানি আরও খানিকটা শক্ত করিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, —কিন্তু বল আমার ওপর রাগ করনি! শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন, —রাগ আমি সত্যিই করি, কিন্তু আবার যেতেও বেশী সময় লাগে না, পণ্ডিত বউ।

—কিন্তু ও নাম কি তোমার মুখ থেকে যাবে না?

শিবনাথ তেমনি হসিয়াই বলিলেন,—অন্যায় তো কিছু নয়, মিথ্যেও তো নয়—তুমি পণ্ডিত বলেই তো সবাই তোমাকে পণ্ডিত বউ বলে ডাকে।

—যার যা খুশি বলুক, তুমি ডাকতে পারবে না?

—কেন?

—ওতে আমি ব্যথা পাই!

—সত্যি?

—হ্যাঁ!

—বেশ, আজ থেকে আর ডাকবো না।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন,—মনে থাকে যেন।

শিবনাথ বলিলেন,—থাকবে।

—এখন যাও অসি পড়তে বসেছে—ওর কাছে বসোগে।

শিবনাথ হাসিমুখে বাহির হইয়া গেলেন—আত্রেয়ী হৃষ্টমনে রান্নায় মন দিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্রেয়ীর পিতা ধরানাথেরা চার ভাই—ধরানাথ, হরনাথ, তারানাথ ও শঙ্করনাথ। জ্যেষ্ঠ ধরানাথ মীরাটের কমিশারিয়েটের হেড ক্লার্ক ছিলেন, হরনাথ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তারানাথ কলিকাতার সরকারী উকিল। শঙ্করনাথ কিন্তু লেখাপড়া বেশি না করিয়া খানিকটা বাংলা, ইংরাজী শিখিয়া বছর খানেক কোথাও উধাও হইয়া গিয়াছিল—অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আর তাহার উদ্দেশ মিলিল না। অবশেষে বৎসর খানেক পরে একদিন মীরাটে ধরানাথের বাসায় গিয়া হাজির হইল। ধরানাথ শঙ্করকে বড় ভালবাসিতেন—কাজেই শঙ্করের এই আকস্মিক আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এতদিন কোথায় ছিল—জিজ্ঞাসা করিলে হিমালয়ের নানা উপত্যকা, অধিত্যকা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানের নাম সে করিয়া যাইত। কেন গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে, জবাব দিত—নিজেদের দেশটা একটু ভাল করে দেখে এলাম। বস্তুত এই বলিষ্ঠ ও উন্নতদেহ যুবকটির ভিতরে যে একটি অত্যন্ত খাপছাড়া ভবঘুরে মন লুকাইয়া আছে, যাহাকে আর দশজনের সহিত একই সঙ্গে বিচার করিতে পারা যায় না—লাভ লোকসানের হিসাব করা যায় না—সে খবর ধরানাথের অজ্ঞাত ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্কর মীরাটে অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিল। সেপাই মহলে তাহার অত্যন্ত খাতির বাড়িয়া গেল—কখনও দেখা যাইত শঙ্কর গাছতলায় বসিয়া সুর করিয়া তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িয়া যাইতেছে। চার পাশে একান্ত মুগ্ধ শ্রোতার মত বেহারী সেপাইরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কখনও দেখা যাইত সে পাঞ্জাবী সেপাইদের দলে মিশিয়া তাহাদের হস্তরেখা বিচার করিয়া ভূত ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া সেপাইদের মধ্যে

মিশিয়া নানা ব্যাপার লইয়া তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিত। ইহারই বৎসর খানেক পরে হঠাৎ একদিন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সেপাইদের ভিতরে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সারা ভারতবর্ষময় সেপাইবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর হয়তো পূর্ব হইতে এই আগুনেরই ইন্ধন যোগাইতেছিল। এখন একেবারে তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ধরানাথেরও মনোভাবটা সেপাইদের অনুকূলেই ছিল এবং গোপনে অনেক সাহায্যও তিনি করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরে সেপাইরা ক্রমে ক্রমে হঠিয়া বনেজঙ্গলে আশ্রয় লইতে লাগিল। শঙ্করও মীরাট হইতে মাইল পঞ্চাশেক দূরে কোন জঙ্গলে অন্যান্য সেপাইদের সহিত আশ্রয় লইল। কিছুদিন পরে সেখানেই গোরা সৈন্যের গুলীতে তাহার মৃত্যু হয়। এদিকে ধরানাথকে সন্দেহ করিয়া মীরাটের এক বাড়িতে ধরানাথ, তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা আত্রেয়ীকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। ধরানাথের স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। ইহারই ৫।৬ দিন পরে একদিন জোর করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং পরের দিন রাস্তার পাশে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ধরানাথ নিতান্ত নিরুপায়ের মতো চোখের সম্মুখে সমস্তই দেখিলেন—কিন্তু কোনই প্রতিকার করিতে না পারিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো নিজের দেহে নিজেই ছোবল মারিয়া আক্রোশের বিষে জর্জরিত হইয়া মরিতেছিলেন। আত্রেয়ীর বয়স তখন এক বৎসর। ধরানাথ সমস্ত অপমান, সমস্ত আক্রোশ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সহ্য করিলেন। একদিন গভীর রাত্রিতে প্রহরীদের যথেষ্ট অর্থ ঘুষ দিয়া আত্রেয়ীকে বুকে করিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। মাস দুই নানা বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি আত্রেয়ীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া প্রকাশ করিলেন, তাঁহার স্ত্রীর পথে কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। অপমানের কাহিনী আপনার মনে গোপন করিয়া রাখিলেন। ভাইদের বাসায় কিন্তু তাঁহার মন টিঁকিল না। অবশেষে তিনি আত্রেয়ীকে লইয়া গ্রামের বাড়িতে

চলিয়া আসিলেন। নদীয়া জেলায় পদ্মার সন্নিকটে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন। শুধু বাসভবনই নয়—এখানে খুব ভাল আয়ের সম্পত্তিও ছিল। এই বাড়িতে ধরানাথের এক বিধবা ভগ্নী তাঁহার দুই পুত্রকন্যা লইয়া বাস করিতেছিলেন। বাড়ির এবং সম্পত্তির আয়ে তাঁহাদের সচ্ছলভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। ধরানাথের শরীর কিন্তু একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রাত্রি দিন তিনি ঘরে বন্ধ হইয়া থাকিতেন কাহারও সহিত মিশিতেন না কোথাও বাহির হইতেন না। প্রথম জীবনে ধরানাথ ব্রাহ্ম ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। কবি হেমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁহার খুল্লতাতের বন্ধু—এমনি করিয়া তৎকালীন সমস্ত সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল সমাজের সহিত তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তাই এই নির্জন বাসের কালেও তাঁহার নিকট এই সব সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুদের পুস্তকাবলী ডাকযোগে আসিয়া পৌছিত। শেষ বয়সে ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র খোরাক—রাত্রি দিন তিনি সাহিত্যালোচনা করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। আত্রেয়ীর সমস্ত শিক্ষার ভারও তিনি নিজের হাতে লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নানা বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এমনি করিয়া এখানে পনরটি বৎসর গেল তাঁহার কাটিয়া। ইতিমধ্যে আত্রেয়ী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলেন। হরনাথ কলিকাতায় একটি উচ্চশিক্ষিত পাত্রের সহিত বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ধরানাথ গেলেন বরকে আশীর্বাদ করিতে কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ পাইল ভাবী বর নাকি অত্যন্ত মদ্যপ। ধরানাথের শুচি মন এক মুহূর্তে একেবারে বেঁকিয়া দাঁড়াইল—সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া পরের ট্রেণেই বাড়ি রওনা হইলেন। পথে হঠাৎ শিবনাথের সহিত দেখা। শিবনাথের বয়স তখন ২৪।২৫ বৎসর। তিনি নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তখন নানাস্থানে ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ে ধরানাথ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন—বংশ এবং কুলেও মিলিয়া গেল—তিনি মনে মনে

ঠিক করিলেন—এই ছেলের সহিতই মেয়ের বিবাহ দিবেন। শিবনাথ কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানিতেন না—এদিকে কন্যাকে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে বাংলায়, ইংরাজীতে মোটামুটি শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখন সঙ্কল্প করিলেন—শিবনাথকে দুই এক বৎসর লেখাপড়া করাইয়া পরে কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের ধরিয়া ভাল একটা চাকুরীতে ঢুকাইয়া দিবেন। অভিভাবকহীন শিবনাথ সানন্দে ধরানাথের সহিত তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাস দুই পরে বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু ধরানাথের কোন ইচ্ছাই আর পূর্ণ হইল না। ইহারই মাস দুয়েক পরে একদিন অকস্মাৎ তিনি এ সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া গেলেন। ধরানাথের মৃত্যুর দিন দুই আগে যখন আর জীবনের কোন আশা নাই বুঝিতে পারিলেন, ধরানাথ আত্রেয়ীর একখানা হাত নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইয়া ডাকিলেন—আত্রেয়ী, মা!—আত্রেয়ী পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া জবাব দিলেন—কেন বাবা! ধরানাথ চাহিয়া দেখিলেন নিকটে আর কেউ নাই; বলিলেন—তোকে আজ একটা কথা বলবো মা। একথা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না মা। তারপর পিতার মুখে মীরাটে তাঁহার মাতার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কথা শুনিতে পাইলেন। কথা শেষ করিয়া ধরানাথ দুই চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন—আত্রেয়ী নিজেও কাঁদিতেছিলেন। খানিকটা শান্ত হইয়া ধরানাথ বলিলেন—আজও বলতাম না মা, যদি না বুঝতাম আমার আয়ু একেবারে শেষ হয়ে এসেছে। আজ তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল মা। আত্রেয়ী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—অনুরোধ কি বলছো বাবা? তুমি আদেশ কর!

—তা হলে আদেশই করি মা—আমার ছেলে থাকলে একথা তোকে আজ বলতে হতো না—মায়ের অপমানের প্রতিশোধ পুত্র অবশ্যই নিতো। আমি নিজে পারিনি মা—যদি তোর পুত্র হয় এ অপমানের সে যেন প্রতিশোধ নেয়। যার আদেশে এ অত্যাচার হয়েছিল, তাকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মা—কিন্তু

থাকবে তার জাতি—থাকবে তার বংশ। তোর পুত্রের উপর রইলো তার ভার। আত্রেয়ী সেদিন চোখের জলে স্বীকার করিয়াছিলেন—হাঁ বাবা নিশ্চয় বল্‌বো—যারা আমার মাকে এম্‌নি করে অপমান করে হত্যা করেছে—এর প্রতিশোধ নেব না? তুমি নিশ্চিন্ত হও—একথা জীবনে কোনদিন ভুলবো না। ইহারই দুইদিন পরে ধরানাথ দেহত্যাগ করিলেন। ধরানাথের মৃত্যুর পরে হরনাথ ও তারানাথের সহিত শিবনাথের বনিবনাও হইল না—তাই কিছুদিন পরে তিনি আত্রেয়ীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া পুনরায় ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর উত্তরবঙ্গের এক জমিদারের কোন তহশীলের তহশীলদারীর পদলাভ করেন এবং বাড়ী হইতে মাতাকে ও আত্রেয়ীকে নিজের কর্মস্থানে লইয়া যান। শিবনাথ অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন।

এইখানে আট-দশ বৎসর চাকুরী করিবার পর কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া ঠিক করিলেন—আর পরের গোলামী করিবেন না—দেশে গিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিবেন। তাহার পর হইতেই শিবনাথ দেশে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

আত্রেয়ী কিন্তু প্রথমাবধিই শিবনাথকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পিতা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন লইয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, অথচ শিবনাথ ভাল লেখাপড়া জানেন না। ইহাই ছিল ক্ষোভের মূল কারণ। তাছাড়া যখন এই দেশের বাড়ীতে তাঁহারা আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মন গ্রামের এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। শৈশবকাল হইতে যে গ্রামে তিনি কাটাইয়াছেন—তাহা ছিল তৎকালে বাংলা দেশের ভিতরে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রাম। শুধু গ্রামেই তো নয়—কলিকাতায় খুড়াদের বাসায়ও তিনি মাঝে মাঝে যাইয়া কিছুদিন বাস করিয়া আসিতেন—কাজেই তাঁহার সহর ঘেঁষা তৎকালীন খানিকটা আলোকপ্রাপ্ত মন—এই গ্রামে আসিয়া কোথাও মিলিতে পারিত না—কাহারও নিকট যে নিজের মনের কথা কহিবেন—এমন মেয়ে

একটিও নিজেদের পাড়ায় খুঁজিয়া পাইতেন না। স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনেও একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ছিল —তাহাই মাঝে মাঝে উলঙ্গ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত। নিজের স্ত্রী সুশিক্ষিতা অথচ নিজে ভাল লেখাপড়া করেন নাই।— এই দুর্বলতা তাঁহাকে অহরহঃ পীড়া দিত, তাই পত্নীর উপরে সময়ে অসময়ে হঠাৎ অকারণে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেন। যেখানে মেয়েরা নিজেদের নামটা পর্যন্ত লিখিতে জানিত না—স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অনেকেই অন্যায় বলিয়াই মনে করিত—সেখানে আত্রেয়ীর মতো মেয়ের স্থান হইবে কেমন করিয়া। তাই গ্রামের মেয়ে পুরুষেরা আত্রেয়ীকে "পণ্ডিত বউ" বলিয়া, "চেয়ারে বসা বউ" বলিয়া ঠাট্টা করিত। শিবনাথ নিজেও কখনও কখনও তাঁহাকে পণ্ডিত বউ বলিয়া শ্লেষ করিতে ছাড়িতেন না। পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় আত্রেয়ী পিতার সমস্ত পুস্তক নিজের সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় গ্রামে আসিবার সময়ও পুস্তকগুলি তেমনি যত্ন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এই পুস্তকগুলিই ছিল তাঁহার অবসরের সঙ্গী। রঙ্গলালের, হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, মধুসূদনের কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। দীনবন্ধুর নীল দর্পণ বন্ধ করিয়া তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য বলিয়া যাইতেন এমনি তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল। স্বামীর কর্মস্থানে একটু অধিক বয়সেই তাঁহার প্রথম সন্তান অমিয় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই সন্তানকে তিনি খুব আপনার করিয়া পান নাই। শাশুড়ী অতি শৈশবেই অমিয়ের সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করেন—তা ছাড়া জন্মাবধি অমিয় এত রুগ্ন ও ভীরু যে আত্রেয়ী তাহার উপরে ভবিষ্যতের কোন ভরসাই রাখিতেন না। তারপর আসিল—অসিত। প্রথমাবধিই এই অসিত মায়ের কোল ও অন্তর একেবারে অধিকার করিয়া বসিল। অসিত জন্মিবার পর তাঁহার আর কোন সন্তনাদিও জন্মে নাই। অসিত হইল মায়ের একমাত্র সঙ্গী। মায়ের সমস্ত কর্ম ও চিন্তার সাথী। এমনি করিয়া সুখে-দুঃখে আত্রেয়ীর দিন কাটিতেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ইহারই মাস কয়েক পরে একদিন আত্রেয়ী রান্না চড়াইয়া বসিয়া কুট্‌নো কুটিতেছিলেন। অসিত কোথা হইতে আসিয়া পাশে বসিয়া বলিল—পলাশীর যুদ্ধ আজ শেষ করে বল, মা। ক্লাইভের সৈন্য এসে আমবাগানে ঢুকলো,—তারপর? আত্রেয়ী জবাব দিলেন—এখন থাক অসি—সে কি আর অল্প সময়ের কাজ—অনেকক্ষণ ধরে বলতে হবে।

—বেশ তো অনেকক্ষণ ধরেই বল না, মা—আজ তো আর আমার ইস্কুল নাই—বেলা ১২টা পর্যন্ত বসে বসে শুনবো। আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা কাল যে "পলাশীর যুদ্ধ" থেকে কবিতা বলেছি—তার যদি কিছুটা মুখস্থ বলতে পারিস তবে বলবো।

অসিত হাসিয়া বলিল—সে আমি খুব পারবো মা—তুমি শোন—একবার শুনলেই আমার মনে থাকে।

"বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।"

আত্রেয়ী বলিলেন—তারপর?

—বারে অত কি না পড়লে মনে থাকে—একবার তো কেবল তোমার মুখ থেকে শুধু শুনেছি।

আত্রেয়ী মনে মনে খুশি হইয়া বলিলেন—বেশ, বলছি শোন—তারপর নবাব সৈন্যে আর ইংরাজ সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা গোলা এসে লাগলো মীরমদনের পায়ে, সঙ্গে সঙ্গে মীরমদন পড়লো রণস্থলে। নবাব সৈন্য তাই দেখে ভয়ে পালাতে লাগলো আর ইংরেজ সৈন্যেরা করতে লাগলো হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। এমন সময় রুখে দাঁড়ালেন মোহনলাল। তিনি নবাব সৈন্যদের ডেকে বলতে লাগলেন—

—"দাঁড়ারে! দাঁড়ারে ফিরে! দাঁড়ারে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ
যদি ভঙ্গ দেও রণ
গর্জিল মোহনলাল—নিকট শমন!"

সৈন্যরা তাঁর কথা শুনে ফিরে দাঁড়ালো বটে কিন্তু প্রধান সেনাপতি মীরজাফর একপাশে নিজের সৈন্য নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মোহনলাল তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—

—"সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক্ তোমারে
কেমনে বলনা হায়—
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়—
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?"

কিন্তু মীরজাফর কোন কথা শুনলো না—তার ছিল রাজ্যের লোভ, গোপন ষড়যন্ত্র সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। মোহনলাল কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না—নিজেই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন রণক্ষেত্রে। কিছুক্ষণ ইংরেজ সৈন্যে আর নবাব সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগলো—হঠাৎ মীরজাফরের আদেশ এলো—

"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ
কর অস্ত্র সম্বরণ
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

নবাবের অনুমতি মিথ্যা কথা—সব মীরজাফরের ষড়যন্ত্র। মোহনলাল দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন—কি আর করবেন—প্রধান সেনাপতির যখন এই কাণ্ড—তখন আর কোন আশা নাই! আশা ভঙ্গে তিনি রণক্ষেত্রে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। নবাবের সৈন্যরা সব পালাতে লাগলো, ইংরেজ সৈন্যেরা তাদের পিছন থেকে সঙ্গীনের খোঁচা দিয়ে—গুলী করে মারতে লাগলো! পলাশীর যুদ্ধ হলো শেষ! মোহনলালের সন্ধ্যার পূর্বে যখন মূর্ছা ভাঙ্গলো—তখনও তিনি রণক্ষেত্রে পড়েছিলেন। রণক্ষেত্রের অবস্থা দেখে, তাঁর শোক উথলে

উঠলো। তিনি অস্তগামী সূর্যের পানে চেয়ে খেদ করে বলতে লাগলেন—

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে—দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারত ভাগ্যে বিষাদ রজনী।"

অসিত প্রশ্ন করিল—ইংরাজদের দেশে টাকা নাই, না মা?

আত্রেয়ী বলিলেন—কেনরে, টাকা থাকবে না কেন?

—তাই যদি থাকবে, তাহ'লে এত দূরে—একমাস ধরে জাহাজে চড়ে নিজেদের সব আপনার জন ছেড়ে কেউ আসে?

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—শুধু টাকা থাকলেই কি হলো অসি? আচ্ছা মনে করো আমাদের ঘরে যদি সিন্ধুক ভরা টাকা থাকে—আর সেই টাকা দিয়ে যদি এক মুঠো চাল ডাল কিনতে না পাওয়া যায়—তবে সে টাকা থাকায় লাভ কি?

—বারে টাকা দিয়েই তো চাল, ডাল কিনতে পাওয়া যায়—চাল থাকবে না কেন?

—আচ্ছা যদি ক্ষেতে ধান না হয়, ডাল না হয়—মানুষ কি টাকা খেয়ে বাঁচে?

—তা বাঁচবে কেন?

—ইংরাজদের দেশেও খাবার হয় না—মোটে দুই মাসের খাবার হয় আর দশ মাসের খাবার তারা এখান থেকে নিয়ে যায়। সাধ করে কি আর কেউ বিদেশে পড়ে থাকে বাবা!

—কিন্তু মা, আমাদের দেশের লোকও যে—সবাই খেতে পায় না—আমাদের করিম সেখের বাড়ীতে যে এক একদিন চালের অভাবে রান্না হয় না। সে দিন ওদের বাড়িতে টক্ কুল খেতে গিয়েছিলাম, দেখি যে করিমের ছোট ছেলেটি ধুলোয় পড়ে পড়ে কাঁদছে—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কাঁদছিস কেন ফেলা?

ফেলা বল্লে—আজ কিছু খাই নাই—বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

তারপর অসিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমি কি করেছিলাম জান মা ?

আত্রেয়ী বলিল—কি করেছিলি রে ?

—বল আমাকে বকবে না ?

—না রে বকবো কেন ? তুই বল না ?

—সেই যে সেদিন আমাকে দুটি পয়সা দিয়েছিলে না—বাজারে গিয়ে ফেলাকে সেই দুই পয়সার মুড়ি বাতাসা কিনে দিয়েছিলাম।

আত্রেয়ী পুত্রের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—সত্যি অসি ? বেশ করেছিস্ বাবা! এই তো মানুষের মতো কাজ! বড় হয়ে যখন টাকা রোজগার করবি তখন এমনি করে মানুষের দুঃখ দূর করবি বাবা। অসিত লজ্জায় মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল।

—গত বছর দেখিস নি অসি, দক্ষিণ দেশে বন্যা হয়ে সব ধান জলে ডুবে গিয়েছিল। দলে দলে কত লোক ছেলে মেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করতে আসতো আমাদের দেশে। আমাদের দেশে কত লোক যে রোজ রোজ না খেয়ে থাকে—তার হিসেব তো কেউ রাখে না অসি—রাখলে বোঝা যেত দেশের কি সাংঘাতিক অবস্থা!

—তা হলে আমরা আমাদের খাবার ইংরেজদের দেব কেন মা!

—লেখাপড়া কর—বড় হ'লে বুঝতে পারবি বাবা!

সেদিন পৌষ পার্বণ—আত্রেয়ী সন্ধ্যার পূর্বে পরিষ্কার নিকানো উঠানে বসিয়া আলপনা দিতেছিলেন তাঁহার পাশে বসিয়া একটি আট-নয় বৎসরের মেয়ে অনর্গল ছড়া বলিয়া যাইতেছিল।

আত্রেয়ী বলিলেন—এটা কি এঁকেছি বলতো কল্যাণী ? কল্যাণী তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—কই দেখি, হাত সরাও তো কাকীমা। ও ঠিক বুঝেছি—বলবো ? পদ্মফুল। আর এটা কি কাকীমা ?

আত্রেয়ী বলিলেন—ওটা পদ্মপাতা।

—আমাকে একটু পিটুলী দাও না কাকীমা—আমি পদ্মফুল

আঁকবো। আত্রেয়ী পিটুলী ভিজানো একটু ন্যাকড়া মেয়েটির হাতে দিয়া এক পাশে একটি স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—এইখানে আঁক দেখি। কল্যাণী খড়ির ন্যাকড়া হাতে নিয়া পদ্মফুল আঁকিতে বসিয়া গেল।

—ও কি তুমি অমনি করে তাকিয়ে রইলে কেন কাকীমা—অমনি করে তাকিয়ে থাকলে বুঝি পদ্মফুল আঁকা হয়!

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা; বেশ আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম—তুই আঁক। বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের আলপনায় পুনরায় মন দিলেন।

খানিকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন—কেমন হ'লো রে কল্যাণী? কল্যাণীর অবস্থা একেবারে কাহিল হইয়া উঠিয়াছিল। এতক্ষণ সে শুধু হিজিবিজি দাগই কাটিয়া গিয়াছে—পদ্মফুলের একটা পাপ্ড়িও যখন ফুটিয়া উঠিল না—তখন অগত্যা দুই হাত দিয়া সমস্ত লেপিয়া মুছিয়া একাকার করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ইস্ তাই হয় নাকি—আমি তোমাকে আমার শ্লেটে খুব ভাল করে পদ্মফুল এঁকে দেব, কাকীমা। আত্রেয়ী তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন—কই কি এঁকেছিস্ দেখি!—না আমি কিছু আঁকি নি—এই দেখ না। এমন সময় কল্যাণীর মা কাত্যায়ণী দেবী উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—তোদের কি হ'চ্ছে অসির মা?

—এই দিদি মেয়ে পদ্মফুল এঁকেছে দেখবে এসো।

—না মা, কাকীমার মিথ্যে কথা—কিচ্ছু আঁকি নি।

কাত্যায়ণী দেবী মেয়েকে একটি ধমক দিয়া বলিলেন—মর্ পোড়ারমুখী—কাকীমা মিথ্যে কথা বলে আর তুমি খুব সত্যিবাদী না? কল্যাণী ধমক খাইয়া মুখ ভার করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আত্রেয়ী তাহাকে নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া আনিয়া চুমু খাইয়া বলিলেন—আর একটু বড় হ'—তারপর তোকে আমি সব শিখিয়ে দেবো মা—কেউ যাতে তোর এতটুকু নিন্দে না করতে পারে।

কাত্যায়নী বলিলেন—কিন্তু মেয়ের অভিমানটা যদি একটু কমিয়ে দিতে পার অসির মা—তবে তো বুঝি তোমার বিছের দৌড়। সত্যি ভাই, ওকে আমার ভারী ভয় করে—অমন কথায় কথায় অভিমান করলে—যে ঘরেই পড়ুক, কোন ঘরেই তো সুখ পাবে না।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—ও খুব ভাল ঘরে পরবে দিদি তোমরা ভেব না। আর অভিমানের কথা যদি বল—কি এমন অভিমান দেখলে শুনি? মেয়ে তোমার বটে, কিন্তু সারাটা দিন তো থাকে আমারই কাছে—কাজেই আমি ওকে তোমাদের চেয়ে বড় কম জানি না দিদি।

—সে কথা তোর ভাসুরও সেদিন বলেছিল ভাই! ওকে আমরা সত্যি করেই তোর হাতে দিলাম—তুই তোদের মতো করে গড়ে নিস ভাই।

আত্রেয়ী বলিলেন—বিধাতা যদি তাই লিখে থাকেন দিদি, তুমি জেনো আমি তাতে বাধা হ'বো না—খুশিই হবো। কল্যাণী এতক্ষণ আত্রেয়ীর কোলের মধ্যেই বসিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা কাকীমা? মেয়ের কথা শুনিয়া কাত্যায়নী হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

আত্রেয়ী বলিলেন—তোকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাব, আলপনা শেখাব, রান্না শেখাব, খুব ভাল গিন্নি করে তুলবো—সেই কথা। কেমন মন দিয়ে শিখবি তো মা? কল্যাণী মাথা নাড়িয়া জানাইল—হাঁ তুমি শিখিয়ে দিও। আত্রেয়ী পুনরায় তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন —দেব বই কি মা—খুব ভাল করে শিখিয়ে দেবো।

কল্যাণীর পিতা যদুনাথ মৈত্র আজ ৩।৪ বৎসর নানা অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া আছেন। তিনটি কন্যার মধ্যে বড় দুইটিকে ইতিমধ্যে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। এখন একমাত্র কন্যা কল্যাণীকে লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে দিন কাটাইতেছেন। পাশাপাশি বাড়ি বলিয়া দুই পরিবারের মধ্যে বেশ প্রীতির ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। আত্রেয়ীও সদাসর্বদা কল্যাণীকে নিজের কাছে ডাকিয়া

লইতেন এবং মেয়েটিকে সত্যসত্যই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বস্তুতঃ কল্যাণীকে কেন্দ্র করিয়াই ইদানীং এই দুই পরিবারের সদ্ভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরের দিন সকালবেলা কল্যাণী অসিতকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখে, সে খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া টক্ কুল চিবাইতেছে। দুই দিন হইল সে জ্বর হইতে উঠিয়াছে—ইহারই মধ্যে যে টক্ কুল খাওয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ তাহা কল্যাণী জানিত।

সে বলিল—ওকি এরই মধ্যে কুল খাচ্ছ যে বড়—আবার যদি জ্বর হয়। অসি তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া বলিল— বেশ খাব তোর কি ?

—বলে দেব কাকীমাকে—দেখবে ?

অসি আর একটি কুল মুখে পুরিয়া জবাব দিল—বয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী চেঁচাইয়া উঠিল—ও কাকীমা, দেখ অসিদা টক্ কুল খাচ্ছে। আত্রেয়ী দেবী ঘরে ঢুকিতেছিলেন দেখিতে পাইয়া—অসি একলাফে কল্যাণীর নিকটে আসিয়া তাহার পিঠে দুম্ করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী কাঁদিবার উপক্রম করিতেই আত্রেয়ী তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া শান্ত করিয়া বলিলেন—ওকে আজ মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব—তুই দেখিস কল্যাণী। লক্ষ্মীছাড়ার এত বড় সাহস যে তোর গায়ে হাত তোলে! আত্রেয়ী কল্যাণীকে রান্না ঘরে লইয়া গিয়া নিজের হাতে ভাত মাখিয়া আহার করাইতে করাইতে প্রশ্ন করিলেন—অসি তোকে একটুকুও ভালবাসে না—নারে কল্যাণী!

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া বলিল—না কাকীমা একটুকুও ভালবাসে না। কি ভাবিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কিন্তু অসিদা আমাকে কুল পেড়ে দেয় যে—তিলে মট্‌কা কিনে এনে দেয় যে!

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—তবে বুঝি ভালবাসে—কেমন রে ?

কল্যাণী পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁ, কাকীমা।

—কিন্তু তোকে মারে যে!

—মারুক গে!

আত্রেয়ী সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—এখনও ওর বুদ্ধি হয় নাই কি না—তাই মারে—বড় হ'লে আর মারবে না—দেখিস তোকে খুব ভালবাসবে। তুইও অসিকে ভালবাসবি তো?

—হাঁ ভালই তো বাসি কাকীমা!

আত্রেয়ী আর কথাটি না কহিয়া মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সাত বৎসর পরের কথা। এই নশ্বর পৃথিবীতে সময়ের পরিমাপে সাতটি বৎসর কত না ক্ষুদ্র—কত না বৃহৎ। এই সাত বৎসরে আকাশের রঙ একটুও বদলায় নাই—বাতাস তেমনি বহিতেছে—সূর্য তাপ দিতেছে—গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম, শীতকালে শীত পূর্বের মতই অনুভূত হইতেছে। এই সাত বৎসরে অরণ্যানী তাহার গাত্র হইতে সাতবার জীর্ণপত্র ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, সাতবার কিশলয়ের জন্ম দিয়া একইভাবে অরণ্যকে শ্যামশ্রীতে ভরিয়া দিয়াছে। কিন্তু মানুষের জীবনে এই সাতটি বৎসর যে কত বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যাতীত। এই সাতটি বৎসরের প্রভাবে অসিত আজ একুশ বৎসরের যুবক—রঙীন নেশার স্বপ্ন তাহাকে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কল্যাণীর বয়স ষোল—কামদেব যেন তাহাকে—

"পুষ্পধনু, পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি।"

ইহার অধিক আর তাহার রূপের বর্ণনা কিই বা বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে? আবার এই সাতটি বৎসরের মধ্যেই অসিতের ঠাকুরমা পরলোকগমন করিয়াছেন—শিবনাথও অকালেই ইহধাম ছাড়িয়াছেন। ও-বাড়িতে কল্যাণীর পিতাও আর বাঁচিয়া নাই। অমিয় বিবাহ করিয়াছে। কলিকাতায় ভাল চাকুরী পাইয়া বাড়িভাড়া করিয়া বাস করিতেছে। আত্রেয়ী সুখে-দুঃখে সংসারের সমস্ত ভার বহিয়া চলিয়াছেন। অসিত বৃত্তি পাইয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দাদার বাসায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে। এমনি করিয়া নানা দুঃখে, নানা সুখে এই সাতটি বৎসরে এই দুই পরিবারের কত না পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

সন ১৯০৪ সাল। সেদিন মাঘ মাসের কি একটা তারিখে অপরাহ্ণ বেলায় কলিকাতার মীর্জাপুর পার্কে এক বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছে। সমস্ত বাঙলা দেশ বঙ্গভঙ্গের জন্য একেবারে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই সভা জাতির সম্মিলিত শক্তির প্রথম প্রতিবাদ সভা। দীর্ঘকাল ধরিয়া দিনের পর দিন বিদেশী প্রভুর প্রতি জাতির যে আসক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল—এবার তাহাতে এই সর্বপ্রথম ধাক্কা লাগিল। এই সভা তাহারই অভিব্যক্তি। সভার সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল বেলা তিনটায় কিন্তু তাহার বহু পূর্ব হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া পার্কটি একেবারে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে—মাঠের ভিতরে আর তিল ধারণের স্থান নাই। ইহারই এক পাশে অসিত ও তাহার বন্ধুবান্ধব মিলিয়া ৩০।৪০ জন একেবারে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্। অসিত ও তাহার বন্ধুরাও জনতার সহিত গলা মিলাইয়া দিল। সে এক অদ্ভুত উন্মাদনা! এই যে ধ্বনি যাহা এতদিন উপন্যাসের পাতার ভিতরে আবদ্ধ ছিল—তাহা যে এমনি করিয়া জাতির কণ্ঠে এমন বজ্র কঠিন ভাবে ধ্বনিত হইতে পারে—তাহা কে জানিত? ইহা তো শুধুই দেশমাতার বন্দনা নয় ইহা জাতির সম্মিলিত আত্মশক্তির প্রকাশও বটে।—কেমন করিয়া

আমরা পরাধীন হইলাম। পরাধীনতার জ্বালা কি, ইংরাজরা কি চায়? বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য কি—এই সব জ্বালাময়ী ভাষায় একজন সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন। অসিত একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার কানে সেই বজ্রবাণী অগ্নিমন্ত্রের মতো আসিয়া বিঁধিতেছিল।

হঠাৎ পিছনের দিকে ভীষণ হট্টগোল আরম্ভ হইতেই ফিরিয়া দেখে—দেশী ও বিদেশী পুলিশ তাহাদের চারি পাশ একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। গোরা সার্জেন্টরা বেপরোয়াভাবে যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই বেটনের সাহায্যে পিটাইতেছে। অসিতের পিঠের উপরেও একটি বেটনের আঘাত আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল—এই শালা—হটো। অসিতের সমস্ত সংযমের বাঁধ এক মুহূর্তে একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল, সে কোন চিন্তা না করিয়া বেপরোয়া হইয়া ঘুঁষি চালাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও বেপরোয়া হইয়া উঠিল। মাঠ ততক্ষণ একেবারে জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে—বক্তৃতাও থামিয়া গিয়াছে। এদিকে মার খাইয়া পুলিস বাহিনী অনেকটা হটিয়া গিয়াছে। অসিত ছিল দলের সর্দার। সে বুঝিল পুলিস এ অপমান হয়তো সহ্য করিবে না—এখনই হয়তো আরও পুলিসবাহিনী আসিয়া হাজির হইবে। সুতরাং সরিয়া পড়াই ভাল। ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া যে, যে দিকে পারিল, সরিয়া পড়িল। পাশের গলির ভিতরে খানিকটা দূরে অখিলদের বাসা। সে আর অসিত গলির ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। এতক্ষণ অখিল অসিতের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ করিতে পারে নাই। এখন একটা আলোর নিকটে আসিতেই দেখিল—অসিতের মাথার এককোণ বাহিয়া রক্ত ঝরিয়া একেবারে তাহার জামা-কাপড় ভিজাইয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজেদের বাসায় ঢুকিয়া অসিতের ক্ষত স্থান বাঁধিয়া জামা-কাপড় বদলাইয়া যখন বিদায় দিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

ইহারই কয়েকদিন পরে অসিত হঠাৎ তাহার কয়েকখানা

জামা-কাপড় গোছাইয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার দাদা অমিয় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—এখন হঠাৎ তোর বাড়িতে কি দরকার পড়লো অসি ?

অসিত হাসিয়া বলিল—আমি আন্দোলনে যোগ দিলাম, দাদা।

অমিয় ততোধিক বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন—কিসের আন্দোলন রে ?

—স্বদেশী আন্দোলন—বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন।

অমিয় সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া একান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তোর কলেজ ?

—যতদিন বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত না হয়, ততদিন আর কলেজে যাব না দাদা।

অমিয় উত্তরোত্তর ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন—পাগলামো করিস নে অসি ! এমনি করে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করলে ভবিষ্যতের যে কোন আশাই আর থাকবে না। অসিত পুনরায় হাসিয়া জবাব দিল—হাজার হাজার ছেলে যে ইস্কুল, কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে, দাদা —ভবিষ্যতের ভাবনা তো কেউ ভাবে নাই—আমিই কি শুধু একা ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়ে থাকবো ? আমি মনস্থির করেছি দাদা—যতদিন আন্দোলন সফল না হয়, ততদিন পড়বো না। কথা শেষ করিয়া অসিত বাহির হইয়া গেল। অমিয় একা একা বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। অমিয় ভীতু মানুষ, গণ্ডগোল হৈ চৈ দেখিলে তিনি ভয় পান—হয়তো কোন্ ফাঁকে কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়া গিয়া কোন্ অনাসৃষ্টির জালে তাহাকে জড়াইয়া ফেলিয়া একেবারে নাজেহাল করিয়া দিবে। ইহার ভয়ে তিনি সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। তাই কোনপ্রকার হৈচৈ-এর ধার দিয়াও তিনি ঘেঁষিতেন না। নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষের মতো আফিসে যাইবেন—কলম পিশিবেন, মাসান্তে বেতনের টাকা কয়টি হাত পাতিয়া লইয়া নিজের স্ত্রী-পুত্র লইয়া নিশ্চিন্ত শান্তিতে দিন কাটাইয়া দিবেন। ইহার বেশী কামনাও করেন না—ভাবিতেও পারেন না। অসিতকে সত্যই তিনি

ভালবাসিতেন—তাহাকে লইয়া মনে মনে ভবিষ্যতের অনেক সুখ স্বপ্ন দেখিতেন—ভাই তাঁহার শিক্ষায়-দীক্ষায় অনন্যসাধারণ হইবে, সে দশজনকে ছাড়াইয়া যাইবে। অর্থে, মান-মর্যাদায় নিজেদের পরিবার, সভ্য-ভব্য সমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে—ভ্রাতৃপ্রেমে, বংশগৌরবে—তাহার বুক উঠিবে ফুলিয়া। আর, আজ একি উদ্ভট খেয়াল আসিল অসিতের মাথায়? সে কলেজ ছাড়িবে—স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবে—সরকারের বিরাগ ভাজন হইবে, ইহা যে কল্পনাও করিতে পারেন না তিনি। অমিয় কোনদিন কাহাকেও জোর করিয়া হুকুম করিয়া কিছু বলিতে শিখেন নাই, শৈশব হইতে আজ পর্যন্ত পরের হুকুমই প্রতিপালন করিয়াছেন —প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আজ যে নিজের ছোট ভাই অসিতের উপরে জোর করিবেন,—তাহার সঙ্কল্পে বাধা দিবেন —এমন শক্তিও তাঁহার নাই। তাই একান্ত নিরুপায়ের মতো— ব্যাপারটি মনে মনে ভাবিয়া বারে বারে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা—অসিত বই ও কাপড়ের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি পৌঁছিয়া ডাকিল—মা, আমি এসেছি।

আত্রেয়ী দেবী ঘরের ভিতরে ছিলেন—তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইতে বলিলেন—কে, অসি?

—হ্যাঁ মা।

—এমন অসময়ে যে বাবা?

অসিত ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া বলিল—অমনি এলাম মা।

—বাসার সকলে ভাল আছে তো বাবা?

অসিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ মা।

রাত্রে অসিত আহারে বসিলে আত্রেয়ী কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোর কলেজ কি বন্ধ রে অসি?

অসিত আহার হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—না, মা, কলেজ তো চলছে।

—তবে যে এমন অসময়ে এলি বাবা ?

অসিত এবার মুখ তুলিয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল—কলেজ আপাতত আমি ছেড়ে দিলাম মা !

অসিতের কথার কোন অর্থই বুঝিতে না পারিয়া আত্রেয়ী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—সে কি রে !

—স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, শুনেছ মা ?

আত্রেয়ী বলিলেন—সেদিন রায়পুরের ইস্কুলের ছেলেরা সব শোভাযাত্রা করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করতে করতে নদীর ওপারের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তা'ছাড়া তো কিছু জানি নে বাবা ? তোর ওবাড়ির দাদা বলছিলো যে, বড় বড় শহরে নাকি স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। বিলিতি নুন আর কাপড় তারা কাউকে কিনতে দেবে না।

অসিত হাসিয়া বলিল—তাই মা, তাই। লর্ড কুর্জন বাঙলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এর অর্থ কি জান মা ? বাঙালীরা লেখাপড়া শিখেছে—তারা বুঝতে পারছে—দেশকে চিরকাল এমন করে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে—একতাবদ্ধ হতে হবে ; কিন্তু বিদেশী রাজা তো তা চায় না। তাদের ভয়—সমস্ত বাঙালী যদি আজ একসঙ্গে মিলতে পারে, তাহলে তাদের সম্মিলিত চিন্তাধারা সমস্ত ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তাদের পক্ষে শুভ হবে না মা—তা তারা বোঝে। এদেশ যত অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে থাকবে—যত ভেদাভেদ থাকবে, তত তাদের সুবিধে। তাই পূর্ব বাঙলা আর পশ্চিম বাঙলাকে দুই ভাগ করে সমস্ত বাঙালী জাতকে তারা বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না মা ! কলকাতায় কত বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক আজ এই আন্দোলনে নেমেছেন—হাজার হাজার ছাত্র পড়া ছেড়ে গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে পড়েছে। ইংরেজ যেমন বাঙলা দেশকে বিভক্ত করেছে, তেমনি আমরাও তার ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করে তুলবো—তার কাপড়

কিনবো না, লবণ কিনবো না। তুমি সুরেন ব্যানার্জীর নাম শুনেছো মা, বিপিন পালের ?

আত্রেয়ী বলিলেন—না রে, কেমন করে শুনবো ?

—তাঁরা যে কি চমৎকার বক্তৃতা দেন মা—যদি শুনতে পেতে ? ওঃ কথায় যেন আগুনের ফুলকি ছুটতে থাকে—শিরায় শিরায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

পরে আত্রেয়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল—কিন্তু তুমি যে একটি কথাও না বলে একেবারে চুপ করে বসে আছ মা ?

—কিন্তু আমি ভাবছি বাবা, এতে যে ভবিষ্যতের সকল আশাই একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

অসিত এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—ভবিষ্যতের কথা তো আজ ভাবলে চলবে না মা ? যখন ভাল করে পড়তে শিখিনি, তখন থেকেই তো তোমার মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করেছি—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়—
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়।"

রাণা প্রতাপের স্বদেশ রক্ষার কাহিনী—সেই বনে-জঙ্গলে দিনের পর দিন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে প্রতাপের আত্মত্যাগের কথা—সে তো তুমিই আমাকে শুনিয়েছো মা! এ প্রেরণা তো আমার আজকার জিনিস নয় ? এর পাপ-পুণ্যের ভাগী যে তোমাকেও হতে হবে। সত্যি বলছি মা, শৈশবে দিনের পর দিন নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে যে শিক্ষা দিয়েছিলে, তাতে পাপ কিছু থাকতে পারে না।

আত্রেয়ী তাহার সকল প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া বলিলেন—কিন্তু তুই যে কিছুই খাচ্ছিস নে অসি—ওসব কথা এখন থাক, পরে শুনবো।

অসিত পুনরায় বলিল—আর তোমার ছোট কাকুর কথা আজও

আমি ভুলিনি মা। তাঁর চোখেও হয়তো রাণা প্রতাপের নেশাই লেগেছিল।

আত্রেয়ী রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, তুই কিছুতেই থামবি নে অসি—অত বক্তৃতা ভাল লাগে না বাপু। বলিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন।

সারারাত্রি অসিতের গরমে ভাল ঘুম হয় নাই। ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়িলে সে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শিয়রের জানালাটি ছিল খোলা। এদিকে কখন সূর্য উঠিয়াছে—সারা বাড়িঘর-প্রান্তর একেবারে সোনালী আলোয় ভরিয়া গিয়াছে, অসিত তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। জানালার ফাঁক দিয়া তাহারই খানিকটা আলো চুরি করিয়া তাহার মুখে গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। আত্রেয়ী ঘরের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কল্যাণী সন্তর্পণে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া অসিতের মুখের দিকে তাকাইয়া কয়েক মুহূর্ত একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার দুই গণ্ড, ঠোঁট, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—বুকের ভিতরে উঠিল দুরু দুরু করিয়া—সে আসিয়াছিল অসিতের ঘুম ভাঙাইতে; কিন্তু মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। ফিরিয়া যাইবে মনে করিয়া যেই পা বাড়াইয়াছে, অমনি অসিত দুই চোখ খুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া জাগিয়া উঠিল। কিসের লজ্জায় যেন কল্যাণীর সারা মুখ আরও রাঙা হইয়া উঠিল—দুই চোখ আপনা আপনি নত হইয়া ভূমির উপরে নামিয়া আসিল—ফিরিয়া যাওয়া আর তাহার হইল না।

অসিত প্রশ্ন করিল—কি কল্যাণী?

কল্যাণী এবার অনেকখানি সঙ্কোচ কাটাইয়া চোখ তুলিয়া জবাব দিল—এত বেলায়ও যে ঘুমুচ্ছেন—উঠবেন না!

হ্যাঁ, উঠবো, মা কোথায়?

—কাকীমা তো বাড়ি নাই। মা আর তিনি যে সকালে উঠে

হরিপুরের বুড়ো শিবতলায় গিয়েছেন। পূজো শেষ হলে সেই বিকালবেলা ফিরবেন।

অসিত বিস্মিত হইয়া বলিল—কই মা তো আমাকে কিছু বলে যান নি!

—আপনি ঘুমুচ্ছেন—তাই আর ডাকেন নি।

—কিন্তু মা'রা আজ না হয় উপবাস করে কাটাবেন—আমাদের অবস্থাটা কি হবে শুনি?

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—ঘুম থেকে না উঠেই খাবার চিন্তা কেন, আমি বুঝি আর কিছু পারি নে।

—তুমি পার নাকি, তাহ'লে আর কোন চিন্তা নাই। আজকের দিনের মতো তুমিই তাহ'লে—সংসারের গিন্নী কি বল?

কল্যাণী কথা না কহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

অসিত পুনরায় হাসিয়া বলিল—দিনটা আজ তাহ'লে ভালই যাবে কি বল?

কল্যাণী বলিল—কেন?

—বাঃ জান না, ঘুম ভেঙে ভাল লোকের মুখ দেখলে দিন ভাল যায়। আজ ঘুম ভেঙে যে তোমার মুখই সর্বপ্রথম চোখে পড়লো।

লজ্জায় কল্যাণীর মুখ-চোখ পুনরায় একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। মুখে বলিল—যান আপনি ইয়ে হচ্ছেন দিন দিন।

অসিত মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলিল—এ তোমার অন্যায়, ভাল মানুষকে ভাল মানুষ বলবো না—সুন্দর মুখকে সুন্দর বলতে পারবো না—কেন আমার কি দুটি চোখ নেই নাকি—

—যান আপনি দিন দিন সত্যিই ভারী—আমি চল্লাম।

আঃ শোন, আর একটু দাঁড়াও না কল্যাণী!

—কি বলবেন বলুন, আমার অনেক কাজ আছে।

—ভারী তো কাজ; মাত্র তো দুটি প্রাণীর রান্না, সে তো মোটে ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, তুমি আমাকে আপনি বল যে আজকাল?

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—বাঃ বড় হয়েছেন যে!

—আর তুমি বুঝি তেমনি ছোটটি আছ?

কল্যাণী অসিতের কথা কানে না তুলিয়া বলিল—কিন্তু আপনিও তো আগে আমাকে তুই বলতেন—আজকাল যে তুমি ধরেছেন।

অসিত বলিল—কিন্তু ছোটবেলার সেই কিলটা, চড়টাই বা বাদ দিলে কেন? সেটাও চলবে নাকি?

—সাহস থাকে তো চলুক না—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কল্যাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তাহখানেক আগে পাশের কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া অসিত পরম উল্লসিত হইয়া উঠিল। উকিল মোক্তার, শিক্ষক ছাত্র প্রত্যেক মহলে ইতিমধ্যেই অসম্ভব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক আসিয়া আন্দোলনে যোগ দিতে লাগিল। সেদিন তাহাদের গ্রামের ভোলানাথবাবু মহকুমা শহর হইতে আসিয়া বলিলেন—দিলাম ওকালতী ছেড়ে, অসিত। এখন থেকে দেশের কাজই করবো। অসিত তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল—আপনারাই দেশের গৌরব দাদা—আমাকে পথ দেখিয়ে চালিয়ে নেবেন। এমনি করিয়া কিছু দিনের মধ্যে কয়েকখানি গ্রাম ও নিকটবর্তী মহকুমা শহর লইয়া গঠিত হইল "ব্রতী-সঙ্ঘ"। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইল স্বদেশ সেবা—যতদিন বঙ্গভঙ্গ রহিত না হয় ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা, গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় করিয়া অশিক্ষিত চাষী হিন্দু-মুসলমানকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

মাস দুই এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। আজ ১৭ই আশ্বিন। আজ হইতেই বঙ্গভঙ্গ হইবে—তাই আজ দেশের পক্ষ হইতে রাখি-বন্ধন ও অরন্ধনের দিন স্থির হইয়াছে। কাল কতকগুলি

সাদা সূতা অসিত গৈরিক রঙে রাঙাইয়া রাখিয়াছিল। ভোরের সময় মা ডাকিল, অসি, চাট্টি কিছু এখনই মুখে দে বাবা—সারাটা দিন খালি পেটে ঘুরলে অসুখ করবে যে।

অসিত হাসিয়া বলিল—আমি কি এখনও এতটুকু খোকা আছি মা যে একটা দিন না খেয়ে থাকতে পারবো না?

আত্রেয়ী বলিলেন—এখনও তো অন্ধকার আছে বাবা। এখন খেলে তো দোষ হবে না।

অসিত পুনরায় হাসিয়া বলিল—হবে বই কি মা, এমনি সময় কি কোনদিন খেয়ে থাকি যে, খাব? আর কষ্ট করে উপবাস না করলে চিত্ত শুদ্ধিও তো হয় না মা—সে জন্যই না হয় একটা দিন কিছু নাই বা খেলাম।

মা আর কিছু বলিলেন না।

ফর্সা হইতেই অসিত সূতা পকেটে লইয়া বাহির হইয়া গেল। এই দুটি মাস ধরিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে বুঝিয়াছিল—দেশের মুষ্টিমেয় কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছাড়া যে নগণ্য চাষা-ভূষা অশিক্ষিত জনসাধারণ—ইহাদের মধ্যে তো তারা মিশে নাই। তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইয়া এক হইয়া এক সাথে মিশিয়া তাহাদেরও তো নিজেদের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন আন্দোলনই যে সফল হইবে না। অথচ দেশের যাহারা বড় বড় নেতা—একথা এখন পর্যন্ত তাঁহাদের মুখ হইতে কেন বাহির হয় নাই ভাবিয়া অসিত আশ্চর্য হইয়া যাইত। তাই আজ অসিত ঠিক করিয়াছে—সে প্রথমে যাইবে জালালপুরের মিঞা সাহেবের বাড়ি। আবদুল গফুর মিঞা, শিক্ষিত লোক, ধনে, মানে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে গণ্যমান্য। তাহার পর যাইবে মাধবপুরের নমঃশূদ্রপাড়ায়—রতন মণ্ডল, সাধু মণ্ডল এরা সব তার পরিচিত লোক। ইহাদের হাতে রাখি বাঁধিয়া তাহার পর সেখান হইতে তিন মাইল দূরে মহকুমা শহরটিতে বিকালবেলা যে সভার আয়োজন করা হইয়াছে—সেখানে বক্তৃতা দিয়া রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে।

আবদুল গফুর মিঞা বাড়ি ছিলেন না। তাঁহার বড় ছেলে লতিফ মিঞা কয়েক বৎসর হইল ওকালতী পাশ করিয়া মহকুমা শহরে প্র্যাক্‌টিস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত অসিতের দেখা হইয়া গেল। তিনি চোখ পাকাইয়া মেজাজ দেখাইয়া বলিলেন—কিসের রাখি-বন্ধন? ওসব আপনার জাতভাই হিন্দুদের কাছে নিয়ে যান—মুসলমানদের সঙ্গে আপনাদের হুজুগের কোন সম্বন্ধ নাই। অসিত অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল—কিন্তু দেশ কি একা হিন্দুদের—আপনাদের নয়?

লতিফ মিঞা বলিলেন—কিসের দেশ আমাদের বলুন। যে দেশে নিজেদের মান নাই—সম্মান নাই—সে দেশ যাক আর থাক তাতে আমাদের কি? আপনারা টাকাওয়ালা শিক্ষিত, বড় বড় মাথাওয়ালা—এর পিছনে আপনাদের গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কোন সুবিধা আদায়ের ফন্দি আছে কিনা তা কে জানে? যদি এর থেকে কোন কিছু পাওয়া যায়—সে তো আপনারাই পাবেন। আমাদের কি—আমরা কেন আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাব? অসিত কোন তর্ক না করিয়া পথে নামিয়া পড়িল। লেখাপড়া শিখিয়া লতিফ মিঞা এমন কথা কেমন করিয়া বলিলেন—অসিত ভাবিয়া পাইল না। ছোট একখানি মাঠের পরেই নমঃশূদ্রপাড়া। এই মাঠের ধারেই সাধু মণ্ডলের বাড়ি। অসিত সেখানে গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ সাধু মণ্ডল তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদাঠাকুর কি মনে করে? অসিত ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তাহাকে নিজেদের দেশের কথা, বিদেশী শাসকদের কথা—বঙ্গভঙ্গের কথা এবং সর্ব শেষে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের কথা অনর্গল বলিয়া বলিয়া হঠাৎ এক সময় থামিয়া পড়িল, এতক্ষণে তাহার হুঁস হইল—শ্রোতা তাহার কথার এক বর্ণও বুঝিতে তো পারেই নাই—এমন কি তাহার কথা সে মন দিয়া শুনিতেছেও না। অসিতের বাক্যস্রোত বন্ধ হইতেই সাধু মণ্ডল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমার হালের গরু

বাছুর সব যে কাল তোমাদের গাঁয়ের নিধু চক্কোত্তি দেনার দায়ে নিলাম করে নিয়ে গেছে দাদাঠাকুর। তার কি হবে? ছেলেটা কাল থেকে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে—একটাবার বাড়ি আসেনি—এক মুঠো ভাত মুখে তোলেনি।

অসিত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন নিলেম করেছে—টাকা ধার করেছিলে—শোধ দেওনি বুঝি?

—হ্যাঁ বাবু, আট বছর আগে পঞ্চাশ টাকা কর্জ করেছিলাম, স্থদে আসলে এই আট বছরে দুই শো টাকা দিলাম—তাতেও দেনা শোধ হলো না, এখনও পৌনে দুইশ টাকার দাবীতে নালিশ করে, নিলাম করে, আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল। এবার মাঠে ধান হয় নাই—কি করে যে সামনের বছরটা চলবে তা কে জানে, তারপর হালের গরু না হলে চাষ হবে কি দিয়ে? এবার যে একেবারে ছেলেপেলে নিয়ে না খেয়ে মরবো, দাদাঠাকুর।

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সাধু মণ্ডল অসিতের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আজ তোমাদের সভা আছে বল্লে না, দাদাঠাকুর—আমার কথাটা একবার সেখানে তুলো—অনেক তো বড় বড় লোক আসবেন। হালের গরু দুটো না হ'লে যে আমি বাঁচবো না! অসিত কোন্ প্রশ্নের কি জবাব দিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না।—ধীরে ধীরে পুনরায় মাঠে নামিয়া পড়িল। এই চাষা পাড়ার ভিতর দিয়া কিছু দূর গিয়া সহরে যাইবার পথে পড়িতে হয়। এদিকটায় অসিত বড় একটা আসে নাই—পথের দুই ধারে জীর্ণ খড়ের ঘরগুলি সব খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। গত বর্ষায় ইহারই ভিতর দিয়া হয়তো অঝোরে বৃষ্টির ধারা ঘরের মধ্যেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। একখানিতেও একগাছি নূতন খড় দেওয়া হয় নাই! পথের ধারে দুই একটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—যাহা অসিতের চোখে পড়িল—তাহার সবগুলিই রোগা—উলঙ্গ হইয়া, প্লীহা লিভারের স্ফীত উদর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারে মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ ছিল। তাহার ছায়ায় আসিয়া অসিত বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত উৎসাহ

সমস্ত উত্তেজনা যেন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। অসিত তাহার অলস দেহ লম্বা লম্বা ঘাসের উপর এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল। গৈরিক রঙে রঞ্জিত সূতাগুলি তাহার পকেটেই পড়িয়া আছে। এক গাছাও কাহারও হাতে বাঁধা হয় নাই। আজ বারে বারে তাহার মনের মধ্যে পাশাপাশি উঁকি মারিতে লাগিল—লতিফ মিঞা আর সাধু মণ্ডল। লতিফ মিঞা শিক্ষিত লোক—দেশের সহিত তাহার সংযোগ নাই—এই দেশটা যে নিজেদের এ কথাটা পর্যন্ত সে স্বীকার করিতে চাহে না। আর সাধু মণ্ডল—তাহার হালের গরু নাই, পেটে ভাত নাই, চালে খড় নাই, এমনি পল্লীতে পল্লীতে যে শত সহস্র সাধু মণ্ডল অনাহারে, অর্ধাহারে শুকাইয়া মরিতেছে—তাহাদের কথা তো, তাহারা একবারও চিন্তা করে নাই। কলিকাতার কোন বড় নেতার মুখেও তো অসিত ইহাদের কথা একবারও উচ্চারণ করিতে শুনে নাই। অন্নহীনকে অন্ন না দিয়া, গৃহহীনকে গৃহ না দিয়া—কেবল দেশ দেশ বলিয়া চীৎকার করিলে কি ফল হইবে? দেশের সত্যিকারের কিছু করিতে হইলে ইহাদের সাথে করিয়া লওয়া চাই—ইহাদের সমস্ত দাবীকে বড় করিয়া দেখা চাই—তাহা না হইলে বঙ্গভঙ্গ হউক আর অখণ্ডই থাকুক, ফল তাহাতে কিছুই হইবে না। আজ অসিতের বক্তৃতা ভাল জমিল না। সভার শেষে যখন সে ঘরে ফিরিতেছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গী ছিল তাহাদেরই গ্রামের অন্য একটি কর্মী—নাম অক্ষয়। এখান হইতে সোজা মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করিলে তবে তাহাদের বাড়ি। মিনিট দশেকের মধ্যে তাহারা লোকালয় ছাড়াইয়া একেবারে মাঠের ভিতরে আসিয়া পড়িল। সম্মুখের সমস্তটাই একটি বিরাট প্রান্তর এবং এই প্রান্তরের দক্ষিণ দিকে যে সবুজ রেখা চক্রাকারে বেড়িয়া আছে তাহারই একপাশে অসিতদের গ্রাম এবং গ্রামের ঠিক পূর্ব দিক দিয়া চন্দনা নদী বহিয়া যাইতেছে। পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি—চন্দ্রালোকে ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রান্তর দিবালোকের মতোই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল এই দিন

কয়েক হইল মাঠ হইতে নামিয়া গিয়াছে। ভিজা কাদা ও শেওলার সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। ক্ষেতভরা আমন ধানেরও ইতিমধ্যেই শিস্ বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চন্দ্রালোক তাহার উপরে পড়িয়া চিকচিক করিতেছে। এই জ্যোৎস্না রাত্রে দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে মন উদাসীন হইয়া কোথায় যেন উড়িয়া যাইতে চাহে। পৃথিবীর সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ একেবারে তুচ্ছ করিয়া দেয়। কিন্তু অসিতের আজ মন ভাল ছিল না। তাহার উপরে সারাটা দিনের উপবাসে শরীর অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই—আপনার মনে চুপ করিয়া পথ চলিতেছিল। এমনি কিছুক্ষণ চলার পর অক্ষয় গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং,

শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

ক্রমে ক্রমে কখন যে অসিত অক্ষয়ের সহিত নিজের গলা মিলাইয়া দিয়াছে এবং দুইজনের স্বরের মূর্চ্ছনায় সমস্ত প্রান্তর একেবারে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা তাহারা কেহই বুঝিতেও পারে নাই। গান থামিলে অসিত ধরা গলায় বলিল—ভবানন্দ আর মহেন্দ্রও এমনি করে গান গেয়ে কেঁদেছিল, না অক্ষয়?

অক্ষয় বলিল—হ্যাঁ, কিন্তু তুমিও তো কাঁদছিলে অসিত!

অসিত সলজ্জভাবে বলিল—সত্যিই চোখ দিয়ে আপনি জল বেরিয়ে আসে ভাই!

যিনি এই গান শুনিয়ে সন্তানদের একদিন কাঁদিয়েছিলেন—তিনি কি সত্যি সত্যিই অনুভব করেছিলেন যে, এই গানেই এমনি করে একদিন সারা বাঙলাদেশের আকাশ বাতাস ভরে যাবে?

অক্ষয় বলিল—কি জানি ভাই—হয় তো অনুভব করেছিলেন—হয় তো করেন নাই, কিন্তু মন্ত্র তাঁর সফল হয়েছে, তাঁরই মন্ত্রে সারা দেশ আজ জেগে উঠেছে।

অসিত আর কথা না কহিয়া একেবারে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরে তখনও গানের রেশ বাজিয়া বাজিয়া ফিরিতেছিল। এতক্ষণে আজিকার সারাদিনের গ্লানি তাহার মন হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া মিলাইয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরের দিন ভোর বেলায় বিছানায় শুইয়া অসিত গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল ঃ—

“বাঙলার মাটী, বাঙলার জল
“বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল,
ধন্য হউক, ধন্য হউক—হে ভগবান্।”

আত্রেয়ী পাশের খাটে শুইয়া একমনে গান শুনিতেছিলেন। গান শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গান কার লেখারে অসি ?

অসিত বলিল—রবীন্দ্রনাথের, মা! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নাম শোননি, তুমি ? মস্তবড় কবি তিনি খুব নাম হয়েছে যে তাঁর।

—সত্যি এমন সোজা সরল করে তো আর কেউ দেশের কথা বলেনি রে !

অসিত বলিল—এবার এমনি কত যে স্বদেশী গান বেরিয়েছে মা —তোমাকে আমি সব লিখে দেব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আত্রেয়ী বলিলেন—একটা কথা শুনবি, অসি ?

মায়ের এই ভাবান্তর অসিতের চোখ এড়াইল না—সে উঠিয়া গিয়া দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে মা ? কেন অমন করছো বল তো ?

আত্রেয়ী পুত্রকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—শ্রীচৈতন্য চরিত পড়েছিস অসি ?

অসিত বলিল—ভাল করে তো পড়িনি মা—একটু আধটু কাগজপত্রে কোথাও হয়তো দেখে থাকবো।

মা বলিলেন—পড়িস্ বাবা, কলিযুগে এত বড় অবতার আর হয়নি! কিন্তু এত বড় যে অবতার তিনিও তো মায়ের দুঃখ বুঝেছিলেন, বাবা! আত্রেয়ীর দুই চোখ ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হইয়া। অসিত অবাক হইয়া গেল—মা হঠাৎ এমনি করিয়া কেন কাঁদিতেছেন—কোথায় তাঁহার বেদনা—অসিত তো কিছুই বুঝিতে পারিল না।

—কি হয়েছে মা, তুমি না খুলে বল্লে তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তোমার অসি, তোমার প্রাণে ব্যথা দিতে পারে, তাই কি তুমি বিশ্বাস কর মা?

আত্রেয়ী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—না, করিনে অসি—তোর গর্বে যে আমার বুক ভরে ওঠে বাবা! কিন্তু আজ পাঁচটা বছর প্রতিটি দিন যে আমার কেমন করে কাটছে তাকি কোন দিন ভেবে দেখেছিস? সংসারে এমন একটি প্রাণী নেই যাকে নিয়ে আমার দিন কাটবে—একা একা এই শূন্য পুরীর মধ্যে আমার প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠেরে।

অসিত বুঝিতেছিল না—ইহার প্রতিকার কি? কি জবাব দিবে তাহাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

মা পুনরায় বলিলেন—তুই এবার বিয়ে কর বাবা! না না হাসিসনে বাবা, মহাপ্রভু মার আজ্ঞায় দুই দুইবার বিয়ে করেছিলেন—জানিস তো? অসিত এবার একেবারে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বেশ মা, তোমার কথাই রাখবো—সেই যে ছোটবেলায় তুমি ছড়া বলতে—

"খোকন বাবুর বিয়ে—
ধূচনী মাথায় দিয়ে—
তেলা পোকা বেহারা হলো
পাল্কী কাঁধে নিয়ে—"

কিন্তু অসিত হাসি ঠাট্টায় ব্যাপারটি যত হাল্কা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল—বস্তুতঃ তাহার কিছুই হইল না—আত্রেয়ী তেমনি ভারাক্রান্ত মনে রুদ্ধস্বরে বলিলেন—তোর বউকে নিয়ে—ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষের দিন কয়টা কোলাহল করে কাটিয়ে দেই বাবা—এই আমার একমাত্র বাসনা।

—কিন্তু তোমার কথায় তুমিই যে ঠকে গেলে মা ; শ্রীচৈতন্যের একবারও তো বিয়ে করা উচিত হয় নি—বিয়ে করে স্ত্রীকে ত্যাগ করাও তো অপরাধ মা! আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি অসিতের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন—ছি, ছি, বাবা, অমন কথা মুখে আনতে নাই—অন্যায় হয়—পাপ হয়। পরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—ঠাকুর দেবতার কাজের বিচার কি বাইরে দেখে করা যায় অসি? বড় হলে যখন পড়বি সব—জানবি সব—তখন আর ওকথা মুখে আনতে পারবি নে—দেখিস।

অসিত হাসিয়া বলিল—কিন্তু বড় তো হয়েছি মা!

আত্রেয়ী হাসিয়া উত্তর দিলেন—না, বড় এখনো হসনি বাবা, বড় হবার—জানবার এখনও যে অনেক বাকী আছে।

অসিত পুনরায় বলিল—কিন্তু তোমার ঠাকুর যে মা—

আত্রেয়ী পুনরায় তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া ধরিয়া বলিলেন—না, আর নয় অসি—আমার মাথা খাস্ বাবা। ঠাকুর দেবতার নামে ওসব বল্লে যে অকল্যাণ হয়! তুই সর, আমি উঠি—বেলা হলো—বলিয়া তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে অসিত বাহির হইয়া গিয়াছিল। আত্রেয়ী দেবী এতক্ষণ কল্যাণীর মা, কাত্যায়নী দেবীর নিকটে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন ; বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—এমন সময় নিজের ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই আত্রেয়ী পাশের জানালা দিয়া দেখিলেন, কল্যাণী যেন ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। কিছু না বলিয়া চুপি চুপি জানালার কাছে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কল্যাণী অসিতের বইগুলি আঁচল দিয়া মুছিয়া

সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতেছে। আত্রেয়ীর দুই চোখ দিয়া স্নেহ ও মমতা যেন গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল—সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল—এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তিতে। হঠাৎ পিছন ফিরিতেই কল্যাণীর দৃষ্টির সহিত আত্রেয়ীর দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। কল্যাণী এক মুহূর্তে একেবারে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

আত্রেয়ী ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—বাঃ দিব্যি সুন্দর করে তো সব গুছিয়ে রেখেছিস মা; এ তো তোদেরই কাজ। আমরা বুড়োমানুষ কি ওসব পারি মা! মা আমার সত্যিই কল্যাণী। কল্যাণী তেমনি ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কিসের লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

তারপর গন্ধতেল আনিয়া, আয়না চিরুণী আনিয়া আত্রেয়ী কল্যাণীর চুল বাঁধিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতি পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়া কাঁচ পোকার টিপ কপালে দিয়া বলিলেন—তোর সেই শান্তিপুরে কাল ডুরে শাড়ীখানা পরে আয় তো মা! কল্যাণী কাপড় ছাড়িয়া আসিলে—আত্রেয়ী মুগ্ধ নয়নে সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন—তারপর কি জানি কেন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া সমস্ত অন্তর একেবারে হতাশ্বাসে ভরিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় অসিত বাড়ি আসিলে আত্রেয়ী দেবী তাহাকে বলিলেন—আমরা বড় বাড়ি কথকতা শুনতে যাচ্ছি অসি! রাতের রান্না বান্না যা কল্যাণীই করবে—তুই একটু তাকে দেখিস বাবা—ছেলে মানুষ একা একা ভয় না পায়। পরে কল্যাণীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোর রান্না হলে অসিকে খেতে দিস মা—আমাদের ফিরতে হয়তো রাত হবে। কাত্যায়নী দেবী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন—আত্রেয়ী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এসো দিদি! হঠাৎ কাত্যায়নী আর আত্রেয়ী দেবী এই উভয়ের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি পড়িতেই অসিত দেখিতে পাইল—তাঁহাদের চোখে চোখে কি যেন এক দুষ্টামীর হাসি খেলিয়া গেল। অসিত একটা কথাও

কহে নাই—এই প্রচ্ছন্ন হাসির ভিতরে সে এক মুহূর্তে কত কি যেন ভাবিয়া লইয়া লজ্জা ও সঙ্কোচে ঘামিয়া উঠিল। অন্ধকার রাত্রি। দুইটি বাড়ির মধ্যে অন্য জনমানবের সাড়া নাই। অসিত নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—কল্যাণী একা একা রান্নাঘরে হয়তো ভয়ে সারা হইয়া যাইতেছে কিন্তু আজ তাহার নিকটে যাইতে পা যেন কিছুতেই সরিতেছিল না। সকাল বেলা কথার ছলনায় চোখের জলে মা তাহাকে যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন—সন্ধ্যায় তিনিই হয়তো ষড়যন্ত্র করিয়া কল্যাণী ও তাহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—কথকতা শুনিতে যাওয়াই হয়তো তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ধীরে ধীরে অসিত রান্না ঘরের সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইল—তখন কল্যাণী কড়াতে কি যেন একটা চাপাইয়া খুন্তি দিয়া খটাখট্ শব্দ করিতেছিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরের ভিতরের শব্দ থামিলে অসিত কয়েকবার কাসিয়া শব্দ করিয়া কল্যাণীকে সেখান হইতেই প্রশ্ন করিল—কেমন, ভয়তো করছে না কল্যাণী? কল্যাণী ঘরের ভিতর হইতেই হাসিয়া জবাব দিল,—না ভয় করবে কেন—আমি কি এখনও ছেলে মানুষ আছি নাকি? কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর কি কাজে যেন কল্যাণী বাহিরে আসিয়া একেবারে অবাক হইয়া বলিল—ওমা, আপনি যে এখনও এই হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন—অসুখ করবে যে? আমি মনে করেছি যে ঘরে গিয়ে বসেছেন বুঝি!

অসিত বলিল—তোমার ভয় করতে পারে তো?

কল্যাণী বলিল—বেশ বুদ্ধি, তাই বলে বুঝি অমনি করে হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? বারান্দায় উঠে বসুন—রান্না আমার হয়ে গেছে! বলিয়া বারান্দার উপরে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া কল্যাণী থালায় করিয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

—কিন্তু ভাত কি আমায় এখনই দিচ্ছ কল্যাণী?

—হ্যাঁ, মিছে রাত করে লাভ কি?

—কিন্তু মা ফিরে আসলে হতো না?

—তাঁরা ফিরবেন সেই রাত দশটায়।

আহারে বসিয়া অসিত বারে বারে পথের দিকে তাকাইতেছিল—এখনই হয়তো মা আসিয়া পড়িবেন—সে আর লজ্জায় মাথা উঁচু করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইতে পারিবে না। উনানের পাশে ছিল কল্যাণী বসিয়া—প্রজ্জ্বলিত আগুনের রশ্মি আসিয়া পড়িয়া তাহার মুখের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল—কপালের টিপটি উঠিয়াছিল জ্বল জ্বল করিয়া। অসিতের সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার দুই চোখ যেন এতদিন পরে আজ কোন্ এক নূতন রূপ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কতক্ষণ এমনি অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়াছিল—তাহার খেয়াল নাই—কল্যাণী মাটীর দিকে চোখ করিয়া বসিয়াছিল হঠাৎ অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—একি আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না? অসিতের এতক্ষণে খেয়াল হইল—তাড়াতাড়ি দুই চোখ নামাইয়া লইয়া হাতের সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই নির্বিচারে মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। খানিক পরে হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া সে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা তোমার লজ্জা করে না কল্যাণী?

কল্যাণী কতকটা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কেন?

অসিত কয়েকবার ইতস্তত করিয়া বলিল—এই যে আমরা দুটি প্রাণী এমন নির্জনে বসে আছি। হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে আমাদের ভিতরে হয়তো কোন নিকট সম্বন্ধ আছে।

কল্যাণী লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া বলিল—যান, আপনি দিন দিন ভারী ইয়ে হচ্ছেন। কিন্তু অসিত থামিল না পুনরায় মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—মা-দের এ ভারী অন্যায়, আমাদের কি এমনি একা একা ফেলে যাওয়া উচিত? কল্যাণী কোন কথা না কহিয়া একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহিরে আত্রেয়ীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—অসিত তাড়াতাড়ি আহার হইতে উঠিয়া মুখ ধুইতে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম অধ্যায়

তাহারা যেমন করিয়া আঁক কসিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু কার্যত দেখা গেল তাহা হইল না। তাই মাস তিন চার ধরিয়া বিলাতী নুন আর কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালাইবার পরও দেখা গেল—অসিতদের মহকুমা শহরটিতে ঐ দ্রব্য দুইটি তখন বেশ চলিতেছিল। বিরিঞ্চি সাহা আর অধর পোদ্দার এই দুইজন খুব বড় মহাজন। তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া অনবরত বিলাতী মালের চালান আনিয়াই চলিয়াছিল। এই কয়টা মাস ধরিয়া ছোট বড় নির্বিশেষে খরিদ্দার মাত্রেরই হাতে পায়ে ধরিয়া শূকর আর গরুর হাড়ের দোহাই দিয়া স্বদেশহিতের বুলি আওড়াইয়া এমন কি কিছুটা জোর জবরদস্তি করিয়াও তাহারা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। কয়েকদিন আগে বিরিঞ্চি সাহা একদিন চরপাড়ার মুসলমান লাঠিয়াল আনিয়া তাহাদের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলিয়াছিল। তাই এতদিনে এদিকেরও সহ্যের সীমা গেল শেষ হইয়া। হঠাৎ একদিন ভোর হইতেই দেখা গেল মফঃস্বল হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া শহরটিতে জমা হইতেছে। ক্রমে বেলাও বাড়িল—জনতাও বাড়িল। তারপর সমগ্র জনতা বিরিঞ্চি সাহা আর অধর পোদ্দারের দোকান একেবারে নিমেষে লইল লুট করিয়া। বিলাতী লবণ রাস্তায় রাস্তায় ধূলার সঙ্গে মিশিয়া গেল। বিলাতী কাপড় স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া পুড়িতে লাগিল। মহকুমা হাকিম পূর্ব হইতেই ইহার আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু জেলার শহর হইতে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই জনতা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া যে যেদিকে পারিল ভাগিয়া পড়িল। শান্তি রক্ষা হইল না—গভর্নমেণ্টের মর্যাদায় ঘা লাগিল; তখন কোপ গিয়া পড়িল—ইহারই মূলে থাকিয়া যাঁহারা মন্ত্রণা যোগাইতেছিলেন

—তাঁহাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন উকিল, একজন মোক্তার, একজন ডাক্তার ও অসিত এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মহকুমা হাকিমের কোর্টে তাঁহাদের বিচার হইয়া প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল এবং আর কাল বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া তখনই তাঁহাদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট জেলে প্রেরণ করার আয়োজন হইল। এদিকে এই খবর মন্ত্রবলে যেন গেল চারিদিকে প্রচারিত হইয়া। ফলে যে জনতা ফিরিয়া যাইতেছিল—তাহারা আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অসিতদের যখন কোর্ট হইতে বাহির করা হইল, তখন সমগ্র মাঠ, পথ ঘাট একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম্ আর জয় ধ্বনিতে সারা আকাশ বাতাস একেবারে ভরিয়া গেল—ফুলের মালায় মালায় অসিতদের মুখ চোখ গেল ঢাকিয়া। অক্ষয় নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। অসিত তাহার দিকে ফিরিতেই সে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

অসিত বলিল—মাকে সকল কথা বলিস ভাই, বলিস অসিত তাঁর ভাল কাজেই দুঃখ বরণ করছে—ভাল কাজের পুরস্কার একদিন ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের দেবেন—এই বিশ্বাস যেন তিনি মনে রাখেন। ছয় মাস পরে ফিরে এসে আমি আবার তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেব, তখন তাঁর কোন কথার আর অবাধ্য হবো না।

যখন তাহাদের ট্রেনে আনিয়া তোলা হইল—চারিদিকে তখন শুধু নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্তে অসিতের বুকখানা যেন একেবারে দশ হাত হইয়া ফুলিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে নিজের কথা—আত্মীয় পরিজনের কথা—ইহার লাভ লোকসানের কথা সমস্ত ভুলিয়া গেল—এক অভূতপূর্ব আনন্দে ও উত্তেজনায় তাহার চিত্ত উঠিল ভরিয়া। সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল—কে বলে দেশ জাগে নাই—কে বলে জনসাধারণ তাহাদের কথা শুনে নাই? এই যে অগণিত তাহাদের স্বদেশবাসী, ইহারা

কোন উন্মাদনায় এমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে? আজ এই উন্মাদনার মুখে ভয় বলিয়া অসিতের কিছু অবশিষ্ট রহিল না—দরকার হইলে আজ সে নিজের যথাসর্বস্ব এমন কি আপন জীবন পর্যন্ত একটা অতি তুচ্ছ বস্তুর মতো বিলাইয়া দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিবে না। বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি অতি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। অসিত যুক্তকরে সমগ্র জনতার প্রতি তাহার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিল; অমনি হাজার কণ্ঠে পুনরায় জয়ধ্বনি আর বন্দে মাতরম্ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিপ্রহরে আত্রেয়ী দেবী পুত্রের জন্য রান্না করিয়া তাহারই অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল কিন্তু অসিত ফিরিল না দেখিয়া তিনি বারে বারে ঘর বাহির করিতেছিলেন। আজ কেন যেন তাঁহার মন ভাল ছিল না—বারে বারে কেবলই শূন্য হৃদয় হু হু করিয়া উঠিতেছিল—অথচ ইহার কোন সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। কল্যাণী আজ অনেকক্ষণ এ-বাড়িতে আসে নাই—হয়তো নিজেদের বাড়িতে রান্নাবান্না করিতেছিল, ভাবিলেন —তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া দুদণ্ড গল্প করিবেন। এম্নি সময় হঠাৎ অক্ষয় ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—জ্যাঠাইমা, অসিতকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে!

—ধরে নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা! আত্রেয়ী দেবীর মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না—ধীরে ধীরে সেখানেই চুপ করিয়া মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন। তারপর অক্ষয়, একে একে সকল কথা খুলিয়া বলিল—সেই বিপুল জনতার কথা—অসিত মাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিল—সে সমস্ত কথা। কিন্তু এত কথার একটি শব্দও বোধ করি তাঁহার কানে গেল না। নিতান্ত বিহ্বলের মতো সেখানেই চুপ

করিয়া বসিয়া রহিলেন। সমস্ত কথা শেষ করিয়া নানা প্রকার ভরসা দিয়া অবশেষে অক্ষয় চলিয়া গেল। আত্রেয়ীর সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব সংসার যেন ঘুরিতেছিল—কি হইয়াছে ইহার কিছুই যেন তিনি সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অক্ষয় যাইবার সময় পাশের বাড়িতেও খবরটি দিয়া গিয়াছিল। এমনি কতক্ষণ কাটিবার পর কল্যাণী আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে সেখান হইতে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। শুইয়া শুইয়া অবিরলধারে দুই চোখের জলে আত্রেয়ী দেবী ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইতেছিল না। কল্যাণী শিয়রে বসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দিগন্তের কোণে শ্যাম-বনচ্ছায়া দেখা যাইতেছিল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—সেই দূর-বিস্তারী মাঠের শেষে শ্যামরেখার কোণে কোণে ক্রমে আঁধার নামিয়া আসিতে লাগিল। এমনি করিয়া সমস্ত মাঠঘাট কল্যাণীর দৃষ্টির সম্মুখে গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া গৃহে ও তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলসী বেদীর উপরে গলায় আঁচল জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। যখন মাথা তুলিল তখন তাহার চোখের দুই পাশ বহিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

দ্বিপ্রহরের অন্নব্যঞ্জন সমস্ত কাকে ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। কাত্যায়নী দেবী পুনরায় সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া রান্নার যোগাড় করিতেছিলেন। রান্না শেষ করিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া তবে আত্রেয়ী দেবীকে লইয়া আসনে বসাইলেন। কিন্তু তিনি কয়েক গ্রাস মুখে তুলিয়াই একেবারে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমি কেমন করে মুখে ভাত দেব দিদি—আমার অসি হয়তো সারাটা দিনের মধ্যে একটা অন্নও মুখে তোলে নি। বলিয়াই গ্লাসের জল পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া সরিয়া বসিলেন। অক্ষয় পুনরায় সন্ধ্যার পরে আসিয়া বাহিরের ঘরের দাওয়ার উপরে বসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

আপনি বলছেন কি জ্যেঠাইমা, আমরা যে তাকে ভাল করে লুচি-পুরি খাইয়ে দিয়েছি—বেলা দুটোর মধ্যে—জেলে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, পুনরায় জেলের নামে তিনি হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—অসি আমার আজ জেলের ভাত খাবে অক্ষয়! আমি যে কোনদিন নিজের হাতে, কত যত্ন করে খাইয়েও তাকে তৃপ্তি পাইনি! জেলে কি মানুষ থাকে—সেখানে যে চোর-ডাকাত—যত সব বদ লোকের আড্ডা! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অক্ষয়, অসি আমার সেখানে গিয়ে—একেবারে অকূলে পড়েছে—মন তার কেঁদে মরছে।

অক্ষয় পুনরায় কহিল—কিন্তু মোটে তো ছয়টা মাস জ্যেঠাইমা—দেখতে দেখতে চলে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ছয়টি মাস—আমার কাছে যে কত যুগ, তা তোকে কেমন করে বোঝাব! এর প্রত্যেকটি মুহূর্ত যে আমাকে গু'ণে গু'ণে কাটাতে হবে বাবা!

পরের দিন সকাল বেলা আত্রেয়ী ঘুম হইতে উঠিয়া নিজের বিছানার উপরেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। বেলা তখন অনেক হইয়া গিয়াছে। বাহিরের কাজকর্ম সারিয়া কল্যাণী ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ধীরে ধীরে আত্রেয়ীর পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—এমনি করে তোমাকে ভেঙে পড়লে তো চলবে না কাকীমা!

সস্নেহে কল্যাণীর মস্তকটি নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—আমি একা তার সাথে পেরে উঠবো না—সে ভয় আমার ছিল, তাই তোকে এমনি করে নিজের হাতে তারই যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলাম মা, কিন্তু আজ দেখছি, তুইও হেরে গেলি। তোর এই যে রূপ, এই যে গুণ—ভালবাসা, এ একটিবারও সে ফিরে দেখলো না। না না লজ্জা কি মা—ভাল যদি সত্যি বেসে থাকিস—তার চেয়ে বড় জিনিস আর কি আছে জগতে!

কল্যাণী হয়তো বা কথার স্রোত ঘুরাইয়া দিবার জন্যই বলিল—

কিন্তু ছয়টা মাস তো, সত্যিই এমন কিছু বেশী সময় নয় কাকীমা! আত্রেয়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তুই দেখছিস শুধু ছয়টি মাস, কিন্তু আমি যে তার চেয়েও অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি মা! অসি আমার জেদী ছেলে, খেয়ালী ছেলে। আমি আজ স্পষ্ট দেখছি—ও ঝাঁপ দিয়েছে দুঃখের সাগরে মানিক তুলবে বলে। এযে অতল সাগর মা—মানিকের আশা আমি করিনে—কিন্তু অসি আমার ফিরে আসবে তো? পুনরায় তাঁহার দুই চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল গড়াইতে আরম্ভ করিল। দেয়ালে একখানা বহু পুরাতন ফটো টাঙানো ছিল, হঠাৎ সেই দিকে দুই হাত যুক্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন —বাবা, তোমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে—মা হয়ে আমি সন্তানঘাতিনী হয়েছি! কল্যাণী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—এ আমারই কর্মফল মা, দোষ আমি কাউকে দেব না, অসিতেরও নয়। সে হয়তো ঠিকই করেছে! সেদিন সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—অন্যায়কে ন্যায় বলে মানবার, অত্যাচারকে নতমস্তকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা তো তোমার অসিকে কখনও দাও নি মা—আজ কথা ফেরালে চলবে কেন? আর দুঃখ! ভীরুর মতো দুঃখকে বারে বারে পাশ কাটিয়ে গেলেই দুঃখ এড়ান যায় না মা—তার সম্মুখীন হতে হয়, বীরের মতো বুক পেতে দাঁড়াতে হয়। পরে পুনরায় কল্যাণীকে বুকের মধ্যে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—কিন্তু মা, যদি তাকে ফিরে পাই—তাহলে তোর পুণ্যেই পাব—তুই তো কোনদিন কোন পাপ করিস নি। যা অনেকে পারে না—আমি জানি, সেই ভালবাসাকে তুই নিজের অন্তরে অন্তরে জেনেছিস—ভাল বেসেছিস। এর যে পুরস্কার—তা স্বয়ং ভগবানও আটকে রাখতে পারে না মা।

খবর পাইয়া কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অমিয় বাড়ি আসিল। ইচ্ছা ছিল মাকে কলিকাতার বাসায় লইয়া যাইবে। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও যখন তাঁহাকে রাজি করাইতে

পারিল না—তখন অভিমান করিয়া কহিল—আমি তোমার অধম ছেলে—তা বলে অভিমান আমি করিনে, কিন্তু আজ যে এমনি অবস্থায় তোমাকে একটু সেবা করবো—সে অধিকারটুকুও কি আমায় দেবে না ?

আত্রেয়ী চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন—অভিমান করিস নে বাবা—এ সময় আমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও গেলে বাঁচবো না, তার আশায় যে আমাকে এখানেই বসে থাকতে হবে !

—তাহলে খোকাদের এখানে রেখে যাই মা !

—না বাবা, তাতেও কাজ নেই—এ পাড়াগাঁয়ে সে কলকাতার মেয়ে এসে কি বিপদেই না পড়বে বল্‌তো ! তাছাড়া ঐ কচি ছেলের দায়িত্ব নেবার সাহস আর আমার নেই ।

অগত্যা ক্ষুণ্নমনে অমিয় কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন ।

নবম অধ্যায়

জেলের জাঙ্গিয়া ও কোর্তা গায়ে একেবারে ভিতরে ঢুকিয়া নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া এত দুঃখেও অসিত হাসিয়া ফেলিল। উকিল ভোলানাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের সহচর আর আমাদের মূর্তির মধ্যে তফাৎ কতখানি আছে তাই ভাব্‌ছি দাদা ! নিজের চেহারাখানা নিজের চোখে ভাল করে নজরে পড়ছে না—তাই রক্ষে ! ভোলানাথবাবু চেষ্টা করিয়াও মুখে হাসি টানিয়া আনিতে পারিলেন না ; কহিলেন—ভাগ্যে আরও কত লেখা আছে অসিত, তা কে জানে ।

অসিত পুনরায় হাসিয়া বলিল—'মেক্ আপ' এর বহর দেখেই ঠাহর হ'চ্ছে—দাদা—এ যাত্রা জমবে ভাল। চাই কি ঘানিগাছ পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে পারে !

ভোলানাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোমার সব তাতেই

হাসিঠাট্টা অসিত! তোমাদের কি—তাজা রক্ত তাজা মন! অগত্যা আর জবাব না দিয়া অসিত থামিয়া গেল। অপর সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া দেখিল—সেদিকের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়—অন্তত হাসি ঠাট্টা করিবার মতো তো নয়ই। জেলটির ধারণা এক মুহূর্তে তাহারা কিছু করিয়া লইতে পারিল না—সম্মুখেই একটি দোতলা দালান তাহারই পাশে সরু একফালি ঘাসের জমি—সেইখানে ১৫।২০ জন লোক বসিয়াছিল—বেশভূষার দিকে তাকাইয়া অসিত দূর হইতেই বুঝিতে পারিল—ইহারা সগোত্র অর্থাৎ কয়েদী। যে মেট্‌টি সঙ্গে আসিয়াছিল—সে বলিল—ওঁরা স্বদেশী কয়েদী। আপনাদের ওখানেই থাকতে হবে। আর একটু অগ্রসর হইতেই—সেই দলের মধ্য হইতে ৩।৪ জন উঠিয়া আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল, তারপর আধ ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হইল। জন দুই-তিন সঙ্গে করিয়া লইয়া রাত্রিবাসের জায়গা দেখাইয়া আনিল। দোতলায় স্বদেশী কয়েদীদের থাকিবার স্থান। তাহাদের চারখানা কম্বল, দুইটি জাঙ্গিয়া, একখানা গামছা, দুইটি কোর্তা ও একটা কম্বলের জাঙ্গিয়া, একখানা টিনের থালা ও একটা বাটী বুঝাইয়া দেওয়া হইল। একখানা কম্বল ও কম্বলের জাঙ্গিয়া শীতকালের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। বেলা ততক্ষণ চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। জেলের সঙ্গীরা বলিল—খেতে আসুন, খাবার এসে গেছে।

ভোলানাথবাবু প্রশ্ন করিলেন—এখন খাবার?

—হাঁ, এখনই তো খেতে হয়—পাঁচটার মধ্যে "লক্ আপ" হ'তে হ'বে যে!

—সে আবার কি?

—সবাইকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে রাখবে!

ভোলানাথবাবু কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন—কি সর্বনাশ—সারা রাত এতগুলো লোককে গরু ভেড়ার মতো ঘরে তালা দিয়ে রাখবে না কি?

সঙ্গীটি হাসিয়া বলিলেন—তাই নিয়ম যে!

—কিন্তু যদি বিশেষ কারণে বাইরে যেতে হয় ?

—বিশেষ কারণটাও ঘরের মধ্যেই সারতে হ'বে—সে ব্যবস্থাও আছে।

ভোলানাথবাবু আর কথাটি কহিলেন না।

অসিত চাহিয়া দেখিল—মুখখানি তাঁহার নানা ভঙ্গিতে সঙ্কুচিত, প্রসারিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে।

অসিত আর সেদিকে না তাকাইয়া দুই চোখ ফিরাইয়া লইল।

থালা বাটী হাতে করিয়া নিচে নামিয়া আসিয়া দেখে—একজন সেপাই চীৎকার করিতেছে—"এ বাবু লোক, ফাইল হো যাইয়ে, ফাইল হো যাইয়ে"—বাবুরা সুবোধ বালকের মতো থালা বাটী সম্মুখে করিয়া সারি বাঁধিয়া বসিয়া পড়িতেছিল।

ভোলানাথবাবু পুনরায় বলিলেন—এ আবার কি ?

অসিত ব্যাপারটি আগেই ধারণা করিয়া লইয়াছিল—বলিল—পংক্তি ভোজন দাদা—সারি বেঁধে বসে খেতে বল্‌ছে। যথারীতি বসিয়া পড়িবার পর—অন্ন থালায় পরিবেষণ করা হইতে লাগিল, অন্নের রূপ বর্ণনা করিতে নাই—মা লক্ষ্মী মুখ ভার করিতে পারেন। কিন্তু যিনি পরিবেশন করিতেছিলেন—তাঁহার বেশভূষার দিকে চোখ পড়িতেই পেটের নাড়ী মোচড় দিয়া উঠিয়া একান্ত অনিচ্ছা ঘোষণা করিতে থাকিল। কিন্তু এসব অসিত ভাবিল না—তাহারই পাশে আহারে বসিয়া পরম সাত্ত্বিক ভোলানাথবাবু—ব্রাহ্মণকুলের নৈকষ্য কুলিনের বংশধর ; এদিকে পরিবেশনকারীর আধ হাত লম্বা এক মুখ দাড়ি! ভোলানাথের পাতে ঢক্ করিয়া চাট্টি ভাত ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেই—তিনি অসিতের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—কি জাত অসিত ?

অসিত অম্লানবদনে বলিয়া গেল—ব্রাহ্মণ, দাদা!

—চেহারাটা যে কেমন কেমন মনে হ'চ্ছে—মুখে যে একমুখ দাড়ি!

—বলেন কি দাদা, বামুনের দাড়ি থাকতে নেই ?

—পৈতে আছে তো ?

—হাঁ, ঐ যে ওর জামার নীচে এখনও দেখতে পাচ্ছি, দাদা। কথা বলিতে বলিতে খানিকটা হলুদগোলা জল পাতের উপরে পড়িল, আর খানিকটা কুমড়া সিদ্ধ অর্থাৎ ডাল আর তরকারি। এই রাজভোগ সম্মুখে করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া ভোলানাথ কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়া দুই একবার মুখে তুলিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, গন্ধেই হইয়া আসিয়াছিল। অসিত পরম উৎসাহে পর পর কয়েক গ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া দুই চোয়ালের উপরে রীতিমত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নীচের দিকে ঠেলিয়া দিয়া—মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, বেশ করেছে দাদা ! ভোলানাথের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, চটিয়া বলিলেন—চুপ কর আর মসকরা করার সময় পেলে না। অসিতের এত সাধনার ফল উল্টা হইল দেখিয়া সে অনেকখানি দমিয়া গেল। অগত্যা জলের বাটীতে একটা চুমুক দিয়া থালার উপর জল ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। পাশের ভদ্রলোকটি বলিলেন—আহা করেন কি—অমনি করলে বাঁচবেন কেমন করে, এই খেয়েই বাঁচতে হবে যে !

অসিত বলিল—একটু অভ্যাস করে নিতে দিন মশাই—গলাটায় কেমন বাধ বাধ ঠেকচে।

ঘরে ঢুকিতেই জমাদার আসিয়া প্রত্যেককে গণিতে লাগিল—এক্—দো—তিন—চার······বিশ। ঠিক হ্যায়। জমাদার বাহির হইবামাত্র বাহির হইতে লোহার দরজা ঠেলিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

বন্ধ হইয়া একখানা কম্বল মেঝের উপরে পাতিয়া, আর একখানা ভাঁজ করিয়া বালিশের মতো করিয়া লইয়া অসিত সটান শুইয়া পড়িল। সারাদিনের উত্তেজনায় সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতেই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি অনুমান গোটা বারর সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া চাহিতেই দেখে ভোলানাথবাবু গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়া গুঁটি সুঁটি মারিয়া

বিছানার এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতে অসিত আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল আর কি—চন্দ্রালোকে হঠাৎ কোন জন্তুবিশেষের কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভোলানাথবাবুর চোখের দিকে তাকাইয়া অসিত একেবারে ঘাবড়াইয়া গেল—দেখিল দুই চোখ বাহিয়া তাঁহার জল গড়াইয়া পড়িতেছে। ঘরে আর কেহ জাগিয়া নাই—ধীরে ধীরে উঠিয়া অসিত জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে দাদা—শুয়ে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন।

—হাঁ এই বিছানায় গোষ্ঠীর কেউ কোনদিন শুয়েছিল না কি যে ঘুমোব? একে ঠাণ্ডা, তায় গায়ে যেন একেবারে বেতের কাঁটার মতো কুট্‌কুট্ করে বিঁধতে থাকে। তোমাদের যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা —আমার ভায়া এ পোষাবে না—এবার একেবারে কপালে নির্ঘাৎ মৃত্যু লেখা আছে দেখছি।

অসিত কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্যই তো এই বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার কল্পনা সে ইহার পূর্বে কোনদিন করিতেও পারে নাই এবং এতক্ষণ নেহাৎ ক্লান্তিবশতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, নইলে ঘুম তাহার চোখের ত্রিসীমানার কাছেও ঘেঁষিতে পারিত কিনা সন্দেহ! আর জেলে ঢুকিবার পর এই যে হাসিখুশি ভাবটি এটিও তো তাহার স্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহা ছাড়াও তো উপায় ছিল না, সে ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহারা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, সেটা ভাবিবার বিষয় বটে। সকালে আর এক দফা ক্ষুদ আর ভাঙ্গা চাউলের সহিত মিশাইয়া এক অপূর্ব খিঁচুড়ি প্রস্তুত হইয়া আসিল। ইহার নাম "লপ্‌সী"। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ইহারই এক এক ডাবু করিয়া গলাধঃকরণ করাইয়া তাহাদের ঢেঁকিখানায় লইয়া যাওয়া হইল। দেশসেবকেরা তিনজন করিয়া প্রত্যেক ঢেঁকিতে লাগিয়া গেলেন। ভোলানাথবাবু চোখ কপালে তুলিয়া পুনরায় বলিলেন—এ আবার কি?

—এই তো কাজ।

—কাজ?

—হ্যাঁ, সশ্রম কারাদণ্ড যে! প্রত্যেক ঢেঁকিতে আধমণ করিয়া ধান দেওয়া হইল—সারাদিনে ইহারই চাউল প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। সাধারণ কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ ছিল—ত্রিশ সের করিয়া—জেল-কর্তৃপক্ষ নেহাৎ সদাশয় বলিয়া এই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের, মোটে আধ মণ করিয়া ধানের চাউল করিতে দেওয়া হইয়াছে। আহারান্তে দ্বিপ্রহরের পরে অসিতকে একান্তে পাইয়া ভোলানাথবাবু একেবারে কাঁদিয়া বলিলেন—কি হবে অসিত?

অসিত প্রশ্ন করিল—কিসের দাদা?

—এমনি করে তো আমি থাকতে পারবো না ভাই?

—কি করতে চাচ্ছেন তবে?

—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি ভাই! অসিতের নিজের মনও বিশেষ ভাল ছিল না—তায় আজ দুইদিন ধরিয়া এই ভীরু ও দুর্বলচিত্ত লোকটিকে লইয়া সে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহার একেবারে বিরক্তির শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিল।

রাগ করিয়া বলিল—স্বদেশ উদ্ধারের বাতিকটা দাদা আপনার না করাই তো উচিত ছিল।

কিন্তু ভোলানাথবাবু রাগ না করিয়া বলিল—আগে কে জানতো ভায়া—সেজন্যে মনে মনে শতবার নাক-কান মলা খাচ্ছি। কিন্তু এখন উপায় কি বল তো—বাঁচতে তো হবে?

অসিত রাগ করিয়া বলিল—মানুষ অত শীগগির মরে না—আর দশজন ভদ্রসন্তান যেমন করে বাঁচছে, আপনিও তেমনি করেই বাঁচবেন।

ভোলানাথ যেন পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু অসিত ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল—যান, আপনার অত কথার রাতদিন আমি জবাবদিহি করতে পারিনে, কাঁদতে হয় একা একা ঘরের কোণে মেয়েমানুষের মতো বসে কাঁদুন। বলিয়া সে গট্ গট্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দিন দুয়ের মধ্যে জেলের সমস্ত ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শুনিয়া অসিত

একেবারে অবাক হইয়া গেল। ইহা যেন সম্পূর্ণ একটি পৃথক দেশ। ইহার সহিত বাহিরের জগতের কোনপ্রকার সংস্পর্শ নাই। কয়েদীরা এখানকার প্রজা—ওয়ার্ডার, জমাদার, জেলার সুপার—ইহারা সব পর পর পদমর্যাদা হিসাবে কেহ সেপাই, শান্ত্রী, মন্ত্রী, রাজা। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি উপমাই ইহার বাহির করা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক ভাল ভাল নামকরা সৎকর্ম করিয়া যখন তাহারই জোরে একটি বিশেষ রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন (সেখানকার আকাশ, বাতাস, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সেপাই-শান্ত্রীর চেহারার বর্ণনা এবং বিশেষ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া নরলোকের ভাল লোকগুলির জন্য কুম্ভীপাক......ইত্যাদি ভাল ভাল ব্যবস্থা আছে, যাহা কোনক্রমেই আমাদের মতো মর্তব্যবাসীদের কাম্য নয়) সেই রাজ্যের যিনি একচ্ছত্র সম্রাট, ধর্মরাজ, তাহারই সহিত সুপার, জেলার ইত্যাদির তুলনা করা যায়। জেলটি যেন সেই বিশেষ ভাল লোকদের নরলোক হইতে বিদায়ের পরবর্তী আশ্রয়স্থল। বাহিরের মানুষ যেন মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়া জেলে আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে যাহাদের সম্মানের পান হইতে চূণটুকু খসিলে আর রক্ষা থাকে না—এমন লোকও এখানে আসিয়া কয়েদী জন্ম ধারণ করিয়া রসুই বামুনের কাজ হইতে মেথরের কর্ম পর্যন্ত করিয়া যায়। ভারতবর্ষের এই জেলগুলির মত আহারে, বসনে, ভূষণে, মান-মর্যাদায়—এমন একাকার এমন সম-ব্যবস্থার কল্পনা বুঝি কোন দেশের কোন বড় নেতার মাথা দিয়া এখনও বাহির হইয়া পড়ে নাই—ভবিষ্যতে বাহির হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ ঘটে নাই।

এখানে সর্ব ঘটে কয়েদী। কয়েদী রান্না করে, কয়েদী জল তোলে, কয়েদী ঘানি ঘোরায়—এমনি এই রাজ্যের যাবতীয় কর্ম ইহাদের দিয়াই করান হয়। এমন কি মেথরের কর্মটিও বাদ যায় না। জেলখানা নাকি সংশোধনাগার, কোন কোন দেশের ব্যবস্থাও নাকি সত্যি সত্যি তাই। তর্ক করিয়া বলা যাইতে পারে—আরে

সেটা হ'লো শীতপ্রধান দেশের ব্যবস্থা—ভারতবর্ষের এই গরম দেশের নাড়ীতে ও ব্যবস্থা যে একেবারে অচল। আমরা মস্তক নত করিয়া একান্ত সুবোধ বালকের মতো 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য এবং আমরা যে কত বড় সুবোধ, তাহা যে কোন ইউরোপীয় সদাশয় ব্যক্তি যদি এই জেলখানাগুলি একবার ঘুরিয়া দেখিয়া যান, তিনিই এ সম্বন্ধে একমত না হইয়া পারিবেন না।

একদিন এক ভদ্রলোক জেল অফিস হইতে বলিয়া কহিয়া একখানা জেল "কোড" লইয়া আসিলেন। ইহারই ভিতর এক স্থানের খানিকটা পড়িয়া অসিত একেবারে অবাক হইয়া গেল। প্রতি কয়েদীর জন্য দৈনিক বার ছটাক চাউল, দুই ছটাক ডাউল, দুই ছটাক তরকারী।

পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—এতো সব চাল, ডাল যায় কোথায় দাদা ; অন্তত ভাত, ডাল, তরকারীর তো প্রচুর বরাদ্দ দেখতে পাচ্ছি ; কিন্তু আমরা যা পাই, সে তো মোটেই—

ভদ্রলোকটি বাধা দিয়া বলিলেন—আহা, সেটা আর বুঝছেন না —সুপার আছেন—জেলার আছেন—ডাক্তার আছেন—এঁরা কি সব অমনি অমনি খাটেন ? অসিত আশ্চর্য হইয়া গেল। ভদ্রলোক বলে কি ? সুপার নাকি অতি সজ্জন ব্যক্তি—জেলার ভদ্রলোক জাতিতে ব্রাহ্মণ—চাকুরীর খাতিরে, বৈদেশিক ধড়াচূড়া পরিলে কি হইবে—তবুও টিকি আর তুলসী মালা ছাড়েন নাই—তিলকের ঘটাটাও তদনুরূপ—একেবারে পরম বৈষ্ণব। ইঁহাদেরই এমনি কর্ম! ভদ্রলোকটি পুনরায় বলিলেন—মাইনেটাতে আর কি হয় দাদা—এইটেই যে আসল।

ইতিমধ্যে একদিন জমাদার আসিয়া কি কারণে যেন ভোলানাথবাবুকে অফিসে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিবার কারণ যাহা বর্ণনা করিলেন, সেটা ঠিক মত কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি করিয়া আরও দিন তিনেক পরে আবার তাঁহার অফিসে ডাক পড়িল, কিন্তু সেদিন

সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়া গেল—আর ভোলানাথবাবুকে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল না। পরের দিন প্রকাশ পাইল, তিনি "বণ্ড" লিখিয়া দিয়া অর্থাৎ জীবন থাকিতে আর এমন অপকর্ম করিবেন না—প্রতিজ্ঞা করিয়া খালাস পাইয়া বাঁচিয়াছেন। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা পরস্পর চোখে চোখে কি যেন ইসারা করিতেছিলেন। রাগে, দুঃখে ও লজ্জায় অসিতের একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। ভোলানাথবাবু যে তাহারই সহকর্মী, তাহার প্রতিই বা ইঁহারা ইহার পর কি ধারণা করিবেন—কে জানে?

দশম অধ্যায়

নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে কয়েকদিন খানিকটা উত্তেজনায় অসিতের দিন একরকম করিয়া কাটিয়া গেল। আজ বিকালবেলা সে একা একা তাহাদের দোতলা "ওয়ার্ডের" জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দূর আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল। নীল আকাশের গায়ে সাদা সাদা ছিন্ন মেঘের টুকরা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সেইদিকে দুই চোখ মেলিয়া এই অপূর্ব শোভার মধ্যে তাহার চিত্ত যে কতক্ষণ এমনি করিয়া একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহা সে নিজেই ঠিক পায় নাই। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি তাহার নীচের দিকে নামিয়া আসিল। দূরে হয়তো একখানা গ্রাম কাল সরু রেখার মত দেখা যাইতেছে—তাহারই সম্মুখে খানিকটা পাতলা কুয়াশা গ্রামখানিকে আরও অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখের মাঠটির উপর দিয়া এক ঝাঁক সাদা সাদা বক উড়িয়া গেল—দূরে একটা মহিষ ও গোটা কয়েক গরু চরিয়া বেড়াইতেছিল। মাঠের ভিতর একটি গাছের তলায় কয়েকজন রাখাল ছেলে বসিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে। আরও একটু কাছে হয়ত ওটা তেঁতুল গাছ তারপরে গোটা তিন চার আমগাছ। তারই পাশে ছোট কি একটা গাছে অজস্র সাদা সাদা

ফুল ফুটিয়া ভরিয়া আছে। মটর-শাকে সারা মাঠ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে —মনে হইতেছে, কে যেন সমস্ত প্রান্তরখানির উপর সবুজ রং লেপিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে রাই-সরিষার ফুলে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এইদিকে চাহিয়া অসিতের মনের ভিতর হু হু করিয়া উঠিল, হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়িয়া গেল। মা তাহার কি করিতেছেন এখন ? এই বিকালবেলা হয়তো সমস্ত গৃহকর্ম সারিয়া বুধি গাইয়ের ছোট বাছুরটার গলা চুলকাইয়া আদর করিতেছেন। বুধি হয়তো চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া জাবর কাটিতেছে। মায়ের পাশে হয়তো বসিয়া আছে কল্যাণী। কথাটি ভাবিতেই অসিতের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মধুর ব্যথা টন টন করিয়া বাজিতে লাগিল। তাহার নিজের অন্তরের দিকে তাকাইয়া সে যেন দেখিতে পাইল, সেখানে একটা তীব্র কামনা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নব যৌবনের এই কামনায় তাহার সারা দেহ এক অপূর্ব উন্মাদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ সকল চিন্তা ছাপাইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—মা তাহার এই সংবাদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়েন নাই তো—নিয়মমত স্নানাহার করিতেছেন তো ? না না, মা তাহার কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চোখ রাঙা করিয়া ফেলিয়াছেন—স্নানাহার ত্যাগ করিয়াছেন—এ যে সে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছে। দুই চোখ ছাপাইয়া তাহার অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সিঁড়ির দিকে শব্দ হইতেই সে গামছা দিয়া দুই চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল। কেহ দেখিলে কি মনে করিবে! ভোলানাথ কি শত্রুতাই না করিয়া গিয়াছে! একটু নির্জনে বসিয়া ভাবিতে বসিলে হয় তো আর সকলে আবার কত কি খারাপ ধারণা করিয়া বসিবে। "অসিতবাবু খেতে চলুন—খাবার এসে গেছে যে।" "চলুন, যাচ্ছি"—বলিয়া অসিত থালাবাটি হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

শেষ রাত্রির দিকে জাগিয়া উঠিয়াও তাহার মায়ের কথাই মনে হইল। কিন্তু আবার ভাবিল মা তো তাহার যে সে মা নয়—যে মা

শৈশব হইতে তাহাকে স্বাধীনতার কথা শুনাইয়াছেন—অসিতের এই স্বাদেশিকতার সকল উৎসের মূল যিনি—সেই মাকে সে আর দশজন বাঙালী ঘরের মায়ের মতো দুর্বল ভাবিয়া ছোট করিয়া দেখিবে কি করিয়া ? কথাটা ভাবিয়া অসিত অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—মন গেল লঘু হইয়া—সে শুইয়া শুইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

—"এসো কে কেঁদেছো নীরবে।

মায়েরি মুখপানে চেয়ে—এস কে মরিতে পারিবে।

নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল

বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল

যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল

দুর্বল সবল, সে কি ভাবিবে।"

এই স্বদেশী দলে সর্বপ্রথমেই এক ব্যক্তি অসিতের নজরে পড়িয়াছিল, ইঁহার নাম মধুকর দত্ত। ইনি লম্বায় যাকে বলে পুরা পাঁচ হাত তাহাই হইবেন। হাতপাগুলি যেন শরীর অনুপাতে অতিরিক্ত দীর্ঘ—মাথায় লম্বা লম্বা চুল কাঁধের উপরে নামিয়া পড়িয়াছে—মুখে একমুখ দাড়ি—চোখ দুটি যেন সদাসর্বদা জ্বলিতে থাকে—সেদিকে অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকা যায় না। তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতেন না—নিজের বিছানায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার এই আকৃতি ও প্রকৃতি যেন অন্য সকল হইতে তাঁহাকে অনেকখানি পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তাই অসিতও এই কয়দিন তাঁহার সহিত বড় একটা মিশিবার সুযোগ পায় নাই। সেদিন একটা ঘটনায় এই লোকটির উপরে শ্রদ্ধায় অসিতের সারা অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল—শুধু তো দেহই নয়—তাঁহার মনের বলের পরিচয় পাইয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ জেল পরিদর্শন করিতে আসিবেন—তাই সকাল হইতে সারা জেলে সেদিন সাজ সাজ রব—কোথাও একটুকরা আবর্জনা পড়িয়া আছে কিনা, সেদিকে খরদৃষ্টি রাখিয়া জমাদার, সেপাই সর্দারী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব যখন সুপার,

জেলার প্রভৃতি পারিষদ সহ তাহাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন —তখন মধুকর গেলেন আগাইয়া। তাঁহার বক্তব্য ছিল "জেলের কাজ স্বদেশী কয়েদীরা করিবে না" কিন্তু তিনি কথা কহিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই হাবিলদার উপদেশ দিল—সাহেবকে সেলাম দেও। মধুকর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া যাইতে-ছিলেন—হাবিলদার পুনরায় তাঁহাকে বাধা দিল কিন্তু তিনি একবার মাত্র তাহার দিকে ভ্রুকুটি করিয়াই পুনরায় নিজের কথা আরম্ভ করিলেন। অসিত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল—দেখিল তাঁহার দুইচোখ ইতিমধ্যেই একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু পুনরায় হাবিলদার তাঁহার কথায় বাধা দিতেই—তিনি একেবারে সিংহের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—চোপ !—সেই গর্জন যেন সমস্ত জেলখানা কাঁপাইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত ম্যাজিস্ট্রেট্, সুপার, জেলার কাহারও মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব সত্যিকারের সাহেব। এক মুহূর্তে তাঁহার চোখ মুখ একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন —"ও বেচারার দোষ কি ? আমার সরকারী মর্যাদাটাতো তোমাকে দিতে হবে।"

মধুকরও অনর্গল শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরাজীতে বলিয়া গেলেন—"কিন্তু একজন ভদ্রলোকের যাহা প্রাপ্য তাহা তোমাকে দিয়েছি—তার বেশী তোমার প্রাপ্য নয়।"

ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে আমাকে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ করেছেন, তা অস্বীকার করছ কেমন করে ?"

মধুকর অম্লান বদনে জবাব দিলেন—"তোমার গভর্নমেণ্টকে আমি মানিনে"—

ম্যাজিস্ট্রেট্ হইতে স্বদেশী কয়েদীরা পর্যন্ত এই কথায় একেবারে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুনরায় বলিলেন,—"তুমি বলছো কি পাগলের মত। তোমাদের বড় বড় নেতার মুখ দিয়েও তো আজ পর্যন্ত এমন কথা শোনা যায়নি।"

মধুকর জবাব দিলেন—"অন্যের কথা জানিনে, আমার কথা তোমাকে বলেছি—এইমাত্র।"

ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব অনেকখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন,—"তোমার মতিগতি সত্যি ভাল নয়। আমি এ নিয়ে কিছু করতে চাইনে, কিন্তু অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ হ'লে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোত না, ভবিষ্যতে সাবধান হ'য়ো।" বলিয়াই তিনি বড় বড় পা ফেলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

মধুকর সেখানেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—তাঁহার ঠোঁটে মুখে ব্যঙ্গের হাসি খেলিয়া গেল, দুই চোখ তেমনি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। •

দিন দুই পরের কথা। আজিও অসিত তাহার বিছানার কাছের জানালাটির ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজিও সেদিনের মতই নিজেদের বাড়ির কথা—মায়ের কথা ভাবিয়া মন তাহার বারে বারে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কাহার স্পর্শ পাইয়া সে চম্‌কাইয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখে মধুকর আসিয়া তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

অসিত আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—"দাদা আপনি!"

মধুকর হাসিয়া জবাব দিলেন—"হ্যাঁ ভাই! এমন একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ির জন্য মন কেমন কচ্ছে?"

অসিত তাড়াতাড়ি যেন কি বলিয়া প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু তিনি পুনরায় তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"না না ভাই মন তোমার ভাল নেই, আমি বুঝতে পেরেছি—ছেলেমানুষ তো! বাড়িতে কে কে আছেন অসিত? মা আছেন তো?" অসিতের দ্বিধা ও সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল—বলিল—"হ্যাঁ, মা আছেন দাদা!"

—আর কে কে আছেন ?

—বাড়িতে তো আর কেউ নেই—দাদা আছেন কল্‌কাতায় চাকুরী করেন।

মধুকর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা যার আছে তার সব আছে—মার জন্যে যদি চোখের জল না আসে তো কার জন্যে আসবে ভাই! মা আমার কতকাল ছেড়ে গেছেন, কিন্তু এখনও প্রতি দিনরাত্রে তাঁরই জন্যে দুই চোখ জলে ভেসে যায় ভাই। মাকে কি এত সহজে ভোলা যায় রে ?

সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়া অসিতের দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মধুকর তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—দেশের কাজে দরকার হ'লে আবার জেলে আস্‌বো—হাসিমুখে প্রাণ দেবো—কিন্তু তাই বলে মাকে কখনও ভুলবো না অসিত।

ঘরে এই সময়টাতে কেহ থাকিত না—সকলেই বাহিরের আঙ্গিনাটুকুতে ঘাসের উপর বসিয়া বসিয়া গল্প গুজব করিত, অসিত পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয় ভুলবো না। আর আমার মাকে তো আপনি জানেন না দাদা—মা আমার ছোটবেলায় মুখে মুখে রাণা প্রতাপের গল্প করতেন, সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলতেন, হেমচন্দ্রের কবিতা, পলাশী যুদ্ধের কবিতা এ সব তাঁর মুখে শুনে শুনেই আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। খুব লেখাপড়া জানেন তিনি। মা আমার যেন এ কালের মেয়ে নন। আমার দাদামশায় সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংরেজদের হাতে মীরাটে বন্দী হন্—মার বয়স তখন মোটে এক বৎসর—তাঁকে কোলে নিয়ে দাদামশায় পালিয়ে আসেন। মার ছোট কাকু বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বনে বনে বহুদিন ঘুরে—পরে গোরা সৈন্যের গুলিতে মারা যান। মা তার ছোট্ট অসিকে রোজ শেষ রাত্রে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে এই সব গল্প করতেন। সব সময় ভাবতাম কবে আমি তাঁর মত ঘোড়ায় চড়ে, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব!

মধুকর মুগ্ধ দৃষ্টিতে অসিতের দিকে তাকাইয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন, দুই চোখ তাঁহার খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অসিত চুপ করিলে পর বলিলেন, "মা তোমাকে অসি বলে ডাকেন বুঝি?" অসিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"—"সত্যিই তুমি অসি—একেবারে মুক্তঅসি—খাপখোলা তলোয়ার—তোমাকে আমার সত্যিই ভাল লাগে ভাই।"

অসিত লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনি বড় কিনা তাই সকলকে বড় করে দেখেন।—ইঃ, আপনার সেদিনকার কি মূর্তি! সেদিনকার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না দাদা। আর কি কারু সাধ্যি ছিল—ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেবকে এত বড় কথা বলে!

মধুকর তাহাকে পূর্ব কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—সত্যি তোমাকে আমার ভাল লাগে অসি—আমি মানুষ খুঁজি—মানুষ চিনিও বোধ হয়। তোমার চোখে যে আলো দেখছি ভাই—এখানে আর একটা লোকের চোখেও সে আলো দেখতে পাই নি। ঐ যে নীচে যারা দল বেঁধে বসে গল্প করছে ওর ভিতরে তোমাদের ভোলানাথের মতো কত যে ভোলানাথ লুকিয়ে আছে, সে কথা তো জান না ভাই। এদের সখ করে হুজুগে মেতে জেলে আসা। অসিত অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে বলিল—আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন—আমাকে সত্যিকারের পথ দেখিয়ে দেবেন দাদা!

মধুকর তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—নিশ্চয় ভাই! আমি নিজে যা যখন বুঝবো সব তোমাকে বলবো—দুইজনে একসঙ্গে বসে ভাববো।

অত্যল্পকাল মধ্যে দুইজনের ভাব যতই অন্তরঙ্গতায় গিয়া পৌঁছিতে লাগিল—ততই মধুকরের সমস্ত পরিচয় জানিয়া—অসিতের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই বয়সে তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন, জার্মানীতে, ফ্রান্সে গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যার পরিধিও অসিত করিয়া উঠিতে পারিল না। জার্মান ভাষা ফরাসী ভাষা এবং ভারতীয় ৩।৪টা ভাষায় রীতিমত তাঁহার দখল আছে। নিজের এত যে বিদ্যা,

এত যে অভিজ্ঞতা তাহাও কোনদিন যে ধন উপার্জনের জন্যে নিয়োজিত হইবে তাহাও মনে করিবার কোনই কারণ নাই। এই বয়স পর্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই—কখনও যে করিবেন সে কল্পনাও নাই। এমন অদ্ভুত লোকের সংস্পর্শে আসা তো দূরের কথা অসিত মনে মনে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় জেলের একটি নির্জন কোণ বাছিয়া লইয়া অসিত আর মধুকর কথা কহিতেছিলেন।

অসিত এক সময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা দাদা, আমাদের এই আন্দোলনে কি সত্যি সত্যি বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হবে?

মধুকর অম্লানবদনে জবাব দিলেন—যা খুশী হোক্ ভাই। ও নিয়ে মনে কোন আগ্রহ নেই।

অসিত আশ্চর্য হইয়া কহিল—তার মানে?

—মানে অতি সহজ—বঙ্গ ভঙ্গই হোক্ আর নাই হোক্, তাতে দেশের স্বাধীনতা এক ইঞ্চি এগোবেও না পিছোবেও না।

—কিন্তু এই বিভাগে বাঙলা দেশটা যে একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়বে দাদা—এর সংস্কৃতি এর সম্মিলিত শক্তি—

মধুকর তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—সে সব তো জানি ভাই কিন্তু বলতে পার তাতে দেশের এই যে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে শুকিয়ে মরছে—লক্ষ লক্ষ লোক অর্ধাহারে থাক্‌চে এর কোন প্রতিকার এতে হবে? অশিক্ষার অন্ধকারে যে সারা দেশটা একেবারে ডুবে গেল! নিজেদের দেশে এই দাসের জীবন বহন করে চরম অপমানকে মাথায় করে নিয়ে—ত্রিশ কোটি মানুষ দিনে দিনে অমানুষ হ'য়ে উঠছে সে কথা কি কখনও ভেবে দেখেছো!

অসিত কোন জবাব দিল না।

মধুকর পুনরায় বলিতে লাগিলেন—না সত্যি এতে কোন প্রতিকার হ'বে না ভাই—কোন আন্দোলনকে ছোট করে দেখবার ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু যাঁরা এর কর্ণধার তাঁদের মুখ দিয়েও তো

কোনদিন এই সব অনাহারে অর্ধাহারে মৃতকল্প লোকদের জন্যে একটি দিনের তরে একটি কথাও বেরোয় নি।

অসিত বলিল—কিন্তু এই যদি আপনার ধারণা—তবে নিজে কেন এরই জন্যে জেল খাটতে এসেছেন ?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—কেন এসেছি, শুনবে ?

আসলে আন্দোলন আমি ভালবাসি—এতে মানুষের মনে একটু একটু করে সাহস এনে দেয়, পরে সেই সাহস ঘুরিয়ে নিয়ে হয়তো বৃহত্তর কোন কাজেও লাগান যেতে পারে। আর একটি কাজ কি হয় জান ? এতে মানুষ চেনা যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের সন্ধান না মিলুক এমন দুই চারজন লোক পাওয়া যায়—যারা সত্যি সত্যি দেশের জন্যে কাঁদে—সত্যিকারের সাহস যাঁদের মনে আছে। এমনি করে জেলে না এলে আজ কি তোমাদের মত দুই চারজন সাহসী প্রাণের সন্ধান পেতাম ভাই !

অসিত পুনরায় তর্ক তুলিল—আচ্ছা দাদা, যাঁরা আজ দেশের নেতা তাঁরা কি সত্যি করেই দেশের এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন যারা তাদের খবর জানেন না ? এ হয় তো আপনার মিথ্যে সন্দেহ।

মধুকর ম্লান হাসিয়া বলিলেন—মিথ্যে নয় ভাই—সত্যি করে যদি কেউ এ দেখতে পায়—সত্যি করে যদি অনুভব করতে পারে—সে পাগল হ'য়ে যাবে।

—আপনি কি এমনি করেই দেখতে পেয়েছেন দাদা ?

—হাঁ দেখেছি ভাই—শুধু একটা নয়—দুটো নয়—কত ঘটনায় যে আমাকে কত দুঃখের সাক্ষী হতে হ'য়েছে অসি—তার সব কথা তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারবো না—বুঝাতেও পারবো না। একটা গল্প শোন—বয়স তখন আমার চৌদ্দ-পনর—আমি পিসিমার বাড়ি থেকে লেখাপড়া করি। পিসিমার বাড়ির কাছে এক ঘর মুসলমান চাষীর বাস—তার নাম ছিল করিম সেখ। বড় গরীব, এত গরীব যে দুবেলা ভাল করে খাবার চাল তাদের কোনদিনই জুটতো না। নিজের হাল বলদ ছিল না, এদিকে সংসারে তার ছোট ছোট দুটি

ছেলে ও স্ত্রী। তবু পরের বাড়ি খেটে খুটে এমনি করে কোন রকমে দিন তাদের চলে যাচ্ছিল। আমাদের বাড়িতে করিমের স্ত্রী মাঝে মাঝে এসে পিসিমার কাছ থেকে চালটা ক্ষুদটা চেয়ে নিয়ে যেতো। কিন্তু রোজ রোজ কে কাকে দেয় বল? পিসিমা দুই একদিন হয়তো রাগ করতেন—বউটি উঠানের এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতো। তারপর হয়তো পিসিমা আবার তাকে ডেকে আঁচলে তার চাট্টি চাল বা ক্ষুদ ঢেলে দিতেন; বলতেন, এমনি করে কি যখন তখন চাইলে দেওয়া যায়? আমি কতদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছি তবু বউটির দুই চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো—আমাদের উঠান হ'তে নেমেই একেবারে জোর পায়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটে যেত। কিন্তু সেবার দেশের বড় দুর্দিন—ধান ভাল হ'লো না—চালের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। এদিকে করিমের মজুরী গেল কমে—তাও রোজ কাজ জুটতো না। দিনের পর দিন চলতে লাগলো উপবাস। কিন্তু এমনি করে কয়দিন চলতে পারে—মানুষ তো? কচি ছেলে দুটি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে তুলতো। মা তাদের সারাটা দিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিরাশ হ'য়ে শুধু হাতে ফিরে আসতো—করিম চাষী পাড়ায়, ভদ্র পাড়ায় ঘুরে কাজ পেত না। কোনদিন সন্ধ্যা বেলায় দুমুঠো ক্ষুদের জাউ অনেকখানি জলে গুলে নূন দিয়ে ছেলে দুটোকে খেতে দিত—ছেলে দুটো তাই পরমানন্দে খেয়ে খানিকটা সময়ের জন্যে চুপ করে থাকতো। পিতামাতা তাদের পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতো। কিন্তু দিন আর কাটে না। সেদিন তিনদিন স্বামী স্ত্রীর আহার জোটে নাই। আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম—পিসিমাকে করিমের স্ত্রীকে বলতে শুনলাম—এই চাট্টি মুড়ি নে বউ—আমি আর দিতে পারবো না—আর আসিস্ নে। আমার মনে কথাটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগলো। সেদিন তিনদিন অনাহারের পরে করিম যেন কোথা হ'তে সের দুই চাল এনে স্ত্রীকে দিয়ে বল্লে—ভাত তুলে দে বউ—আমি ডোবা থেকে চাট্টি মাছ ধরে আনি। ঘণ্টাখানেক পরে করিম

ফিরে এসে দেখে বউ তার দুই চোখের জলে বসে বসে ভাসছে, ছেলে দুটি ভাত ভাত করে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে। করিম জিজ্ঞাসা করে জানলো যে সে বাড়ি থেকে বেরুবার পরই প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের চৌকিদার এসে ট্যাক্সের জন্যে তার চাল দুই সের ক্রোক করে নিয়ে চলে গেছে। সংবাদ শুনে করিম কয়েক মুহূর্ত নাকি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—তিনদিন অনাহার—তারপরে এই ঘটনা—তাকে একেবারে পাগল করে দিল। সে কি ভেবে দাওয়ার উপর যে চক্‌চকে দাওখানা ছিল তাই দিয়ে বউয়ের গলায় গোটা দুই কোপ বসিয়ে দিল—বউটা চীৎকার করে ঢলে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটিও তার এক এক কোপে নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর করিম এক গাছা দড়ি নিয়ে ছুটে গেল আম বাগানে। সেখানে গিয়ে আম গাছের ডালে গলায় ফাঁসী দিয়ে—তবে বেচারা সকল জ্বালা জুড়োল। খবর শুনে আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম দেখতে। দেখি ছেলে দুইটি উঠানের উপরে সারা গায়ে রক্ত মেখে যেন চুপ করে ঘুমিয়ে আছে। মার দেহে তখনও প্রাণ ছিল চোখের তারা নড়ে নড়ে উঠছিলো। একটু পরেই সব শেষ হ'য়ে গেল। মধুকর চুপ করিলেন।

অসিত চাহিয়া দেখিল তাঁহার দুই চোখ দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে—অসিতের কণ্ঠও রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল—দুইজন অনেকক্ষণ তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুকরই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন—জীবনে কোনোদিনই আর এ ঘটনাটি ভুলতে পারলাম না ভাই। সেদিন সারা দিনরাত্রি ধরে আমি কেঁদেছিলাম। তারপর বহুদিন শুধু মনে মনে এই প্রশ্নই করেছি। কেন এমন হয়? কেন মানুষ মোটে তার মুখের দুমুঠো অন্নের সংস্থানও করে উঠতে পারে না? তখন বয়স ছিল অল্প—বুদ্ধি দিয়ে এর মীমাংসায় আসতে পারতাম না। আজ যত বুঝি ততই মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। আর শুধু এই ঘটনাই তো নয়—এমনি কত ঘটনা যে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ

করেছি—মানুষকে পশুর মত বিনা চিকিৎসায় ক্রমাগত দিনের পর দিন রোগে ভুগে মরতে দেখেছি—পিতামাতা চোখের উপরে নিজেদের সন্তানকে ক্রমাগত দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় একটু একটু করে মরতে দেখে ভগবানের কাছে তারই মৃত্যু কামনা করেছে —সে সব শুনলে তুমি ব্যথা পাবে ভাই! এই সব দেখে শুধু ভেবেছি—মানুষ যদি এমনি করে পশুর মত মরে তাহ'লে তার মানুষ হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কি? বলদ হাল টানে কিন্তু পেট ভরে খেতে পায়—মানুষ কাজ পায় না—খেতে পায় না—বিধাতার একি পরিহাস! শুধু এই জন্যেই আমি ভারতবর্ষের বাইরে অনেক ঘুরেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন পথ খুঁজে পাই নাই। আর আমি শুধু একাই নই অসি—কলকাতায় যদি কখনও যাও তোমার সঙ্গে আমি অনেকের পরিচয় করিয়ে দেবো। তারা শুধু এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

অসিত বলিল, কিন্তু চিরটা কাল ধরে শুধু পথ খুঁজে বেড়ালেই তো চলবে না দাদা—পথে চলতে হ'বে যে!

—হাঁ চলতে হবে বৈ কি ভাই—আজও ঠিক পথ আমরা পাই নি, তবে পেতে যে বেশী দেরী হবে তাও মনে হচ্ছে না। এইটুকুমাত্র বলতে পারি ভাই সে হ'বে পরম দুঃখের পথ—চরম নির্যাতনের পথ। নিজের জীবনকে সংসারের সকল সুখ থেকে সকল ভোগ থেকে বঞ্চিত করে, একেবারে দেশ মাতৃকার সেবায় নিঃশেষ করে দিতে হবে। পুরস্কার কিছু ভাগ্যে মিলবে না—হয়তো কেউ ঘৃণা করবে—কেউ দস্যু বলবে—এমনি কত কি। কিন্তু যে সত্য করে দেশকে ভালবাসে অসিত, এই হবে তার দেশের কাজে 'আত্মসমর্পণ যোগ' —এই তার ধর্ম, এই তার মোক্ষ। যেদিন তোমাকে ডাক দেব, অসি—সেদিন কিন্তু পিছিয়ে যেতে পারবে না ভাই।

অসিতের সারা দেহ ও মন একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল—না পিছিয়ে যাব না, পথ আপনি দেখাবেন। প্রয়োজন হ'লে জীবন আমার পণ রইলো দাদা।

একাদশ অধ্যায়

দিন যতই যাইতে লাগিল আত্রেয়া দেবীর শরীরও ততই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কল্যাণী বা তাহার মাতা আসিয়া পীড়াপীড়ি না করিলে—কোনদিনই সময়মত স্নানাহার করিতেন না। দিনরাত বিছানার উপরে চুপ করিয়া পড়িয়া দূরের মাঠের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। গৃহকর্ম, তাঁহার জন্য দুটি রান্না করা, সে সমস্তই কল্যাণী করিত। আত্রেয়ী দেবীর এক কাকার বৎসর খানেক হইল মৃত্যু হইয়াছিল—তিনি মৃত্যু সময় তাঁহাদের পৈত্রিক বিষয়ের আয় হইতে বড় ভাই ধরানাথের দৌহিত্রদের জন্য একটি মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। অমিয় টাকা লইতেন না—মায়ের নিকটই প্রথম হইতে সমস্তটা ধরিয়া দিতেন। আত্রেয়ী নিজে টাকা-পয়সার কোন হিসাব রাখিতেন না—সমস্তই কল্যাণী করিত।

সেদিন রান্না শেষ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কল্যাণী আত্রেয়ী দেবীর জন্য বসিয়াছিল—কিন্তু সেই যে কখন তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন, আর ফিরিতেছেন না। অবশেষে সে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মাকে খুঁজিতে পাঠাইল। কাত্যায়নী দেবী নদীর ঘাটে আসিয়া দেখেন, ঘাটের একপাশে মেয়ে-পুরুষ কতকগুলি ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর ভোলানাথ যেন হাত নাড়িয়া কি সব বলিয়া যাইতেছে। কাছে আসিয়া দেখিলেন—সেই ভীড়ের একপাশে ভোলানাথের কাছে আত্রেয়ী দেবী বসিয়া আছেন। ভোলানাথ তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিতেছেন—বুঝলে মাসী, সে কি ভীষণ জায়গা—আমি কি আর সাধ করে এই নাকে খৎ দিয়ে এসেছি? ঢেঁকিতে ধান ভান, ঘানি ঘোরাও, ময়দা পেষো, যদি না পারলে অমনি হাতে হাতকড়ি—পায়ে বেড়ি দিয়ে বেত লাগাবে। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে তো; তারপর খাওয়ার কথা আর

শুনো না মাসী—বাড়ির গরু-বাছুরগুলিকেও আমরা তার চেয়ে যত্ন করে খেতে দিই। ভাতের চেহারা দেখলে হয়ে আসে—ডাল তরকারির কথা আর কি বলবো। ডাল তো শুধু হলুদ গোলা জল, আর তরকারির ভিতর ঘাস সেদ্ধ—বটের পাতা সেদ্ধ—এই সব। ইস এই কয়টা দিনে না খেয়ে যে একেবারে শুকিয়ে গেছি।

ভিড়ের ভিতর হইতে একটি দুষ্ট ছেলে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—কয় হাত মেপে নাকে খৎ দিলে ছেড়ে দেয় দাদা! ভোলানাথ চটিয়া বলিল—বড় যে দাঁত বের করে হাসছো—যাও না একবার দেখে এসোগে ব্যাপারটা একবার। বণ্ড লিখে দিয়েছি— আর কখনও এমন কাজ করবো না। তাতে হয়েছে কি শুনি! নিজে যদি এমনি করে মারা যাই তো বঙ্গ ভঙ্গই হোক আর নাই হোক আমার কি? আগে বুঝিনি ভাই, তাই নাক কান মলছি— ওতে আর আমি নেই। আত্রেয়ীর বুকের ভিতরে বারে বারে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া দিতেছিল—অতি কষ্টে দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন—অসি কেমন আছে ভোলানাথ?

ভোলানাথ তেমনি করিয়াই জবাব দিল—কেমন আর থাকবে মাসী! সবারই এক অবস্থা, মানুষ তো সবাই—গরু ভেড়া তো আর কেউ সেখানে যায় নাই যে, ঐ সব ছাইপাঁশ মুখ বুঁজে গিলবে। তবে ওদের সোমত্ত বয়েস কিনা—দুই চার দিন রক্তের জোরে কোন রকমে টিঁকে থাকবে—তারপর যখন শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে রোগা-পটকা হয়ে যাবে—তখন একদিন কাউকে না জানিয়ে চুপ করে জেল অফিসে এসে আমারই মত এমনি নাকে খৎ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তুমি ভেবো না মাসী—এমনি করে বেশি দিন সেখানে থাকতে পারবে না।

আত্রেয়ী জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন—না না ভোলানাথ, তোমরা তাকে জানো না—সে ফিরে আসবে না—মাথা হেঁট সে কিছুতেই করবে না—সে যে তেমন ছেলে নয়।

বলিতে বলিতে দুই চোখ দিয়া তাঁহার অশ্রুধারা একেবারে শ্রাবণের ধারার মতোই গড়াইতে লাগিল—কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হইয়া।

ভোলানাথ বলিয়া উঠিল—ইস—আসবে না আবার! যখন ঘানি গাছে জুড়ে দেবে তখন বাপ বাপ বলে···

হঠাৎ কাত্যায়নী দেবী চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন—তুই থাম তো ভোলানাথ—আর বক্তিমে করতে হবে না।

—তুমি ওঠো বোন—আর এখানে এমনি করে আমি কিছুতেই বসে থাকতে দেবো না—বলিয়া কাত্যায়নী দেবী জোর করিয়া আত্রেয়ীকে ধরিয়া তুলিয়া বাড়ির দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু আহারে তাঁহাকে আর বসানো গেল না। কাত্যায়নী দেবী বুঝিলেন এখন পীড়াপীড়ি করিয়াও কোন লাভ নেই—তাই তাঁহাকে কাপড় বদলাইয়া বিছানায় লইয়া শোয়াইয়া দিলেন।

কিছুদিন হইতে আত্রেয়ী দেবীর প্রথম রাত্রে অল্প অল্প জ্বর আসিত এবং শেষ রাত্রের দিকে ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যাইত। সর্বদা খুক খুক করিয়া কসিতেন। বুকের একটা পাশ একটু একটু বেদনা করিত—নিজে সমস্তই লুকাইয়া চলিতেন—কল্যাণী বা কাত্যায়নী দেবী কাহাকেও কিছু বলিতেন না; কিন্তু কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে যে জ্বর আসিল তাহা আর সেই রাত্রেই ছাড়িয়া গেল না। কয়েকটা দিন ধরিয়া রীতিমত বিক্রম প্রকাশ করিয়া কমিয়া গেল বটে; কিন্তু তাহার পর হইতে অল্প অল্প জ্বর আর কাসি সর্বদা লাগিয়া রহিল। শরীর উঠিল নিতান্ত দুর্বল হইয়া—বিছানা হইতে বড় একটা উঠিতেন না। রাতদিন চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতেন। এদিকে কাত্যায়নী দেবী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এমনি করিয়া অত্যাচার করিলে শরীর তাঁহার কয়দিন টিকিবে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের কন্যার ভবিষ্যতের চিন্তাও তাঁহাকে একান্তভাবে পাইয়া বসিল। যদি আত্রেয়ীর ভাল মন্দ একটা কিছু হইয়াই যায়, তাহা হইলে কল্যাণীর বিবাহের কি হইবে? অসি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ যে করিবেই তাহারই বা এমনি কি নিশ্চয়তা আছে?

ভাবিতেই সারা দেহ তাঁহার ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ বিবাহ যে নিশ্চিত তাহা তাঁহারা মনে করিয়া আছেন। গ্রামের লোক জানিয়াছে এবং ইহা লইয়া একটা দুর্নামের কানাঘুষা পর্যন্ত কখনও কখনও চলিয়াছে। এমন কি মেয়ে তাঁহার ইহা যে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইয়াছে এমনই নয়—সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। মেয়ের মনের গোপন কামনা—মায়ের চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এখন যদি কোন রকমে এ বিবাহ না হয়, তবে মেয়ের বিবাহ আর যে কোথাও সহজে হইতে চাহিবে না—সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তারপর মেয়েও তো তাঁহার রাজী হইবে না। সেদিন বিকাল বেলা কাত্যায়নী দেবী আত্রেয়ীর বিছানার ধারে গিয়া বসিয়া বলিলেন—এখন কেমন আছ দিদি? আত্রেয়ী তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—শরীর তো আমার ভাল হয়ে গেছে দিদি!

কাত্যায়নী বলিলেন—তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না বোন! শরীর যে তোমার দিন দিন একেবারে খারাপ হয়ে পড়ছে এতো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ধীরে ধীরে আত্রেয়ীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—এমনি করলে যে শরীর আর বেশি দিন টিকবে না বোন! দুটো মাস তো গেল আর কয়টা মাস পরে ফিরে এসে অসিত কার কাছে দাঁড়াবে বলতো?

অসিতের নাম করিতেই আত্রেয়ী একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মত তাঁহার দুই চোখ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাত্যায়নী নিজের আঁচল দিয়া তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—অত অধৈর্য হলে তো চলবে না বোন। বুদ্ধি দিয়ে বিদ্যা দিয়ে বিপদকে জয় করতে হয়। তুমি এত যে লেখাপড়া কর—এত যে বুদ্ধি রাখ—তা যদি আজ এই বিপদের দিনে তোমাকে এতটুকু ধৈর্য ধরতে না শেখায়, তবে তার লাভটা কোনখানে বলতো বোন?

খানিকটা শান্ত হইয়া আত্রেয়ী বলিলেন—কিন্তু আমি যে পারিনে—দিদি! অসিত আমার জেলের ঘানি ঘোরাচ্ছে—যাঁতায় ময়দা পিষছে—ধান ভানছে—যে খাদ্য মানুষে মুখে তুলতে পারে না, তাই খেয়ে দিন কাটাচ্ছে এ আমি কোন প্রাণে সইব দিদি?

অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আত্রেয়ী চুপ করিলেন।

কাত্যায়নী পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু আমি তো শুধু তোমাদের কথাই ভাবছিনে বোন। তুমি কবিরাজ দেখাবে না—ওষুধ খাবে না—এমনি করলে যে শরীর তোমার বেশি দিন টিকবে না—সে তো জানা কথা; কিন্তু তাহলে আমার কল্যাণীর বিয়ের কি হবে?

বলিতে বলিতে কাত্যায়নীর দুই চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আত্রেয়ী অনেকটা বিচলিত হইয়া বলিলেন—কিন্তু কল্যাণীকে তো আমি নিয়েছি, ওকে যে অসিতের জন্যেই নিজের হাতে তৈরি করেছি—এ সে জানে—দিদি।

—কিন্তু কথা যদি সে না রাখে বোন?

—আমি জানি দিদি, অসিত আমার কথা কোনদিন ফেলবে না। ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—কল্যাণীর মঙ্গলামঙ্গলের কথা আমিও তো কম ভাবিনি দিদি—তবু তোমার মায়ের প্রাণ—তুমি যেমনি করে দেখতে পেয়েছো আমি তেমনি করে পাইনি। তোমার কথাই ঠিক দিদি। তুমি কবিরাজ বাড়ি লোক পাঠাও—এখন থেকে ওষুধ আমি খাবো—শরীরের উপর আর অযত্ন করবো না—দেখি এ কয়টা মাস যদি তাতে কোন রকমে টিকে থাকতে পারি!

—আমি এখনই লোক পাঠাচ্ছি বোন।

বলিয়া কাত্যায়নী দেবী উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

পরের দিন সকালে কবিরাজ মহাশয় রোগী দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া

বলিলেন—বড় দেরী হয়ে গেছে—ক্ষয়কাসে দাঁড়িয়েছে। কি হবে বলতে পারিনে। মাস খানেক ধরিয়া চিকিৎসার পরও যখন রোগ কিছুমাত্র আরোগ্য হইল না বরং দিন দিন শরীর তাঁহার একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন কল্যাণী ও তাহার মাতা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে অমিয় আসিলেন। এই মাস তিনেকের মধ্যে মায়ের শরীর যে এমনি করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মা যে এযাত্রা আর ফিরিবেন না তাহা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মায়ের বিছানায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—আমাকে কি শেষে এমনি করেই শাস্তি দিলে মা! অসময়ে আমাকে দূরে দূরে রাখলে—নিজের অসুখের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলে না—এ দুঃখ আমি কেমন করে সইবো? অসিত ফিরে এলে তাকে কি জবাব দেব?

আত্রেয়ী ধীরে ধীরে অমিয়র মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—তোর কোন দোষ নেই বাবা, এ আমার কর্ম্মফল! অসিকে যদি আমি আর সত্যিই দেখতে না পাই বাপ—তাকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিস। ফিরে এসে যদি আমাকে না দেখতে পায়—সে বড় কষ্ট পাবে রে! উদ্গত দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। দুই চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। আহারাদির পর কাত্যায়নী দেবী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—আমার কল্যাণীর কি হবে বোন? অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া আত্রেয়ী ধীরে ধীরে বলিলেন—তোমার কথা আমি বুঝেছি দিদি—আমি আর সত্যিই বাঁচবো না—কল্যাণীর কথা আমি ভুলিনি—তার ব্যবস্থা আমি করে যাব। এ শুধু আমার ইচ্ছা নয়—এ তার মায়ের শেষ আদেশ। তোমরা ভয় করো না—তার মায়ের আদেশ সে অবশ্য রাখবে দিদি। এ বিশ্বাস তার 'পর তোমরা চিরদিন রেখো। তুমি কল্যাণীকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও আর

আমি দেরী করবো না—আজই লিখে রাখি এর পর হয়তো আর সময় পাব না।

অতি কষ্টে কয়েক ছত্র লিখিয়া কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কল্যাণীর হাতে দিয়া বলিলেন—খুব ভাল করে রেখে দিয়ে এসো মা—দেখো যেন হারায় না। অসি ফিরে এলে তাকে দিও।

পত্রখানা রাখিয়া কল্যাণী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল।

আত্রেয়ী কল্যাণীর একখানা হাত নিজের দুইখানি শীর্ণ হাত দিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া—অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন—মা রে!

কল্যাণী জবাব দিল—কেন মা?

মাতৃ সম্বোধনে আত্রেয়ীর মুখ চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন—এখন থেকে আমাকে মা বলেই ডাকিস কল্যাণী!

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল—তাই ডাকবো মা!

কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী পুনরায় বলিলেন—চিঠিখানা তাকে তুই নিজ হাতে দিস মা। লজ্জা তাতে নেই। ভগবান তোদের দুজনকে সেই ছোটবেলা থেকে এক করে দিয়েছে—আমরাও তাঁর ইচ্ছাই মাথা পেতে নিয়েছি—কিন্তু দেখিস মা, কখনও যেন ভুলেও অসির উপরে অবিশ্বাস রাখিস নে। ছোট কাজ কোনদিন সে করেনি—এ আমি আমার এই শেষ সময়ে তোকে জোর করে জানিয়ে যাচ্ছি মা! আমার অনেক সাধ ছিল—কিন্তু সে আর পূর্ণ হবে না জানি। ভগবানের কাছে আমার যাবার সময় এই প্রার্থনাই জানিয়ে যাই—তোরা যেন সুখে থাকিস—সংসারে বড় হয়ে থাকিস। আমি যত দূরেই থাকি না কেন মা—তোদের সুখ দুঃখ হয়তো সেখানে গিয়েও আমার বুকে বাজবে।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি চুপ কর মা—কি তোমার হয়েছে যে এতো ভাবছো—কবিরাজ মশায় বলেছিলেন—ভাল হ'য়ে উঠবে।

আত্রেয়ী ম্লান হাসিয়া বলিলেন—পাগলী, কবিরাজ তা বলে নাই রে—তুই মিথ্যে কথা বলছিস। আর আমি ভিতরের থেকেই যে যাবার তাগিদ পাচ্ছি মা!

পরে ইসারায় কল্যাণীর মাথা তাঁহার বুকের কাছে আনিতে বলিয়া নিজের শীর্ণ বাহু তুলিয়া কম্পিত হস্তে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—কাঁদিস নে পাগলী, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে রে!

কিছুক্ষণ দম লইয়া বলিলেন—কিন্তু অসি যে বড় দুঃখ পাবে মা, তুই তাকে সান্ত্বনা দিস। নিজের হাতে সন্তানকে এই অগ্নিপরীক্ষায় ঠেলে দিয়েছি। তবু এই সান্ত্বনা যে, তাকে আমি কোন ছোট কাজের মাঝে ঠেলে দিই নি। বড় কাজের বিপদও যে বড় মা।

—আজ আর একটা কথা তোকে বলি—তোর জীবনেও হয়তো ভবিষ্যতে এমনি কত বিপদ আসবে—তা ব'লে যেন আমার মত ভেঙ্গে পড়িসনে। আমি যে ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল তাতো জানতাম না। অসিকে ভালবাসায় অনেক দুঃখ আছে এ আমি জানি—তাই আগে থাকতেই তোর নিজের মনকে ঠিক করে নিস মা!

কল্যাণী বাধা দিয়া বলিল—তুমি চুপ কর মা—দুর্বল শরীরে অত কথা বললে যে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে।

ইহারই কয়েকদিন পরে দিনদুই ধরিয়া বারে বারে কাসির সঙ্গে অনেকখানি করিয়া তাজা রক্ত বাহির হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তিটুকু একেবারে ক্ষয় হইয়া হইয়া একদিন অপরাহ্ন বেলায় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। অমিয় যথাবিধি মায়ের সৎকার করিয়া শ্রাদ্ধাদি চুকাইয়া অবশেষে অসিতের কথা মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

জেলের এই একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলি একে একে শেষ হইয়া অবশেষে অসিতের মুক্তির দিনটি আসিয়া পড়িল। বিদায়ের পূর্বক্ষণে মধুকর তাহাকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর দুই বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিলেন—আমাকে ভুলো না অসি! অসিত মধুকরের বাহু-ডোরে বদ্ধ হইয়া বলিল—এত দুঃখের মাঝে যে আপনাকে পেয়েছি, এইটাই তো আমার মস্ত বড় সান্ত্বনা দাদা—আপনাকে ভুলবো কেমন করে!

—মাকে আমার প্রণাম জানিও, অসি। তোমার মা সামান্য মা নন সে আমি বুঝেছি ভাই! অসিত মায়ের কথায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল—সত্যি দাদা, মা-ই আমার সব—ভাবছি কতক্ষণে গিয়ে মাকে দেখবো—কতক্ষণে তাঁর কোলে মাথা রেখে তাঁর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবো। মধুকর হাসিয়া বলিলেন—তোমার উপরে আমার হিংসে হয় অসি, ইচ্ছে করে তোমার মাকে দু'ভায়ে ভাগ করে নিই। কিন্তু যেখানেই যখন থাক এ কথা যেন কখনও ভুলো না ভাই, যে সংসারে কেবল সুখ-ভোগের জন্যেই আমরা জন্মিনি। আমাদের সামনে আছে এই দেশ—এই অগণিত নিপীড়িত জাতি! গণদেবতা যদি ডাকেন গৃহ দেবতাকেও ছেড়ে এসো ভাই। অসিত বলিল—স্পর্ধা আমার নেই দাদা, মনে মনে আপনাকেই গুরুর আসনে বসিয়েছি। ডাক যদি আসে আমাকেও আপনিই ডেকে তুলবেন।

—কিন্তু গুরু তো কেউ কারু নয় ভাই—এ তোমার ভুল, আমরা সব ভাই—ভাই—দুর্গম পথের যাত্রিদল!

অসিত হাসিয়া বলিল—ভাই বটে, তবে অগ্রজ—গুরুজন!

মধুকর পুনরায় তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—আর একটা কথা অসি—কখনও যেন ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না। যুক্তির জাল দিয়ে তাঁকে ধরতে পারবে না, সে চেষ্টাও যেন করো না। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করো। আমাদের সমস্ত আশা ভরসা তাঁর হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যাব।

অসিত তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গেটের ভিতর দিয়া অফিস ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে যখন নিজের জিনিসপত্র বুঝিয়া লইয়া সে বাহির হইতেছিল, তখন জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইল মধুকর জানালার তারের জালের উপর দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

আজ প্রায় ছয় মাস ধরিয়া যে জেলের প্রাচীর প্রতিবারে তাহার দৃষ্টিকে ধাক্কা মারিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, অসিত আজ তাহারই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুক্তির একি আনন্দ! বাইরের সূর্যকিরণ যেন আজ অনেক গুণ উজ্জ্বল মনে হইতেছে। পথের ধূলিরাশি যেন আর ধূলি নয়—কত পবিত্র। বাতাস যেন কোথাকার কোন তপোবনের সুরভি বহন করিয়া আনিতেছে। অসিত কয়েকবার বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া লইল। কিন্তু একি? সমস্ত শরীর তাহার এমন অবশ হইয়া আসিতেছে কেন? দুই পা, দুই হাতের আঙুলগুলি সব থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে কেন?

অসিত ভাবিল—মুক্তির আনন্দে তাহার সমস্ত শরীরের অণু-পরমাণু একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, হয় তো এ তাহারই প্রকাশ! সমস্ত শরীরটাকে কয়েকবার নাড়া দিয়া লইয়া সে স্টেশনের দিকে পা বাড়াইল। নিজেদের স্টেশনে আসিয়া নামিতেই দেখে অক্ষয় আসিয়া তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

অসিত তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—ভাল আছিস ভাই! অক্ষয় মাথা নাড়িয়া জানাইল—ভাল আছে।

পরক্ষণেই অসিতের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল—মা কেমন আছেন ভাই—আমার মা?

অক্ষয় অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া জবাব দিল—হ্যাঁ, ভাল আছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর যে তাহার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল অসিত তাহা লক্ষ্যও করিল না।

অক্ষয় ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। এখন দুইজন গিয়া সেই গাড়িতে চাপিয়া বসিল। সেই মাঠের মাঝখানের রাস্তাটি ধরিয়া গাড়ি হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সমস্ত মাঠ আজ ফসলে ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও বাতাসে পাটক্ষেত-গুলি মাথা দুলাইতেছে। সম্মুখে শত শত বিঘা ধানের জমির উপর দিয়া সবুজের ঢেউ তুলিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে। অসিত গাড়ির ভিতরে বসিয়া কল্পনার জাল বুনিয়া যাইতেছিল—আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সে বাড়ি গিয়া পৌঁছিবে। মা তাহার এতক্ষণে নিশ্চয়ই নদীর ঘাটে আসিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন—পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কাত্যায়নী দেবী—কল্যাণী হয়তো লজ্জায় আর ঘাটে আসিয়া দাঁড়ায় নাই—হয়তো বা তাহাদের ঘরের জানালা খুলিয়া দুই চোখের দৃষ্টি নদীর ধারে প্রসারিত করিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ ছয় মাস সে মাকে দেখে না। উঃ এই ছয়টা মাস যেন ছয়টি বৎসর বলিয়া মনে হইতেছে। সর্বপ্রথম সে মাকে গিয়া প্রণাম করিবে—মা তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া মস্তক চুম্বন করিবেন—হয়তো আনন্দে একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিবেন। তারপর কাত্যায়নী দেবীকে প্রণাম করিবে এবং তারপর গ্রামের আর আর গুরুজনদের। কল্যাণীকে নির্জনে পাইলে একটুখানি আদর করিবে—সে লজ্জায় বুঝি আজকাল আর কাছেই আসিতে চাহিবে না—সব সময় পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইবে। বিকাল বেলায় সমস্ত গ্রামখানির প্রত্যেকটি বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। ছয়টি মাস তো সোজা নয়। না জানি এই দীর্ঘদিনগুলির মধ্যে গ্রামের কাহার কত কি মঙ্গলামঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে! কথাটি ভাবিতেই অকারণে কি জানি কেন অসিতের বুক কাঁপিয়া উঠিল। খেয়া ঘাটে আসিয়া গাড়ি থামিল। অক্ষয় গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটাইয়া দিল। অসিত

চাহিয়া দেখে নদীর পাড়ে আম গাছের তলায় কয়েকজন মেয়ে পুরুষ সত্যই তো বসিয়া আছে—হয়তো উহারই মধ্যে তাহার মা বসিয়া আছেন। অসিতের বুকের ভিতরে কয়েকবার দুলিয়া উঠিল, কিন্তু ভাল করিয়া তাকাইয়াও এতদূর হইতে সে ঠিক করিয়া চিনিতে পারিল না।

মিনিট দশেক পরে খেয়া নৌকা আসিয়া এ পাড়ে থামিল। ওপাশে কতকগুলি মেয়েছেলে স্নান করিতেছিল। সান্যাল বাড়ির গিন্নি ছিলেন এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া। অসিতের দিকে নজর পড়িতেই একেবারে সংসারের সকল মায়া কণ্ঠস্বরে টানিয়া আনিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—'ওরে, অসিরে, সেই আসাই এলি—আর দুটো মাস আগে যদি আসতিস্ বাছা, তবু তো অভাগীকে চোখের দেখা দেখতে পারতিস। ওরে তোর জন্যেই যে মা তোর নিজের দেহটা শেষ করে দিল রে—এমন শত্রুও মানুষ পেটে ধরে রে! অসিত সহসা ইহার কোন অর্থ না বুঝিতে পারিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বিহ্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া বলিল—কি, কি, কি হয়েছে মার?—মা কি আর আছে রে—সে যে আজ দুই মাস হ'লো —অসিত অক্ষয়ের গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—অক্ষয় তুই বল মার আমার কি হ'য়েছে? অক্ষয় কথা কহিতে পারিল না—দুই চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল। অসিত আর একটা কথাও কহিল না—কতক্ষণ বিহ্বলের মত একেবারে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। নদী গাছপালা বাড়িঘর সমস্ত যেন তাহার চোখের সম্মুখে একেবারে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিল—চোখের দৃষ্টি আসিল ঝাপ্সা হইয়া—সে ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া একেবারে নৌকার উপরে শুইয়া পড়িল।

অসিতের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখে সে তাহাদের ঘরের বারান্দায় শুইয়া আছে। কাত্যায়নী দেবী ও অক্ষয় তাহার পাশে বসিয়া আছেন। কাত্যায়নী দেবী তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন—অসিত তাঁহার

কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া খানিকটা শান্ত হইল। ইতিমধ্যে গাঙ্গুলী খুড়ো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বলিলেন—তাই তো কল্যাণীর মা—ছোঁড়াটা এতদিন পরে এলো—মায়ের সৎকাজটার সময় কাছে থাকতে পারেনি—শ্রাদ্ধ-শান্তির কিছুই করতে পারেনি—একটা কিছু ব্যবস্থা তো এর করতে হ'বে—কথাটা শোনামাত্রই তো অশৌচ স্পর্শে। তা আজকের মতো ঘি, সৈন্ধব দিয়ে সংযম করিয়ে রাখ। কাল থেকে তেরাত্রি হবিষ্যান্ন করাতে হবে। আমি শাস্ত্রটাস্ত্র ঘেঁটে সব বিধি ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু এতদিন জেলে ছিল একটা প্রায়শ্চিত্তি-টিত্তি হয়তো করতে হ'বে।

কাত্যায়নী দেবী বলিলেন—আজ সে ব্যবস্থাই তো করছি ঠাকুরপো—আহা, বাছা আমার এত বড় শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। গাঙ্গুলী খুড়ো আরও দুই চারিটি সদুপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। অক্ষয় আর বাড়ি যায় নাই—অসিতকে স্নান করাইয়া আহার করাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বাড়ি গেল।

অনেকক্ষণ অসিত চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার এই তেইশ বৎসরের পরিচিত গৃহ—এই শয্যা—গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র সবই তাহার মায়েরই স্মৃতিতে ঘেরা। অসিত ইহারই মাঝে একান্ত নিশ্চলভাবে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া যেন মায়েরই স্মৃতি—মায়েরই স্নেহ সারা গায়ে মাখিয়া লইতেছিল। মায়ের নিজের হাতে তৈরী করা বিছানা—নিজের হাতে তৈরী করা বালিশ—এই খাটেই হয়তো মা তাঁহার শেষ রুগ্নশয্যায় শুইয়া ছিলেন। অসিতের মনে পড়িয়া গেল সেই অতি শৈশবের কথা—শীতকালে এইখানে শুইয়া লেপের ভিতরে ঢুকিয়া একেবারে মায়ের বুকের ভিতর মিশিয়া থাকিয়াছে—শেষ রাত্রে জাগিয়া মায়ের সহিত কত কথা বলিয়াছে। মা একে একে কত না গল্প—কত না ইতিহাসের কথা—কত না কবিতা বলিয়া গিয়াছেন। গৃহের সব

যেখানে যা ছিল তেমনি আছে। ওপাশে সারি সারি শিকায় ৫।৭টি খিয়ে পাকান মেটে হাঁড়ি ঝুলিতেছে—কোনটিতে কুলের আচার—কোনটিতে আমের আচার—যে কালের যা মা সমস্তই তৈরী করিয়া অতি যত্নে তুলিয়া রাখিতেন। অসিতকে তাঁহার সতর্ক করার অন্ত ছিল না—চুরি করে কিন্তু আচার খাসনে অসি—বেশি খেলে পেট কামড়ায়—অসুখ করে—যখন চাইবি আমি নিজে পেড়ে দেব। অসিত কোন কথাই না বলিয়া মায়ের উপদেশ কান পাতিয়া শুনিয়া যাইত। মনে মনে বলিয়া যাইত—তোমার কথাই আমি শুনি আর কি? তারপর মা যখন স্নান করিতে কি অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতেন—সে চুপি চুপি বেড়া বাহিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া হাত ভরিয়া যত খুশী আচার আনিয়া খাইত মা জানিতেও পারিতেন না। তারপর যেদিন আচারের হাঁড়িতে নিজে হাত দিতেন সেই দিন চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিতেন—ওরে চোর—এমনি করে চুরি করে আচার খেয়ে পেট কামড়ে মরবি দেখছি—এত যে নিষেধ তবু কি কথা শোনে! সেই যে কথায় আছে "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। অসিত চুপ করিয়া মনে মনে হাসিয়াছে।

মাচার উপরে তিনটি বড় বড় কালো রংএর মাটির কলসী অসিত ছোট বেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে—তাহার একটিতে মুড়ি একটিতে খৈ ও অপেক্ষাকৃত ছোটটিতে চিড়া থাকিত। কতদিন মাচার উপর উঠিয়া সে মুড়ির কলসীর ভিতর হাত ঘুরাইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাতাসা বাহির করিয়া খাইয়াছে। আজও তেমনি করিয়া আচারের হাঁড়িগুলি শিকায় ঝুলিতেছে—মুড়ি খইয়ের কলসীগুলি রহিয়াছে। এই তুচ্ছ ছেঁড়া বালিশ, এমন কি কোন্ কালের ছেঁড়া মাদুরখানা পর্যন্ত ঘরের এক কোণায় গুটান রহিয়াছে—কিন্তু যিনি এই সকলকে যত্ন করিয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহাকে আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই! এ কি পরমাশ্চর্য ঘটনা! এই মাটির হাঁড়ি আর ছেঁড়া মাদুর কি মানুষের জীবনের চেয়েও সত্য—মানুষ কি

এমনই মিথ্যা, এমনি অস্থির জীবনকে এমন সত্য মনে করিয়া বহিয়া বহিয়া বেড়ায়!

অসিত বিছানা ছাড়িয়া যখন বাহিরে আসিল—তখন বেলা বেশী নাই। ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই রান্নাঘরের দিকে কল্যাণীকে দেখিতে পাইল—সে এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে তাকাইয়া নিজেদের বাড়ির দিকে সরিয়া গেল। ওপাশে বুধি গাইটা বাঁধা ছিল—অসিত খানিকক্ষণ তাহার গায়ে গলায় হাত বুলাইয়া তুলসীতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসীমঞ্চের কয়েকহাত দূরেই দুইটি হরিতকী ও আমলকী গাছ পোঁতা হইয়াছিল—গাছগুলি বড় হইয়া সমস্ত স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মা তাহার প্রতিদিন তুলসী বেদীটি পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া দিতেন—সন্ধ্যায় তাহারই তলায় প্রদীপ জ্বালিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতেন। অসিতের কখনও অসুখ বিসুখ করিলে, তুলসী তলার ধূলি আনিয়া তাহার কপালে মাথায় মাখিয়া দিতেন। অসিত আজ তুলসী তলায় মাথা ঠেকাইতে গিয়া একেবারে সেখানের সমস্ত ধূলি তাহার সারা গায়ে মাখাইয়া লইল। সেখান হইতে ধীরে ধীরে বাড়ির বাহিরে চলিয়া আসিল। সম্মুখে ছোট একটু ফুলের বাগান —সেখানে দুইটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এ গাছ দুটিও মা নিজের হাতে পুঁতিয়াছিলেন। ফুলবাগানের পূর্ব্বেই একবারে চন্দনা এবং বাগানের লাগা দক্ষিণ-দিকটায় একটু উঁচু জমি—সেখানে আসিতেই অসিত দেখিতে পাইল একটি বৃষকাঠ এখানে পোঁতা রহিয়াছে। পাশেই একটি মেটে কলসী, একটি তুলসীগাছ—কতকগুলি পোড়া কাঠের টুকরো ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে। অসিত দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারিল এখানেই তাহার মায়ের দেহখানি পোড়াইয়া একেবারে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসিত সংজ্ঞাহীনের মত ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সেইখানের খানিকটা ধূলামাটি তুলিয়া গায়ে

মাথায় কপালে মাখিতে লাগিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দুই হাত ভরিয়া গন্ধরাজ ফুল তুলিয়া আনিয়া মায়ের শ্মশানের উপর ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। পশ্চিম দিকের আমবাগানের অন্তরালে সূর্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে। একটু দূরে গোটা দুই শিয়াল হোয়া হোয়া করিয়া ডাকিয়া গেল—ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি আসিল আবছা হইয়া। অসিত তেমনি ঠায় সেখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরের দিন সকালবেলা ঘুম হইতে জাগিয়া অসিত নিজের বিছানায় চুপ করিয়া পড়িয়াছিল—রাত্রে অক্ষয় তাহার সঙ্গে শুইয়াছিল—সে সকালে উঠিয়া কখন বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। কল্যাণী কাল হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরিয়াছে—একবারও অসিতের সম্মুখে আসে নাই। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল কল্যাণী আসিয়া ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া অসিত বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি কল্যাণী? অসিতের দিকে চোখ পড়িতেই কল্যাণী ঘাড় নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল—একটা কথারও জবাব দিল না, কিন্তু একটু ভাল করিয়া তাকাইতেই অসিত দেখিতে পাইল তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। অসিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কেঁদ না কল্যাণী—তোমার দুঃখ আমি বুঝি। মা তো তোমাকে আমার চেয়ে কম ভালবাসতেন না—তাঁর ভালবাসা যে পেয়েছে সে কি তাঁকে কখনো ভুলতে পারে? সারারাত ধরে কেঁদেছি আর ভেবেছি। ভেবে দেখলাম আমাদের এই কাঁদার এতটুকু মূল্য নেই।—তবু কল্যাণী একটা কথারও জবাব দিল না দেখিয়া অসিত উঠিয়া গিয়া নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার চোখের

জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—দেখ তো এই একটা দিনেই আমি কেমন ঠিক হয়ে গেছি। এই যে কয়টা মাস ধরে দিনে দিনে তিলে তিলে মাকে আমি এমনি করে মেরে ফেল্লাম—কই তবুও তো একটুকুও কাঁদি নি। কিন্তু সহসা তাহার দুই চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া—তাহার সকল কথা একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া দিল। অসিত কল্যাণীর নিকট হইতে জানালার ধারে সরিয়া আসিয়া দূর আকাশের দিকে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অমিয় আসিলেন। ইচ্ছা ছিল অসিতকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবেন ; কিন্তু সে মায়ের হাতে সাজান এই ঘর—মায়ের স্মৃতিতে ভরা এই বাড়ি ছাড়িয়া কিছুতেই কলিকাতা যাইতে রাজি হইল না—অগত্যা অমিয় ক্ষুণ্ণ মনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

পঁনর কুড়ি দিন পরে সেদিন সকাল বেলা কাত্যায়নী দেবী কল্যাণীকে বলিলেন—অসিকে আজ তার মায়ের চিঠিখানা তুই হাতে করে দিস্ মা! দুপুর বেলা যখন খাওয়া দাওয়া করে সে ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করবে তখন যাস্! কল্যাণীর লজ্জায় চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—সে বলিল—আমি পারবো না মা!

—পারবিনে কেন শুনি?

—না পারবো না!

কিন্তু আহারাদির পর কাত্যায়নী দেবী বলিলেন—আমি বড় বাড়ি চল্লাম কল্যাণী—ফিরতে সন্ধ্যে হবে—চিঠিখানা এই বাক্সের ভিতরে রেখে দিয়েছি—যদি আজ না দিস্ তো আমার মরা মুখ দেখবি তা বলে দিচ্ছি—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের ভিতর বসিয়া বারেবারে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। বিকাল বেলা যখন অসিতের ঘরে গিয়া ঢুকিল—অসিত তখন শয্যায় শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। কল্যাণী ঘরে ঢুকিতেই বই বন্ধ করিয়া বলিল—এস

কল্যাণী। কল্যাণী কথাটি না কহিয়া এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কিছু বলবে কল্যাণী?

কল্যাণী কাপড়ের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া অসিতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—আপনার চিঠি আছে।

—চিঠি? কই দেখি?

অসিত হাত বাড়াইয়া পত্রখানা গ্রহণ করিল। কল্যাণী বলিল—কাকীমার অসুখ যখন খুব বেশী হয়ে উঠলো তখন লিখে রেখে দিয়েছিলেন।

—মার? মার চিঠি? বলিয়াই অসিত তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল ঃ

—অসি, ফিরে এসে হয় তো আর আমাকে দেখতে পাবিনে বাবা—আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, দুঃখ করিস নে—অসি! যেখানেই থাকি তোদের কথা আমি একটি দিনও ভুলে থাকবো না। কল্যাণী রইল—তাকে তোর জন্যেই নিজের হাতে শিক্ষা দিয়েছি, সাধ ছিল তোদের দুটিকে নিজ হাতে এক করে দিয়ে যাব—সে সাধ আমার পূর্ণ হলো না। তুই তাকে গ্রহণ করিস—বাবা! শালগ্রামশিলা সম্মুখে রেখে বিবাহ করিস। আমি যেখানেই থাকি সেখান থেকেই সুখী হব—এই আমার একমাত্র সাধ—এই আমার তোর উপরে অন্তিমকালের শেষ আদেশ।

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া অসিত যখন কল্যাণীর দিকে তাকাইল তখন তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া বলিল—চিঠি তুমি পড়েছো—কল্যাণী?

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া জানাইল—সে পড়ে নাই

—কিন্তু কি লেখা আছে জানো?

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া বলিল—জানি।

—কেমন করে জানলে?

—মা শেষ সময়ে আমাকে সব বলেছিলেন যে।

অসিত উঠিয়া আসিয়া কল্যাণীর সম্মুখে চিঠিখানা খুলিয়া ধরিয়া বলিল—পড়।

কল্যাণী চিঠিখানার উপরে বার দুই চোখ বুলাইয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।

অসিত ধীরে ধীরে তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—মার কথার অবাধ্য আমি কোনদিন হই নি কল্যাণী,—আজও হবো না। যে মা আমার কাছে মন্ত্রের চেয়ে—শালগ্রামশিলার চেয়েও বড়—তাকেই উদ্দেশ্য করে আজ আমি তোমাকে আমার সমস্ত সুখ দুঃখের ভাগী করলাম। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া কল্যাণীকে নিজের কাছে টানিয়া লইল। কল্যাণী হঠাৎ একেবারে অসিতের দুই পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পালাইতেছিল; কিন্তু অসিত তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল—যেয়ো না কল্যাণী—এসো মাকে উদ্দেশ্য করে দুইজনে প্রণাম জানাই। ঘরের এক পাশে আত্রেয়ী দেবীর প্রথম জীবনের একখানা ফটো ছিল—সেখানা নামাইয়া তাহারই গোড়ায় দুইজন মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারই কয়েকদিন পরে একদিন শুভ দিনে অসিতের সহিত কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেল। তার পরের দিনগুলি ইহাদের এক মধুর আবেশের ভিতর দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল।

অসিত রাধানগরের হাইস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরী করিতেছে। সংসার একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইতেছিল।

এমনি করিয়া বৎসর দেড়েক কাটিবার পর সেদিন রাত্রে অসিতের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কল্যাণী কি যেন বলিল—শুনিয়াই সে আনন্দে দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সত্যি বলছো কল্যাণী? কল্যাণী তেমনি মুখ লুকাইয়া বলিল—একথা বুঝি কেউ মিথ্যে করে বলে? ইহারই কিছুদিন পরে একেবারে জানাজানি

হইয়া গেল—কল্যাণীর সন্তান হইবে। অসিত আজকাল সর্বদা সতর্ক থাকে—কখন কল্যাণীর কি হয়—কিসে তাহার শরীর ভাল থাকে। দিন যত যাইতে লাগিল ততই প্রত্যেক দিন সে তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া—নানা প্রকারে সতর্ক করিয়া তুলিত। কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত—তুমি দেখছি একেবারে মেয়ে মানুষকেও হার মানালে—পুরুষ মানুষের ওসব কথায় মাথা ঘামানোর দরকার কি শুনি? অসিত হাসিয়া জবাব দেয়—মেয়ে মানুষ সাধারণত অত্যাচারী কি না—তাই পুরুষ মানুষদের মাথা ঘামান দরকার হ'য়ে পড়ে। এমনি যতই প্রসবের দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল—অসিত ততই উঠিতেছিল মনে মনে ব্যস্ত হইয়া। সেদিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল—বাড়ির কাছে আসিতেই মনে হইল বাড়িতে যেন আরও দুই-চারিজন লোকের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বাড়ির আম বাগানের নিকটে আসিতেই বাড়ির ভিতর হইতে একটি কচি শিশু বারে বারে ককাইয়া ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। অসিতের বুকের ভেতরটা উঠিল উল্লাসে নৃত্য করিয়া—ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। তাহাকে দেখিবামাত্র পাশের বাড়ির একটি মেয়ে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—অসিদা, সন্দেশ খাওয়াতে হ'বে কিন্তু—দেখ আমি যে বলেছিলাম ছেলে হ'বে—কেমন ঠিক হ'য়েছে আমার কথা! কাত্যায়নী দেবী সুতিকাঘর হইতে উঁকি মারিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন—খুব সুন্দর ছেলে হ'বে অসি—ইস্ দাদু আমার কেমন করে তাকাচ্ছে দেখ। অসিত হাসিমুখে সব শুনিতেছিল—এবার এদিকে আসিতেই সেই মেয়েটি পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল—সর সর এদিকে এসো না কিন্তু অসিদা, সন্দেশ না হ'লে ছেলে আমরা দেখতে দেব না। আরও দুই তিনজন ছোট বড় মেয়েছেলে দাঁড়াইয়াছিল তাহারাও সমস্বরে সন্দেশের দাবী জানাইল। অসিত হাসিয়া মেয়েটিকে বলিল—চুপ কর পাগলী—আমি দেখতেই যাচ্ছি আর কি?

চতুর্দশ অধ্যায়

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে। কল্যাণী সূতিকা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। শরীর তাহার অনেকখানি রোগা ও খানিকটা বিবর্ণ দেখাইতেছে কিন্তু তবু তাহার দুই চক্ষু উঠিয়াছে উজ্জ্বল হইয়া। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু যেন কোন অভাবনীয় বস্তুর সংস্পর্শে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। কল্যাণীর আজকাল আর কোন কাজ নাই—সংসারের সমস্ত কাজ যেন তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মন তাহার সারাটা দিনরাত্রি ধরিয়া এই এতটুকু একটু জীবকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। এই মাসখানেকের মধ্যে যেন তার বয়স বছর দশেক আগাইয়া গিয়াছে। তেমনি করিয়া আগের মত আর লজ্জা করে না—সঙ্কোচ করে না। এই এতটুকু মাত্র ছেলেটি কোলে আসিয়া যেন তাহার সমস্ত লজ্জা সমস্ত সঙ্কোচকে এমনি করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। প্রসবের পূর্বে ভাবিত সন্তান হইলে কেমন করিয়া সবার সাম্‌নে তাহাকে কোলে করিয়া স্তন্য দিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে—অত্যন্ত লজ্জা করিবে তাহার। কিন্তু সে কল্পনা যে তাহার কত ভুল তাহা সে তখন কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ছেলে কোলে লইলে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়। সে সকালবেলা ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া শয্যায় শুইয়া থাকে। সন্ধ্যার পূর্বে যা হোক দুটি মুখে দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকে আর কিছুতেই বাহির হয় না। নিজের আহারে বিহারে এমনি সংযত হইয়া উঠিয়াছে যে এ যেন কোন এক ব্রত পালন করিতেছে সে—সমস্ত রকমের অশুচি, অপবিত্রকে অতি যত্নে পাশ কাটাইয়া চলে। এমনি নিশিদিন নিজের আচার-ব্যবহারের প্রতি খর দৃষ্টি রাখিয়া তাহার দিন কাটে। অসিত চুপ করিয়া দেখে—মুখ বুজিয়া হাসে।—এমন

কি আজকাল তাহাকেও কল্যাণী সহজে রেহাই দেয় না—বাহির হইতে ঘরে ঢুকিতে হইলে দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া পা ধুইয়া পরে ঘরে ঢুকিতে দেয়—কাপড় না বদলাইয়া খোকার শয্যা স্পর্শ পর্যন্তও করিবার হুকুম নাই। সেদিন কল্যাণী তাহাকে বলিয়াছিল—জান ওরা সব স্বর্গের জিনিস—কোনপ্রকার অশুচি—কোনপ্রকার অত্যাচার একটুও সহ্য হয় না। অসিত অবিশ্বাসের হাসি হাসে—কল্যাণী তর্ক করিয়া বলে, কি বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি! অসিত হাসিয়া বলে—না মোটেই না।

—তোমরা সব ইংরেজী শিখে দিন দিন খৃস্টান হ'য়ে যাচ্ছ কিনা তাই বিশ্বেস কর না। আচ্ছা আজ তোমাকে দেখিয়ে দেবো!

—কি দেখাবে শুনি?

—খোকা শুয়ে শুয়ে একা একা কেমন হাসে—স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে কথা বলে।

শুনিয়া অসিত পুনরায় হাসিতে থাকে।

কল্যাণী আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইবার ভঙ্গিতে বলে—তবু হাসছো যে বড়? অসিত বলে—আমি যদি বলি ও দেবতাদের পরিবর্তে তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চায়—তোমাকে দেখেই হাসে!

—ইস্, তাই কখনো হয় না কি? জান, ছয় মাস পর্যন্ত—যতদিন না মুখে ভাত হয় ততদিন ওরা অমনি স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে—এসব শাস্ত্রের কথা যে—তুমি বিশ্বেস না করলেই হ'লো বুঝি?

—কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে শুনি?

—জানি নে! তোমার সঙ্গে পারবে যে সে আজ পর্যন্ত এ ভূ-ভারতে জন্মে নি—বলিয়া রাগ করিয়া কল্যাণী উঠিয়া যায়।

অসিত তেমনি চুপ করিয়া মনে মনে হাসিতে থাকে। হঠাৎ খোকা হয়তো কাঁদিয়া উঠে—কল্যাণী তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত বাড়াইয়া অতি সন্তর্পণে ন্যাকড়াসমেত স্বচ্ছন্দে তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে তুলিয়া দুধ দিতে দিতে

ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে থাকে। অসিত সেইদিকে নির্নিমেষে চাহিয়া দেখে। কল্যাণীকে যেন ভারী রহস্যময়ী বলিয়া বোধ হয়—আজকাল যেন এক অভিনব রূপ তাহার সারা অঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়—এ রূপকে শুধু চোখ দিয়া ধরা যায় না, মনকে চোখের সঙ্গে করিয়া লইতে হয়। কল্যাণী তাহার দিকে চোখ ফিরাইয়া বলে—অম্নি করে একদৃষ্টে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি শুনি?

—তোমাকেই দেখছি!

কল্যাণী হাসিয়া বলে—ইস্ মিথ্যেবাদী কোথাকার—আসল বস্তু ফেলে বুঝি কেউ খোসাকে আদর করে?

অসিত প্রশ্ন করে—তার মানে?

—কিছু বোঝেন না যেন? ছেলে, তোমার ছেলের কথা হ'চ্ছে মশাই—বাপ মা সব খোসা, সন্তান হ'চ্ছে আসল বস্তু—বুঝলে তো?

কথা বলিতে বলিতে সে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া বলে—কেমন নিতে চাও তো খোকাকে কোলে—নেবে? নাও দেখি,—বলিয়াই দুই হাতে খোকাকে অসিতের কোলের দিকে আগাইয়া দেয়। অসিত একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠে।

—আরে—করে কি দেখ—ও ব্যথা পাবে যে—আমি নিতে পারবো কেন? না আমার ভারী ভয় করে কিন্তু—শুধু হাতে ধরলে যদি ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে?

কল্যাণী কোন কথা না শুনিয়া অতি সন্তর্পণে ঝপ করিয়া খোকাকে অসিতের কোলের মধ্যে নামাইয়া দেয়।

অসিত নিরুপায় হইয়া আনাড়ির মতো দুই হাত, দুই হাঁটু কোনমতে একসঙ্গে করিয়া খোকাকে ধরিয়া থাকে। কল্যাণী এতক্ষণে বিপন্ন অসিতের দিকে তাকাইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর কি—কেমন জব্দ—নিজের ছেলে না যে একটুও কোলে করবে না শুনি? রাতদিন আর আমি কোলে করে নিয়ে ফিরবো না কিন্তু—এখন থেকে ভাগাভাগি করে কোলে নিতে হবে। অসিত দুষ্টামী করিয়া ইহার কি একটা লাগসই জবাব দিতে যাইতেছিল

কিন্তু হঠাৎ খোকা একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আর সেকথা বলা হইল না।

কল্যাণী বলিল—কাঁদে যে থামাও না!

অসিত বার দুই হাঁটু ও দুই বাহু দিয়া খোকাকে দোলা দিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তখনই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। এমনি করিয়া হঠাৎ পড়িয়া যায় যদি!

সে নিরুপায়ের মত বলিয়া উঠিল—শীগগির নাও কল্যাণী—আমি আর পারবো না—ব্যথা দেব—ফেলে দেব শেষে!

কল্যাণী ছুটিয়া আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহার কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে। কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে যেন এক নিমিষে খোকা একেবারে চুপ করিয়া যায়—কয়েক মিনিটের মধ্যেই মায়ের কোলে দিব্যি হাত পা নাড়িয়া খোকা খেলা করিতে থাকে।

কল্যাণী হাসিয়া বলে—দেখলে তোমরা কেমন অকর্মা!

অসিত বলে—তা বলতে পার বটে।

আজ রবিবার। অসিতের ইস্কুল নাই। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, খোকা নিজের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। কল্যাণী হয়তো রান্নাঘরে এতক্ষণ আহারে বসিয়াছে। অসিত ধীরে ধীরে খোকার পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে খোকার জন্য ছোট্ট একটি তোষক, দুইটি পাশ বালিশ, শিয়রে দিবার জন্য একটি ছোট্ট আকন্দ তুলার বালিশ তৈরী হইয়াছে। ছোট্ট ছোট্ট কাঁথার তো কথাই নাই। ঠিক মাথার উপরে হাত দুই উঁচুতে একটি সোনার রংকরা খাঁচা ঝুলিতেছে। অসিত একদৃষ্টে খোকার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল—কি সুন্দর মুখের গড়ন—দিব্যি বড় বড় চোখ টানা টানা ভ্রূ—টিকালো নাক—চিবুকের দিকে তাকাইলে তাহার পিতার কথা মনে পড়িয়া যায়। কপালটিও হয়তো তাঁহারই মত প্রশস্ত হইবে। হাত পাগুলা কি চমৎকার—দিব্যি সরু সরু—দিব্যি নিটোল। ঘুমের ভিতরে হাত দুইখানা

একবার মুঠা করিতেছে একবার খুলিতেছে। মুখের দিকে পুনরায় তাকাইয়া দেখে সত্যই তো খোকা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিতেছে। কল্যাণী দেখিলে মনে ভাবিত—সে স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে কথা কহিতেছে। সৃষ্টিরহস্য কি অদ্ভুত—কেমন নিখুঁত—ভাবিয়া অসিত অবাক হইয়া যায়। কল্যাণী তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলে—কি দেখছো এমন এক দৃষ্টে তাকিয়ে ?

—খোকাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।

কল্যাণী খুশিতে মুখ চোখ ভরিয়া তুলিয়া বলিল—কার মত হয়েছে, বল তো ?

অসিত হাসিয়া বলিল—তোমার মতো।

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া বলে—উঁহু—হলো না !

—কেন ?

—তোমার মত হয়েছে যে !

অসিত বলিল—মিথ্যে কথা !

—মিথ্যে বই কি, সবাই বলে যে—একেবারে তোমার মত দেখতে হয়েছে !

—তাই নাকি ? তুমি বল নাকি ?

—তা বুঝি আর জানেন না !

—ও সব থাক—খোকার কি নাম রাখবে, ভেবেছো কিছু ?

—কই না ভাবিনি তো ! খুব বড় একটা নাম রাখতে হবে কিন্তু !

—খুব বড় নাম ? আচ্ছা সম্‌সের জঙ্গ বাহাদুর রাখলে কেমন হয় !

—যাও তোমার কেবল ঠাট্টা—অমনি নাম বাঙালীর হয় বুঝি ?

—আচ্ছা বেশ—না হয়—সুবোধ, গোপাল, সুশীল্ এমনি একটা ভেবে চিন্তে রাখা যাবে।

—যাও তোমাকে রাখতে হবে না নাম—কেবল দিন রাত কুড়েমি করবে আর তো কোন কাজ নেই !

অসিত নিজের বালিশটা টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—বেশ সেই ভাল—কাজ নেই আমার, তোমার ছেলের নাম রাখতে যেয়ে—মাথা ঘামিয়ে এতগুলো যে ভাল ভাল নাম করে গেলাম সেজন্য কোথায় দুটো ধন্যবাদ দেবে—তা নয় আমি কুড়ে—বেশ! বলিয়া সে হাসিমুখে দুই চোখ বুজিয়া কৃত্রিম ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে। এমনি করিয়া ছয়টি মাস কাটিয়া গেল। খোকার নাম রাখা হইল—অজয়। কল্যাণী আদর করিয়া ডাকিত—অঞ্জুমণি। এখন আর সে পূর্বের মত ভয় ভয় করিয়া চলে না—অঞ্জুকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের বারান্দায় উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়—সুর করিয়া করিয়া ছড়া কাটিতে থাকে—

"মণি আমার সোনা, চাঁদপুকুরের কোণা।
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা।"

অঞ্জু এখন মাঝে মাঝে অসিতের মুখের দিকে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। অসিত দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লয়। আদর করে—অনেকক্ষণ ধরিয়া কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খোকা এরই মধ্যে বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে।

আরও সাত আটটি মাস কাটিয়া গেলে অঞ্জু একা একা দাঁড়াইতে শিখিয়া ঘরের দেয়াল ধরিয়া দিব্যি হাঁটিয়া যাইত। মুখে হিস্ হিস্ করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিত। অসিতের বাহির হইতে বাড়ি ঢুকিবার সময় জুতার শব্দ শুনিতে পাইলেই একেবারে খানিকটা হাঁটিয়া খানিকটা হামাগুঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার পা বাহিয়া কোলে উঠিতে চাহিত। অসিত ধূলা কাদা সমেত তাহাকে কোলের মধ্যে তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিত। কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত—তবে যে বলতে ছেলে কোলে নেবে না—এখন না নিয়ে দেখ দেখি কেমন পার। অসিত কল্যাণীর কথার কোন জবাব না দিয়া অঞ্জুর মুখে বার বার চুমু খাইতে খাইতে বলিতে থাকে—অঞ্জু আমার লক্ষ্মী ছেলে—মানিক ছেলে। অঞ্জু বা—বা—বা—শব্দ করিতে করিতে দুই হাত দিয়া অসিতের গলা জড়াইয়া ধরে।

কল্যাণী হাসিয়া বলে—ইস্, ভারী যে ছেলেকে আদর হচ্ছে। অসিত কৃত্রিম রোষে চোখ পাকাইয়া বলে—তুমি আমাদের ভিতরে কথা বলতে এসো কেন বলতো? আমি আর অঞ্জু—অঞ্জু আর আমি; তোমার সঙ্গে আমরা কেউ কথা কচ্ছিনে!

কল্যাণী মুখ বাঁকাইয়া বলে—ইস্,—আচ্ছা ক্ষিধে পাক্ আগে—কার সঙ্গে কথা বলতে হয় না হয় তখন দেখা যাবে।

হঠাৎ অঞ্জু মায়ের দিকে ফিরিয়া দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিতে থাকে—মা—মা—মা—!

কল্যাণী হাত বাড়াইতেই অঞ্জু একেবারে ঝাঁপাইয়া তাহার কোলের ভিতর গিয়া বুকের ভিতর মুখ লুকায়।

কল্যাণী হাসিয়া বলে—কেমন হলো তো! অঞ্জু আর তুমি—তুমি আর অঞ্জু—আমি কেউ নই না?

পঞ্চদশ অধ্যায়

কিছুদিন পরে একদিন বিকাল বেলা ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অসিত একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। মধুকর আসিয়া তাহাদের ঘরের বারান্দায়—অঞ্জুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তিন বৎসর পরে দেখা কিন্তু প্রথম দর্শনেই অসিত তাঁহাকে চিনিতে পারিল, সেই উন্নত বলিষ্ঠ দেহ—মাথায় লম্বা লম্বা চুল—সব ঠিক আগের মতই আছে। অসিত কলরব করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল—একি দাদা, আপনি এমনি হঠাৎ কোত্থেকে এলেন? কখন এলেন? মধুকর এক হাতে কোলের উপর অঞ্জুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে অসিতকে নিজের পাশে টানিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন, অনেক যায়গা ঘুরে তবে তোমার এখানে এসেছি ভাই!

—কিন্তু কখন এলেন—খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি আপনার!

মধুকর পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—কষ্ট আমার এত সহজে হয় না ভাই—স্নানাহার সেরে একটা ঘুম দিয়ে এখন অঞ্জুর সঙ্গে একটু ভাব করছি। তুমি যাও—হাত মুখ ধুয়ে নাও। বলিয়া তিনি পুনরায় অঞ্জুর দিকে মনোযোগ দিলেন। অসিত আশ্চর্য হইয়া গেল—এতটুকু সময়ের মধ্যে অঞ্জু তাঁহার বেশ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে তো। সে অঞ্জুর দিকে হাত বাড়াইল। অঞ্জু তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মধুকর কৃত্রিম রোষে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কি দুষ্টু ছেলে, এতক্ষণের সমস্ত ভাব বাবাকে দেখেই শেষ হয়ে গেল। এসো! বলিয়া হাত বাড়াইলেন—অঞ্জু পুনরায় হাসিতে হাসিতে পিতার কোল হইতে তাঁহার দুই হাতের ভিতরে ঝুঁকিয়া পড়িল। মধুকর, অঞ্জুকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুমায় চুমায় তাহার দুই গাল ভরিয়া দিতে লাগিলেন। পরে অসিতের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—দেখছো কি অসি—বন্ধুরা বলে—আমি মানুষ বশ করতে জানি। কেমন তাই না অঞ্জু—বলিয়া অঞ্জুকে দুই হাতের ভিতর লইয়া তালে তালে দোল দিতে লাগিলেন।

শেষ বেলায় দুইজনে আসিয়া চন্দনার তীরে এক নির্জন স্থানে বসিলেন। মধুকর অসিতের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন—সেই যে একদিন বলেছিলে যদি পথ খুঁজে পান আমাকে ডেকে তুলবেন দাদা, সে কথা এখনও ভুলিনি ভাই—তাই আজ এসেছিলাম—কিন্তু বড় অসময়ে এসেছি অসি!

অসিত বলিল—অসময় কেন দাদা?

—আমার ভুল হয়েছিল ভাই—মনে করেছিলাম—সেই যে তিন বছর আগে জেলখানায় যে অসিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—সেই খাপ্‌খোলা তলোয়ারের মতো অসিকে আজও দেখতে পাব। আমি তো জানিনে ভাই যে তুমি আজ এমনি করে আর দশজন সংসারী মানুষের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছ। তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র—পরিপূর্ণ সংসার তোমার—আমি যে এখানে মূর্তিমান

অকল্যাণের মত এসে উপস্থিত হয়েছি। সেদিন জেলে বসে, যে মায়ের কথা শুনে মনে ভেবেছিলাম, আজিকার দিনে এমন মা যার, তার প্রাণের আগুন কোনদিন নিভবে না—কিন্তু আজ সে মা-ও নেই—সে অসিতও নেই ভাই। উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অসিত যখন মুখ তুলিয়া কথা কহিল—তখন তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া যাইতেছে।

—কিন্তু মার কথা তো আমি অমান্য করিনি দাদা! যে মায়ের প্রেরণায় জেলে গিয়েছিলাম—সেই মায়ের আদেশেই বিয়ে করেছি। সংসারী হয়েছি বটে কিন্তু মায়ের সে প্রেরণা আজও নিভে যায়নি। দরকার হলে সব ছেড়ে—আজও আবার জেলে যেতে পিছ পা হবো না। মধুকর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু জেলে গেলেই যদি সব হতো ভাই তাহলে তো কথা ছিল না।

—আর কি চাই তবে?

—কি চাই? দরকার হলে সব কিছুই চাই অসি—নিজের প্রাণকে হাসতে হাসতে বলি দিতে পারা চাই—চাই প্রাণপণ!

—তা হলে কি স্বাধীনতা আসবে—দেশ উদ্ধার হ'বে দাদা?

—জানি নে ভাই, কাজ আমরা করে যাব, ফলের আকাঙ্ক্ষা করবো না; হয়তো ফল ফলবে—হয়তো ফলবে না!

—কিন্তু এই কি সত্যিকারের পথ!

—তাও জানি নে ভাই! একে আমরা কি বলি জান? এ হ'লো আত্মসমর্পণ যোগ। দেশের পায়ে নিজেকে বলি দেওয়া। হিসেব-নিকেশ এখানে তুচ্ছ। সত্যিকারের প্রাণ যেখানে—সেখানে হিসেব-নিকেশের স্থান নেই অসি! রাণা প্রতাপ পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে—তবু আকবরের কাছে মাথা নত করেনি। বাঙলার প্রতাপ নিশ্চিত শান্তির পরিবর্তে, নিজের পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল—আমরা আর কিছু না পারি—মরতে তো পারবো অসি!

বহুক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। বেলা তখন একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছে—সূর্যের শেষ রশ্মি পশ্চিম দিকের খণ্ড খণ্ড

মেঘের মধ্যে লুকাইয়া নানা বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে—সম্মুখে অতি ক্ষীণস্রোতা চন্দনা ধীর মন্থরগতিতে বহিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অসিত বলিল—"কিন্তু মরতে যে আমি পারবো না তা আপনি কেমন করে জানলেন দাদা!—"—"তা সত্যি জানিনে কিন্তু ওকথা আজ আর আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না ভাই! তোমার অঞ্জুমণি, তোমার স্ত্রী—এদের পথে বসিয়ে তো আর তোমাকে টান্‌তে পারিনে?"—"বিয়ে করা কি এমন অন্যায়?" —"ন্যায় অন্যায়ের কথা নয়—এ যে জীবন-মরণের কথা। যাকে নিজের চিরজীবনের সঙ্গী করে নিয়েছ—যে ক্ষুদ্র শিশুকে তুমিই এই পৃথিবীতে টেনে এনেছো—তাদের সমস্ত দায়িত্ব তো আজ ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না! আনন্দমঠের সন্তানরা যে পর্যন্ত না তাদের পণ সিদ্ধ হয় সে পর্যন্ত স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করবে না প্রতিজ্ঞা করে কর্মে নেমেছিল, কিন্তু আমরা যারা যাব তারা তো ফিরে আসবার আশা করে যাব না ভাই!"—"আর যদি এদের সমস্ত ভার কারু উপরে সমর্পণ করে দিতে পারি?"—"তখন আমার খোঁজ করো ভাই—ঠিকানা তোমায় আমি দিয়ে যাবো।"

পরের দিন সকালবেলায় মধুকর অসিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে অসিতের আর সংসারের কোন কাজেই—কোনপ্রকার উৎসাহ রহিল না। কতদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল স্বদেশসেবা তাহার জীবনের ব্রত করিবে—আজ এতদিনের সংকল্প যে তাহার এমনি করিয়া পাকে পাকে সংসারের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে—এ খেয়াল তাহার ছিল না। যে মধুকরের পাশে বসিয়া দিনের পর দিন এমনি কত মিথ্যার বুলি আওড়াইয়া অযথা নিজেকে বড় করিয়া জাহির করিয়াছিল আজ সেই মধুকর আসিয়া একমুহূর্তে তাহার এই শোচনীয় পরিণতি দুই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া গেলেন। স্ত্রী তাহার নিজের প্রাণতুল্য; অঞ্জুমণি—তাহার প্রাণের প্রাণ—এই প্রেম ও স্নেহ যে তাহাকে শতবাহু মেলিয়া

কোথায় টানিয়া নামাইয়াছে—এ হিসাব সে কোন দিন করে নাই। হয়তো মধুকর এমনি করিয়া ধূমকেতুর ন্যায় আসিয়া উপস্থিত না হইলে জীবনে এ হিসাব তাহার কোন দিন করিয়া উঠিবার অবসর হইত না।

অসিতের এই ভাবান্তর কল্যাণীর চোখ এড়াইল না। কি যে তাহার হইয়াছে নিজের বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া প্রশ্ন করিয়া ইহার কোন সূত্রই সে আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি ভারাক্রান্ত মন লইয়া অসিতের দিন কাটিতে লাগিল। সেদিন মায়ের বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়াইয়া অসিত একমনে কত কি ভাবিয়া চলিতেছিল। আলমারিতে স্তরে স্তরে মায়ের বইগুলি সাজান ছিল। এই বইগুলি তাঁহার আদরের ধন—তিনি নিজের পিতৃভবন হইতে এগুলি যখন যেখানে গিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়াছেন। অসিত সেইদিন পর্যন্ত মায়ের মুখে এই সমস্ত বইয়ের কত কথাই না শুনিয়াছে! মায়ের উৎসাহে সেও তো কত বইয়ের পাতার উপর পাতা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। হাত বাড়াইয়া বইগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে বাহির হইল রাজস্থান—অমনি অসিতের মনে পড়িয়া গেল মহারাণা প্রতাপ সিংহের কথা—মনে পড়িল মহারাণার জীবনের শেষ সময়ে···সরোবর তীরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে শেষশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সুখ-দুঃখের চিরসহচর পরম বিশ্বস্ত সর্দারগণ। সহসা প্রতাপের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল; ঝাল্লাপতি প্রতাপের বেদনার কারণ কি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—"কেন; কেন মহারাণা, কি এমন দারুণ দুঃখ আপনার পবিত্র আত্মাকে ব্যথিত করিল—এ অন্তিম শয়নে কিসে আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইল?"

ক্ষণকাল পরে প্রতাপ কহিলেন—"সর্দার-শিরোমণি, প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না; কেবল একটি মাত্র আশ্বাস বাক্য পাইলেই উহা এখনই বাহির হইয়া যাইবে—সে আশ্বাসবাণী আপনাদেরই নিকট—আপনারা আমার সম্মুখে শপথ করিয়া বলুন যে, জীবিত

থাকিতে কখনও তুর্কীর হাতে মাতৃভূমি অর্পণ করিবেন না—বলুন তাহা হইলেই আমি সুখী হইয়া সুখে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি !” প্রতাপের বেদনায় অসিতের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। রাজস্থান তুলিয়া লইতেই বাহির হইল রঙ্গলালের গ্রন্থ—অমনি তাহার মনে পড়িল :

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে,
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।”

তারপর বাহির হইল—হেমচন্দ্রের—“ভারত সঙ্গীত”—অসিত মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল :

“বাজ্‌রে সিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রবে।”

সহসা পুনরায় পলাশী যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই—অসিতের মনে যেন মোহনলাল মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল—মনে পড়িয়া গেল :

“সামান্য বণিক এই—শত্রুগণ নয়
দেখিবে তাদের হায়
রাজা রাজা ব্যবসায়
বিপণি সমরক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।”

আবার মনে পড়িল :

“নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার
ডুবাইয়া বঙ্গ আজ, শোক সিন্ধু জলে ?

যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ উদয় অচলে।”

অদ্ভুতভাবে অসিতের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সহসা সে এক অদ্ভুতভাবে যেন নিজের ভিতরে নিজে জাগ্রত হইয়া উঠিল। এক অভূতপূর্ব উন্মাদনায় সমস্ত দেহ ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইল তাহার সম্মুখ হইতে একখানি কাল যবনিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে—আর তাহারই পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—রাণা প্রতাপ, মোহনলাল, তাহার দাদু শঙ্কর, বিদ্রোহী সিপাইগণ আর পরম মঙ্গলময় মূর্তি লইয়া তাহার মা ! সম্মুখে তাহার প্রসারিত রহিয়াছে শৃঙ্খলিত এই মহাদেশ—আর তাহার অগণিত নিপীড়িত নরনারী ! নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা—সংসারের কথা মন হইতে এক নিমিষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল।

ষোড়শ অধ্যায়

হঠাৎ অমিয়র নিকট হইতে একটি জরুরী তার আসিল—“শীঘ্র এস বিশেষ দরকার।” অসিত খবর পাইবামাত্র নানাপ্রকারের বিপদের কল্পনা করিতে করিতে কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। বাসায় পৌঁছিয়া দেখে—বাসা একেবারে জনমানবশূন্য—কোথাও কাহারও সাড়া নাই। এই শূন্য পুরীতে হঠাৎ কি অমঙ্গলের সংবাদ শুনিবে ভাবিয়া—সে মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। অমিয় একা একা চুপ করিয়া নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—অসিত সেখানে গিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে দাদা ?

অমিয় কোন জবাব না দিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিলেন। অসিত অমিয়র পাশে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অমিয়র চেহারার এক অদ্ভুত পরিবর্তন

হইয়াছে—দুই চোখ বসিয়া গিয়াছে—মুখ শুকাইয়াছে—মাথার চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অসিত ধৈর্য হারাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে দাদা—বৌদি কোথায়—শশাঙ্ক কোথায়? অমিয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোর বৌদি নাই—সে মারা গেছে—অসি!

—মারা গেছেন?

—হাঁ।

—শশাঙ্ক কোথায়—শশাঙ্ক?

—তার দিদিমা তাকে নিয়ে গেছেন।

—কিন্তু কি হয়েছিল দাদা—এমন হঠাৎ—

—হাঁ ভাই হঠাৎই—। কিন্তু অসি, সে যে আমার উপরে রাগ করে আফিং খেয়ে এমনি করে মারা গেল—সে দুঃখ আমি কেমন করে ভুলবো!

—আফিং খেয়ে?

—হাঁ সামান্য ঝগড়া হয়েছিল—এমনি তো প্রায়ই হতো, কিন্তু তারই ফলে সে নিজে মরে আমাকে এমনি শাস্তি দিয়ে গেল অসি!

অমিয়র দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। অসিতের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। কিছুক্ষণ পরে অমিয় পুনরায় বলিলেন—কাল রাত্রে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে দেহ তার শ্মশানে পুড়িয়ে শেষ করে রেখে এসেছি। অসিত সান্ত্বনার কোন ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া তেমনি চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর ভিতরে সদ্ভাব ছিল না—তাহা সে জানিত, কিন্তু ইহার পরিণতি যে এমনি করিয়া হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। পরের দিন সকাল বেলা অমিয় বলিলেন—যা হবার সে তো হয়ে গেল অসি—কিন্তু আমার একটা কথা শুনবি?

অসিত বলিল, কি কথা দাদা?

—তোরা সব কল্‌কাতায় চলে আয় অসি, আমি একা একা

তো আর থাকতে পারবো না ভাই! মন যে আমার সব সময় হাহাকার করে ওঠে রে। একবার মনে কচ্ছিলাম চাকুরী ছেড়ে দিই—কিন্তু এখন ভেবে দেখি চাকুরী ছাড়লে আমি বাঁচবো না—তবু তো নানা কাজে মনটাকে খানিকক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারবো। তুই বউমাকে, অঞ্জুকে নিয়ে আয় অসি, অঞ্জুকে কোলে নিয়ে হয়তো খানিকটা শান্তি পাব—আর হয়তো বৌমা এলে শশাঙ্ককে মাঝে মাঝে এখানে এনে রাখা সম্ভব হবে। আমার যে আজ কোন দিকেই কোন পথ নাই রে। চিরকাল ছেলের কাছেও অপরাধী হয়ে রইলাম। অসিত সম্মত হইয়া পরের দিন বাড়ি রওনা হইল—বলিয়া গেল যত সত্বর সম্ভব সকলকে লইয়া বাড়ি তালাবন্ধ করিয়া এখানে চলিয়া আসিবে। পথে আসিতে আসিতে অসিত মনে নূতন আলোক দেখিতে পাইল—দাদা তাহার মোটা মাহিনায় চাকুরী করেন। তাঁর স্নেহপ্রবণ মন একবার অঞ্জুকে পাইলে তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইবেন। তাহার সরল উদার ভ্রাতার সহিত কল্যাণীরও কখনও বিরোধ হইবে এ সম্ভাবনা নাই। অসিত ভাবিল এমনি করিয়া দাদার উপর নিজের সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ফেলিয়া দিয়া সে একান্ত হইয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। ভাবিতেই সমস্ত মন তাহার যেন নূতন করিয়া মুক্তির সন্ধান পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ইহারই দিন সাতেক পরে বাড়ির একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া কাত্যায়নী দেবী, কল্যাণী ও অঞ্জুকে লইয়া অসিত কলিকাতায় চলিয়া আসিল। অমিয় অঞ্জুকে লইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। প্রতিদিন অফিসে যাইবার আগে—অফিস হইতে ফিরিবার পর প্রায় সর্বক্ষণ অঞ্জুকে কোলে কোলে রাখিতেন। অঞ্জুও মাত্র কয়েকটা দিনে তাহার জ্যাঠামণির একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। সেদিন অমিয়র অফিস ছিল না—কথা ছিল সকালের দিকে গিয়া শশাঙ্ককে তাহার দিদিমার নিকট হইতে লইয়া আসিবেন। অসিত যেন কোথায় গিয়াছিল—বেলা গোটা বারর সময় বাসায় ফিরিয়া দেখে—অমিয় শুইবার ঘরের বাহিরের

বারান্দায় অঞ্জুকে কোলে লইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অসিত আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কই শশাঙ্ককে আনলে না দাদা! অমিয় ফিরিয়া তাকাইলে অসিত দেখিতে পাইল তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—না অসিত, তার দিদিমা তাকে ছেড়ে দিলেন না। অসিত খানিকটা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—কিন্তু আমাদের ছেলেকে তিনি জোর করে আটকে রাখবেন না কি? দুই একটা দিনের জন্যও কি তাকে এখানে পাঠাবেন না?

—না, হয়তো আর কোন দিনই তিনি তাকে এখানে পাঠাবেন না। কিন্তু আমারও তো সব জোর শেষ হয়ে গিয়েছে ভাই! অর্থের তাদের অভাব নাই—বাড়ীতে একমাত্র বড় চাকুরে মামা —অথচ তারও কোন সন্তানাদি নাই—শশাঙ্ক তাদের ভাবী উত্তরাধিকারী। আমি তাকে কি দিয়ে আর টানবো অসি! যাক, শশাঙ্ক আমার যেখানেই থাক্—ভাল থাক্, এর বেশী আর আমি কি বলবো ভাই! বলিতে বলিতে অমিয়র কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। অঞ্জুমণিকে নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় তিনি দূর আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করিয়া অবশেষে অসিত শেষ বেলায় পনর নম্বরের বাড়িটি বাহির করিল। বাড়িটি—বাগান-বাড়ি। একেবারে শহরের উত্তর সীমানার শেষ প্রান্তে অবস্থিত—তাহার পরেই টালার খাল। বাগান বাড়ির দক্ষিণে ও পশ্চিমে কুলি বস্তি—সকলেই কোন না কোন কলে কাজ করে। আরো খানিকটা পশ্চিমে কুলিবস্তিগুলির পরে একটি অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তা এবং তাহারই

ঠিক নিচে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। অসিত প্রথমে কিছুটা ইতস্ততঃ করিল, তারপরে ফটকের কাঠের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে ঢুকিতেই একজন যুবক কয়েকটি ফুলগাছের ঝোপের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া প্রশ্ন করিল—কাকে চাই?

—মধুকর বাবু আছেন—মধুকর গুপ্ত?

—আপনার নাম কি?

অসিত নাম বলিলে যুবকটি একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিয়া বলিল—ওখানে বসুন—আসছি। বলিয়া যুবকটি অদৃশ্য হইল।

বাগান বাড়িটি বেশী বড় নয়। চারিপাশে নারিকেল গাছ—ভিতরে কয়েকটি আম ও পেয়ারা গাছ—একপাশে গুটী কয়েক দেশী কুলের গাছ এলোমেলো ভাবে যদৃচ্ছা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভিতরে ঢুকিবার যে রাস্তা তাহারই খানিকটা দূরে একখানি মাঝারি গোছের একতালা দালান। দালানটির হয়তো বহুদিন চুনকাম করা হয় নাই। বাহিরে ধূলা বৃষ্টির প্রলেপে কাল কাল বিশ্রী দাগ ধরিয়াছে—বড়লোকের বাগান বাড়ি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কোন চিহ্ন ইহার কোনখানে নাই। অসিত চাহিয়া চাহিয়া এসব দেখিতেছিল—ইতিমধ্যে সেই যুবকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আমার সঙ্গে আসুন।

অসিত তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরের একপাশে বিছানায় ছিলেন মধুকর বসিয়া—দুই চোখ তাঁহার তখনও ঘুমে ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। এতক্ষণ সম্ভবত তিনি ঘুমাইতে ছিলেন। যুবকটি হয়তো এইমাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়াছে। অসিত ঘরে ঢুকিতেই তিনি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—এসো ভাই—বসো। অসিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—একি আপনি এই অবেলায় ঘুমুচ্ছিলেন না কি?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—হাঁ ভাই, কয়েকটা দিন খুব খাটুনি গেছে—ভাল করে আহার নিদ্রা জোটেনি কিনা—তাই আজ দিন দুই ধরে সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছি। তুমি একটু বসো আমি একটু মুখে হাতে জল দিয়ে আসছি।

পরে সেই যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি ভাই স্টোভটা ধরিয়ে একটু জল চড়াও না—অসিকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিই। আর এই সঙ্গে আমারও একটু—কি বল? বলিয়া মধুকর বাহিরে গেলেন। যুবকটি স্টোভ ধরাইতে বসিল। ঘরটির আর একপাশে আর একখানি বিছানা গুটান রহিয়াছে—তাছাড়া কিছু সামান্য রান্নাবান্নার সরঞ্জাম—একপাশে ছোট একটি টিনের তোরঙ্গ—তাহা ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু কোথায়ও চোখে পড়ে না।

অসিত যুবকটিকে প্রশ্ন করিল—আপনিও এখানে থাকেন বুঝি? যুবকটি কোন কথা না বলিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া খানিকটা ঘাড় দোলাইল। হাঁ, কি না, কি ইহার অর্থ অসিত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

—আপনার নাম?

যুবকটি এবারে হাসিয়া বলিল—চা-টা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হোন, নাম শুনতে পাবেন বৈকি?

অসিত এবারে খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া গেল—হয়তো নাম ইনি বলিতে চাহেন না—তাহার এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করাও হয়তো উচিত হয় নাই। ইতিমধ্যে বাহির হইতে হাত মুখ ধুইয়া মধুকর ঘরে আসিয়া বসিলেন। চা পরিবেশন ও পান করিয়া যুবকটি যেন কোথায় বাহির হইয়া গেল। মধুকর অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তারপর—অসি?

অসিত হাসিয়া বলিল—আজ এলাম দাদা।

মধুকর অসিতের মুখের উপরে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন—অর্থাৎ? অসিত তারপর একে একে তার দাদার কথা—তাহাদের সকলের কলিকাতায় চলিয়া আসিবার কথা বিবৃত করিয়া পুনরায় বলিল—আজ আমার সংসারের সমস্ত ভার দাদার উপর তুলে দিয়েছি—দাদা আমার অঞ্জুমণিকে একেবারে বুকে তুলে নিয়েছেন—স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার নিয়েছেন। সত্যিই আজ আর আমার ভাবনা নাই দাদা? মধুকর উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—

সংক্রামক ব্যাধির রোগী যেমন বাকী সকলকে রোগের বীজ ছড়িয়ে মৃত্যুপথের সহযাত্রী করে নেয়—আমি আজ তোমাকে তেমনি করে আহ্বান করছি ভাই!

—আমি তো প্রস্তুত দাদা!

—কিন্তু তার আগে তো সব কথা শুনতে হবে ভাই—কিসের জন্য এতখানি ত্যাগ করতে হবে তাতো জানা চাই!

—বেশ বলুন।

—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশবাসীর কি লাভ হলো দেখেছো তো ভাই। দলে দলে লোক এই যে দুঃখ বরণ করলে—তার ফলে আজ দেশের চতুর্দিকে চলছে শুধু শাসকের অত্যাচার। এমনি কোন আন্দোলনেই যে কোন ফল হবে অসি,—এ বিশ্বাস আমরা রাখি না। আর মনে কর যদি বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় কি ফল হবে তাতে? যাঁরা এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের কোন মিল নাই ভাই। এরা বিষবৃক্ষের গোড়ায় অশ্রু বর্ষণ ক'রে—তা থেকে অমৃত ফল আশা করেন, কিন্তু আমরা একেবারে শিকড় সমেত সমস্ত গাছটাকে উপড়ে ফেলতে চাই অসি! অসিত উৎসাহিত হইয়া বলিল—তাই তো চাই দাদা!

মধুকর বলিলেন—হাঁ, তাই চাই—আবেদন নিবেদন এখানে ব্যর্থ। দেশের তথাকথিত গণ্যমান্য যাঁরা এই বিষবৃক্ষের আশ্রয়ে ধনে জনে নিশ্চিত বিলাসে জীবন কাটাচ্ছে—দেশের অগণিত দারিদ্র নিপীড়িত জনগণের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না—ফিরে তাকাবার সাহস তাদের নাই। সে সাহস নাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই নেতাদের, নাই ন্যাশনেল কংগ্রেসের কর্তাদের। দেশের সত্যিকারের দুঃখ যদি কেউ অনুভব কর্তে পারে অসি—সে নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবে। যে অত্যাচারী নিজের ভাই বন্ধুর মুখের অন্ন কেড়ে নিলে—তার কাছে কি কখন যুক্তকরে দাঁড়াতে মন চায়, ভাই! দুই হাত আপনা-আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে যে! তাই আমরা এই পথটাই বেছে নিচ্ছি—আসত। সমস্ত ভারতবর্ষময় শক্তি ও সাহসের

উদ্বোধন করতে হবে। দরকার হলে নিজের প্রাণ দিতে—শত্রুর প্রাণ নিতে এতটুকু দ্বিধা আমরা করবো না। সমস্ত পাপপুণ্যের ভার সমস্ত কর্মের যিনি নিয়ন্তা তাঁকেই সমর্পণ করে দেব। সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর উপরে রেখে—মনে রেখে অদম্য সাহস—তবেই না এ আত্মত্যাগের পথে নামতে হবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। এমন কি যাদের জন্য এই আত্মত্যাগ তাদের কাছ থেকেও ঘৃণা ও একটা বীভৎস আতঙ্ক চিরজীবন কুড়িয়ে বেড়াতে হবে। এমনি হবে আমাদের জীবন। কিন্তু এত যে দুঃখ এত যে কষ্ট, তবু তো ঘরে বসে নিশ্চিন্ত বিলাসে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না ভাই, যার প্রাণে সত্যিকারের ডাক এসেছে, যে সত্যি সত্যি দেশকে ভালবেসেছে তাকে তো সাড়া না দিয়ে থাকবার উপায় নেই— "শুধু জানি যে শুনেছে কানে—

তাহার আহ্বান গীতি ছুটেছে, সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি—মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।"

এই আমাদের পথ—এমনি করেই আমাদের চলতে হবে ভাই। মধুকর চুপ করিলেন—গৃহের প্রতিটি বায়ুস্তরে যেন তাহার কণ্ঠ তখনও বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে কাটাইবার পর তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সারা ভারতবর্ষময় শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে এমনি বিপ্লবী দল সৃষ্টি করতে হবে —মানুষকে মরতে শিখাতে হবে, গুপ্ত কারখানায় অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হবে—সম্ভব হলে বিদেশ থেকেও আনতে হবে। কর্ম আমাদের আরম্ভ হয়ে গেছে—অসি। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক একজনকে ভার দিয়ে পাঠান হয়েছে। বাঙালী বিহারী মারাঠী পাঞ্জাবী সকল জাতিকেই দলে টেনে আনা হচ্ছে। তাছাড়া এই উদ্দেশ্য নিয়েই কয়েক বৎসর আগে আমরা ৪।৫ জন সারা ইউরোপ ও জাপান ঘুরে এসেছি। ভারতবর্ষের বাইরে বর্মায়, সিঙ্গাপুরে,

হংকং-এও আমাদের শাখা ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে। আমাদের অন্য উদ্দেশ্য হবে সৈন্যবিভাগে ঢুকে বা অন্য যে কোন প্রকারে হোক ভারতীয় সৈন্যদের সংস্পর্শে আসা; তারপর দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে তাদের এই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা। এমনি করে যখন আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারবো, তখন যুগপৎ সমস্ত ভারতবর্ষময় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সৈন্যবিভাগে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। সে বিদ্রোহের আগুনে এই শাসকজাতি একেবারে নিশ্চিত ভস্ম হয়ে যাবে। তবে একদিনে হবে না—দীর্ঘ সময় লাগবে—হয়তো পাঁচ, দশ কি বিশ বৎসর এমনি করে শক্তি সঞ্চয়েই কেটে যেতে পারে ভাই। তবু তো থামলে চলবে না—এ ছাড়া যে অন্য কোন পথ নাই! এমনি করে দুঃখ সহ্য কর্তে, এমনি করে পলে পলে আত্মাকে বলি দিতে পারবে তো অসি? কেউ হয়তো একটু সমবেদনা জানাবে না—তোমার আদর্শ অন্য কেউ বুঝবে না বরং দস্যু বলে, খুনে বলে মানুষ ঘৃণায় মুখ ফেরাবে। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আসবে মৃত্যুদণ্ড কিংবা হয়তো নিজের হাতে নিজের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে—অবলীলায় কালকুট ভক্ষণ করে নিজের জীবনের অবসান কর্তে হবে—পারবে অসি?

—পারবো দাদা।

—বেশ কাল সন্ধ্যায় এসো—তোমাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে হবে। আদ্য-প্রতিজ্ঞা, মধ্য-প্রতিজ্ঞা, অন্ত-প্রতিজ্ঞা—এই তিন প্রকার প্রতিজ্ঞা ক্রমে ক্রমে আমরা কর্মীদের পাঠ করাই। তোমাকে আদ্য, মধ্য-প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে হবে না অসি। প্রথমেই তুমি অন্ত-প্রতিজ্ঞা পাঠ করে একেবারে সমিতির ভিতরে ঢুকে যাবে।" অসিত যখন সেখান হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু নিদ্রা তাহার চোখের ত্রিসীমানার কাছেও আসিতে পারিল না। সারারাত্রি নানা চিন্তায় তাহাকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। পরের দিন সকালে অঞ্জুকে কোলে লইয়া অমিয় বাহিরের ঘরে

বসিয়াছিলেন। অসিত ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। অমিয় তাহার দিকে তাকাইয়া শুধাইলেন—কি অসি?

অসিত বলিল—এমনি এলাম দাদা।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিল—একটা কথা বলবো দাদা!

—কি কথা অসি—অত ইতস্ততঃ কচ্ছিস কেন রে?

অসিত তথাপি খানিকটা যেন কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা দাদা, অমনি অমনি একটা কথা মনে হলো, মনে করো হঠাৎ যদি আমি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যাই—সংসারের যদি কোন কাজেই আর না লাগি কিংবা যদি মনে করো এমনি করে কোথাও উধাও হয়ে যাই যে সেখান থেকে চিরজীবনে আর ফিরে না আসতে পারি—তখন কি আজকের মত এমনি করে অঞ্জুকে কোলে করেই রাখবে না? আমার সকল ভার তুমি বইবে না? কথা শুনিয়া অমিয় একেবারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; এ অসি কি বলিতেছে—দুই চোখ তাঁহার ছল ছল করিয়া উঠিল—এমন সর্বনেশে কথা তুই কেন বলছিস অসি? কেন এমন চিন্তা তোর মাথায় এলো ভাই! বলিয়া অঞ্জুকে নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইয়া তিনি একেবারে দুই চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। অসিত এবার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ছিঃ দাদা, তুমি কাঁদছো? শুধুই তোমাকে দুঃখ দিলাম। সত্যিই তো আর অমন কিছু হচ্ছে না। অমিয় চোখ মুছিয়া অঞ্জুকে আরও নিবিড়ভাবে নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন—অঞ্জুমণিকে তো আমি কোলে তুলেই নিয়েছি ভাই—ও দেবে আমার বুকে বল—দুবেলা তোর মুখ দেখে আমি পাব কাজের উৎসাহ—আর বউমা, আমার লক্ষ্মীর মতো সমস্ত সংসার ধারণ করে রাখবেন। অসি, তোদের কাউকে না হলে যে আমি বাঁচবো না ভাই। আমার আর কে আছে—বলিতে বলিতে পুনরায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কথার ছলনায় অমিয়কে কাঁদাইয়া যে কথা অসিত শুনিতে চাহিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। ভ্রাতৃপ্রেমের আনন্দে ও গর্বে তাহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা আজ আবার অসিত সেই বাগানবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গেটের পাশেই গতকল্যকার যুবকটির সাথে দেখা হইল।

তিনি হাসিমুখে বলিলেন—আসুন।

অসিত ঘরে ঢুকিয়া দেখে আজ ঘরে আরও দুই জন অপরিচিত লোক বসিয়া আছেন। অসিত ঘরে ঢুকিতেই মধুকর তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল—ঘরের ভিতরে একটি উজ্জ্বল কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। অসিতের মনে হইতে লাগিল অন্য দুই ব্যক্তি যেন তাহার প্রতি বিশেষ উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন, সে তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে অনেকখানি যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে মধুকর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—অসিত এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই —ইনি নলিনাক্ষ সেন, ইনি অতীন্দ্র ব্যানার্জি, এঁরা দুইজন এবং আমি—আমাদের এই তিনজনের উপরে বাঙলা দেশের সকল কর্মের ভার। আমাদের উপরে যিনি আছেন—তাঁর কথা তোমাকে পরে জানাবো অসি। আজ আমাদের সম্মুখেই তোমাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করে সমিতির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অসিত অন্য দুইজনকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মধুকর এক খণ্ড কাগজ তাহার হাতে তুলিয়া দিল—তাহাতে প্রতিজ্ঞা-পাঠ লেখা ছিল—অসিত পড়িয়া যাইতে লাগিল :

"আমি শপথ করিতেছি যে—আজ হইতে দেশসেবাই আমার ধর্ম, দেশসেবাই আমার কর্ম, দেশসেবাই আমার জাগ্রতে ও স্বপ্নে একমাত্র চিন্তা হইবে। আমার অন্য ধর্ম, অন্য কর্ম, অন্য চিন্তা থাকিবে না। স্বদেশকে বিদেশী-কবলমুক্ত করিতে দরকার হইলে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করিব না—নিজের জীবন প্রয়োজন বোধে অবহেলায় তুচ্ছ বস্তুর মত পরিত্যাগ করিব। সংসারের কোন বন্ধন রাখিব না। স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিব। নেতার আদেশ অম্লান বদনে পালন করিব। চরিত্র নির্মল

রাখিব। যদি কখনও বিশ্বাসভঙ্গ করি যে কোন শাস্তি মাথা পাতিয়া লইব। বন্দেমাতরম্!"

রাত্রি তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে—অসিত আজও ঘুমায় নাই, ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটি আলো মৃদু করিয়া রাখা হইয়াছিল—অসিত শয্যা হইতে উঠিয়া সেটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। খাটের উপরে কল্যাণী ও অঞ্জুমণি অসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি—সামনের খোলা জানালা দিয়া একফালি চন্দ্রালোক ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের আলোতে ও বাহিরের আলোতে মিশামিশি হইয়া অঞ্জুর ও কল্যাণীর মূর্তি একেবারে স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। কতক্ষণ নির্ণিমেষ নেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া অসিতের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—সমস্ত অন্তর ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। তাহার অঞ্জুমণি আজ আর তাহার নয়—কল্যাণীও তাহার নয়। এমন কি আজ সে নিজের জীবন—নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা—সমস্ত দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছে। দিন যাইবে—সুখ দুঃখে অঞ্জুমণি তাহার বড় হইয়া উঠিবে—কল্যাণী সন্তানের মুখ চাহিয়া তাহার বিরহ ভুলিতে চেষ্টা করিবে।

তখন কোথায় থাকিবে সে? কোন্ বন্দীশালায়—কোন্ বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া কিংবা হয়তো সমস্ত অতৃপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে অকালে বিসর্জন দিয়া—হয় নিজের হাতে না হয়—ফাঁসির মঞ্চে এ জীবনকে শেষ করিয়া দিবে। সহসা সে দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া দুই হস্ত জোড় করিয়া মনে মনে শুধু প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে ভগবান—অঞ্জুমণিকে, কল্যাণীকে আজ হতে তোমার পায়ে সমর্পণ করে দিলাম—আমার সমস্ত অভাব তুমি পূরণ করে দিও প্রভু। তারপর উঠিয়া আলোটি পুনরায় কমাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সমস্ত কলিকাতা শহর ভাসিয়া উঠিয়াছে—গাঢ় নীল আকাশের উপরে

চন্দ্রালোক যেন পাতলা সাদা কুয়াশার আবরণ টানিয়া দিয়া সাদায় নীলে মিশাইয়া দিয়াছে। সেই আকাশের দিকে একদৃষ্টে অসিত তাকাইয়া তাকাইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল :

"ধরার মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ
তোর তরে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা—
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

অসিত জানালায় ঠেস দিয়া বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুজলে ভরিয়া দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া বক্ষদেশ ভিজাইয়া দিতে লাগিল। খাটের উপরে অঞ্জুমণি ও কল্যাণী তখনও তেমনি অসাড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সমিতির নানাপ্রকার কর্মের ভিতর দিয়া অসিতের বৎসরখানেক কাটিয়া গেল, এই এক বৎসরের মধ্যে কখনও কখনও সে সমিতির খবরের কাগজ "যুগবাণী"র সম্পাদকের কাজ করিয়াছে, সমিতির হেড অফিসের কাজ করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময় মধুকরের সহিত বাঙলা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমনি করিয়া সে এই অল্পসময়ের ভিতরেই সমিতির একজন নামকরা কর্মী বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িল। এদিকে অমিয় মাঝে মাঝে অসিতকে কিছু একটা কাজকর্ম করিবার জন্য বলিয়াছেন

এবং নিজে দুই একটা চাকুরীর জোগাড়ও করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অসিত নানা অজুহাত দিয়া প্রত্যেক বারেই এড়াইয়া গিয়াছে। তাই ইদানীং অমিয় আর তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন না। অজয় এই দুই বৎসর ছাড়াইয়া তিন বৎসরে পড়িয়াছে। হাসিয়া খেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া সে সারা বাড়ি মাতাইয়া রাখে। অমিয় তাহাকে দিন দিন আরও বেশী ভালবাসিতেছিলেন—অজুও আজকাল আর তাহার জ্যোঠামণির কোল হইতে আর কাহারও কোলে যাইতে চাহে না। কল্যাণী নির্বিবাদে মুখ বুজিয়া মনের আনন্দে স্বামী ভাসুরের সেবা করিয়া যাইতেছে—কাজেই সংসারের কোন অশান্তিই অসিতকে তাহার সমিতির কাজে বাধার সৃষ্টি করে নাই।

সেদিন শেষ বেলার ট্রেনে মধুকরের সহিত অসিতের কলিকাতার নিকটবর্তী একটি শহরে কোন কাজের জন্য যাইবার কথা ছিল। অসিত আর মধুকর যখন আসিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল তাহার বহুক্ষণ পূর্বে হইতেই বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। আষাঢ় মাস—তাই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা যে কখন শেষ হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। ট্রেন হইতে যখন নামিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে বৃষ্টিধারা থামে তো নাই-ই বরং পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী জোরে চলিয়াছে। ছাতা মাথায় দিয়া সিক্ত বসনে দুইজনে স্টেশন হইতে পথে নামিয়া পড়িল। এদিকটায় বৃষ্টি হয়তো আরও জোর হইয়া গিয়াছে। রাস্তার উপরে স্থানে স্থানে বেশ খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে। দূরে দূরে রাস্তার আলোগুলা টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে—সেই অন্ধকারে জনশূন্য রাস্তার উপর দিয়া মধুকর আগে আগে এবং অসিত তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল। অনেকখানি পথ আসিয়া অনেক মোড় ও বাঁক ঘুরিয়া তাহারা একটি সরু রাস্তার উপর আসিয়া থামিল। অন্ধকারে আশে-পাশের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় স্থানটির অবস্থাও অসিত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একখানি টিনের ভাঙ্গা দরজা ঠেলিয়া মধুকর একটি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন—এসো অসিত।

অসিত অতি কষ্টে অন্ধকারে কয়েকটা ধাক্কা খাইয়া ছাতা সামলাইতে সামলাইতে বলিল—মহাভুল হয়েছে দাদা—একটা টর্চ সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল। মধুকর হাসিয়া বলিলেন—ভয় কি অসিত—পথ ঘাট আমার সব চেনা-যে। সম্মুখে একখানি টিনের চালাঘর—মধুকর তাহারই বারান্দায় উঠিয়া ছাতা বন্ধ করিয়া অসিতের হাত ধরিয়া সেখানে টানিয়া তুলিলেন। অসিত অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ঘরের ভিতরে একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল। তাহাদের সাড়া পাইয়া হঠাৎ সেখান হইতে কে প্রশ্ন করিল—কে—কে কথা বলে? মধুকর হাতের ছাতাটি এক পাশে রাখিয়া দিয়া আগাইয়া গিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল—আমি গাঙ্গুলী মশাই—মধুকর।—আরে মধুকর এসো এসো বাবা! মধুকর ঘরে ঢুকিয়া অসিতকে বলিল—এসো অসিত! ঘরে ঢুকিয়া পুনরায় প্রশ্ন হইল—ইনি কে?

—আমাদের লোক।

—বেশ বেশ বসো বাবাজী—এই—এই বিছানার উপরেই বসো। বলিয়া লোকটি বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—সেইদিকে হাত বাড়াইয়া ইঙ্গিত করিলেন। পরে পাশের কুঠুরিটার দিকে মুখ করিয়া ডাকিলেন—ও মৃণাল, এই দেখ মা, মধুকর এসেছে—মধুকর। মধুকর ততক্ষণ আলোটি খানিকটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। অসিত এতক্ষণে দেখিতে পাইল যিনি কথা কহিতেছিলেন তিনি একজন প্রবীণ লোক। দীর্ঘদেহ, মুখখানি যেন সদা হাস্যময়। তিনি আগাইয়া আসিয়া অসিতের কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন—বৃষ্টিতে খুব কষ্ট পেয়েছো বাবা। অসিত কি যেন একটি জবাব দিতে যাইতেছিল ইতিমধ্যে পাশের ঘর হইতে যিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি একজন স্ত্রীলোক—অসিত ভাবিল ইনিই মৃণাল হইবেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই একেবারে আলোটি পিছনে করিয়া দাঁড়াইলেন কাজেই তাহার চেহারাখানি সম্পূর্ণভাবে অসিতের চোখে ধরা পড়িল না।

—একি, এই বৃষ্টির ভিতরে এমন কি কাজ ?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—বৃষ্টিটা কি এতই ভয়ঙ্কর যে একেবারে ঘরের মধ্যে বন্ধ না হয়ে থাকলে চলবে না। কিন্তু অসুখ বিসুখের কাছে কোন বীরত্ব খাটে না কিনা, সেই যা কথা। পরে অসিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কিন্তু তোমার পরিচয় তো এখনও লওয়া হলো না ভাই ?

—ইনি কে, মৌমাছি ?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—ভয় নাই মৃণাল—কোন বাজে লোককে আমি সঙ্গে করে আনিনি নিশ্চয়।

—সে তো জানি।

মধুকর পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু লোকটি কে বলো দেখি, মৃণাল ?

মৃণাল কিছুক্ষণ অসিতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হাসিয়া মধুকরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আমি ঠিক চিনেছি মৌমাছি, —বলবো ?

—বল দেখি ?

মৃণালিনী খপ্‌ করিয়া অসিতের একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি ভাই অসিত, না ?

অসিত একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, একটু পরে বিহ্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মৃণালিনী হাসিয়া ফিরিয়া মধুকরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন —দেখেছো কেমন ধরে ফেলেছি। একি, জামা কাপড় যে একেবারে ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছে অসি !

অসিত এবার হাসিয়া বলিল—শুধু অসিত নয়, একেবারে অসিও জেনে ফেলেছেন ?

মৃণালিনী মাথা হেলাইয়া বলিলেন—হুঁ, তাই তো—আমি সব জানি ভাই। বৃদ্ধ লোকটি এতক্ষণে কথা কহিলেন—হাঁ, হাঁ তাইতো মা, কাপড় জামা যে ভিজে গেছে। একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—আমি সব করছি বাবা, তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নাই। বলিয়া মৃণালিনী নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—দেখেছো মধুকর, আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি—অথচ মৃণাল এক মুহূর্তেই ধরে ফেলেছে—কাপড় জামা তোমাদের ভিজে গেছে, কি আশ্চর্য!

মৃণালিনী দুইখানা কাপড় আনিয়া একখানা মধুকর ও একখানা অসিতের হাতে দিয়া বলিলেন—নাও ততক্ষণ কাপড় জামা ছাড়, আমি গায়ে দেবার দেখি কিছু যোগাড় করে আনতে পারি কিনা। বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে দুইখানা মোটা চাদর আনিয়া তাহারই একখানা অসিতের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—এখানা বিছানার চাদর ভাই—এই কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে নাও—গরীব বোনের যে এ ছাড়া আর কিছু নেই অসি! জামা কাপড় বদলাইয়া তাহারা বিছানার এক পাশে বসিয়া ততক্ষণ বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। মৃণালিনী তাহাদের পরিত্যক্ত জামা কাপড়গুলি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—তোমরা বসে বসে গল্প কর অসি—আমি ততক্ষণ একটু আহারের যোগাড় দেখি।

অসিত হাসিয়া বলিল—সেই ভাল দিদি! একটু তাড়াতাড়ি দেখুন!

মৃণালিনী হাসিয়া মধুকরকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—দাদারই তো ভাই, হ'বে না কেন, দুইজনেই পেট-পাগল।

মধুকর কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—মৃণাল, তুমি শেষে অতিথির নিন্দা করে বসলে—জান—'অন্তে তব অনন্ত নিরয়।'

মৃণাল বাহির হইতে হইতে বলিলেন—বাপরে! এ যে দেখছি যে সে অতিথি নয়—একেবারে দুর্বাসা মুনি!

বৃদ্ধ মধুকর ও অসিত তিনজনে এক সঙ্গেই হাসিয়া উঠিলেন। এ ঘরে যখন নানা বিষয়ে গল্প জমিয়া উঠিল—তখন পাশের ঘর হইতে স্টোভের শব্দ ও স্পিরিটের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

আরও কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পর সেখান হইতে মৃণাল ডাকিয়া বলিলেন—অসি ভাই, তুমি এই ঘরে এসো না—রান্না করতে করতে ততক্ষণ তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করি—মৌমাছি আর বাবা ওঁরা দুইজনেই গল্পে ওস্তাদ, ওঁদের সঙ্গে তোমার মিলবে না।

মধুকর হাসিয়া জবাব দিলেন—অর্থাৎ তোমার নিজের মুখটাও চুল বুল করছে—একজন শ্রোতা চাই এই তো! তা অসি বেশ ভাল শ্রোতা, মুখ বুজে নীরবে—যাই কেন বল না—শুনে যাবে। ওঘর হইতে জবাব আসিল—আর ও বেচারীর দুঃখটা তোমরা কেউ বুঝলে না, নিজেরা রইলে নিজেদের কথা নিয়ে মেতে—একে এই বৃষ্টি বাদলার দিন—ও হয় তো ভাবছে—এ কোন্ নিরাশ্রয়ে এসে পড়লো হঠাৎ। অসিত তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—কিন্তু নিরাশ্রয়ে যে পড়িনি—সে তো এখানে প্রথম পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি দিদি!

মৃণালিনী হাসিমুখে বলিলেন—এসো ভাই, ঐ বিছানাটার উপরে বসো। অসিত বসিয়া পড়িলে পুনরায় বলিলেন—কিন্তু ভাই, মৌমাছি তো একথাটা এতদিনেও বুঝলে না! নিজের প্রসঙ্গ উঠিতেই—মধুকর ওঘর হইতে বলিয়া উঠিলেন—ফের ওসব কি নিন্দে হ'চ্ছে, শুনি। মৃণালিনী বলিলেন—এ তোমার অন্যায় মৌমাছিদা—আমাদের কথার মধ্যে বাধা দিচ্ছ কোন অধিকারে শুনি?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—ওর সঙ্গে কথায় আঁটতে পারবে না মধুকর, বরং চুপ করে যাও!

মৃণালিনী হাসিয়া অসিতকে বলিলেন—দেখছো অসি—বাবাই কি আমার দিকে?

বৃদ্ধ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—না হতভাগী, আমরা সবাই তোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছি।

—না তো কি?—বলিয়া মৃণালিনী হাসিমুখে রান্নায় মন দিলেন। অসিত এতক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল।

তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার আরও অদ্ভুত মনে হইতেছিল ইঁহাকে। বয়স বোধকরি কোনক্রমেই ত্রিশের কম হইবে না, কিন্তু মুখের দিকে তাকাইলে হয়তো পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী কিছুতেই বোধ হয় না। চক্ষু দুইটি যেন ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতে থাকে। একখানা সরু পাড় ধুতিতে সারা দেহ তাঁর আবৃত, তবু তাহারই ভিতর হইতে মুখের কমনীয় রূপলাবণ্য যেন ঝিলিক মারিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এই রূপের দিকে চাহিলে আপনা হইতেই ইহার একটা স্বাভাবিক জ্যোতিতে যেন মাথা নত হইয়া আসে —অসিত দুই চোখ ভরিয়া এই রূপের দিকে তাকাইয়া ছিল। নিজের বয়সের সহিত ইঁহার বয়সের যে বড় একটা তফাৎ নাই —মনে করিয়া স্বাভাবিক যে সঙ্কোচ তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসরও সে পায় নাই। সে বসিয়া বসিয়া বুঝিতে পারিল—শুধু এই কারণেই হয়ত তিনি এমনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিতে পারেন। মধুকরের সহিত আলাপ পরিচয়ের কোন খবরই সে রাখে নাই—কিন্তু সে তো ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত—তাহাকে তো আপনার করিয়া লইতে তাঁহার একমুহূর্তও লাগিল না। মৃণালিনী মুখ তুলিয়া অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিন্তু তুমি যে কথা বলছ না ভাই। অসিত বলিল—কিন্তু আমার তো শুধু শুনবার কথা—বলবার যা তা তো আপনিই বলবেন।

—মৌমাছি দাদা তাহ'লে মিথ্যে বলেনি দেখছি, একেবারেই নীরব শ্রোতা। পরে পুনরায় তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন —খিচুড়ী তুলে দিলাম অসি!

অসিত উৎসাহের সঙ্গে বলিল—বেশ হ'বে দিদি, এই বাদলার দিনে, একটু আদা বাঁটা দিবেন।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন—ও বিদ্যেটাও জান নাকি ভাই! বউয়ের কাছে শিখে নিয়েছ বুঝি!

অসিত বলিল—আমার সব কথাই মধুদা দেখছি আপনার কাছে বলেছেন দিদি—কিছুই বাদ রাখেন নি।

—না ভাই কিচ্ছু না—মাকে, বউকে, অঞ্জুকে তুমি কত ভালবাস তাও বলেছেন। অসিত ইহার কোন জবাবই না দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কিন্তু ভাল যে আমাদের বাসতে নেই দিদি।

মৃণালিনী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—ছিঃ অসি, এ তুমি কোন বুদ্ধির কথা বল্লে ভাই? ভালবাসবে না? নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসবে—প্রতিবেশীকে ভালবাসবে—সমগ্র দেশকে ভালবাসবে—বুকভরা ভালবাসা না থাকলে কি সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়া যায় ভাই? ভালবাসতে পারার চেয়ে যে আর বড় কাজ নাই—অসি!

অসিত আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি করিয়া সাজাইয়া কথা বলা তো সামান্য কথা নয়! তাছাড়া বিপ্লবী নাম ইনি পাইলেন কোথা হইতে! মধুকর হয়তো কোন কথাই ইঁহার নিকট গোপন রাখেন নাই—ইহা কি ভাল হইয়াছে! যত বুদ্ধিমতীই তিনি হউন তবু কি সমিতির সব কথা এমনি করিয়া বলা উচিত! এই সংশয় মাঝে মাঝে তার মনকে থাকিয়া থাকিয়া দোলা দিতে লাগিল।

মৃণালিনী পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিলেন—বউ তোমাকে খুব ভালবাসে বুঝি অসি?

অসিত হাসিয়া বলিল—সে তো জানি না দিদি!

—জান না? সে কেমন করে হয়! ও জিনিসটা তো কেউ কখনও গোপন করে রাখতে পারে না ভাই? সে যে নানা মূর্তি ধরে প্রকাশ হয়ে পড়েই। অসিত কথার কোন জবাব না দিয়া শুধু মুখ বুজিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমি মুখ দেখেই ধরতে পারি ভাই—ভালবাসা তুমি পেয়েছ।

—আপনি দেখছি একেবারে সবজান্তা দিদি—কিছু জানতে আর বাকী নাই। বলিতে বলিতে হাসিয়া অসিত বিছানার উপর দেহখানি এলাইয়া দিল।

মৃণালিনী বলিলেন—বালিশটি টেনে নাও অসি—গরীব দিদির বিছানা বলে যেন ঘৃণা কোরো না ভাই!

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। পরে আবার প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা ভাই, বউ খুব কান্নাকাটি করেনি তো—তোমাকে ছেড়ে দিতে? তোমার আদর্শের কথা সব তাকে বলেছ তো?

অসিত বলিল—না, কিছুই বলি নি তো দিদি—সব কি তাকে বলা যায়?

—তাকে বলা যায় না? এ তুমি কি বলছো অসি?

—কিন্তু দিদি, সে যদি বুঝতে না পারে—তা ছাড়া সমিতির কথা তো কারু কাছেই বলা চলে না।—

—কারু কাছে বলা চলে না—ও কথা ভুল অসি—যাকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি তাকে বলা চলে। তোমাদের সমিতির সব কথা নাই বা বল্লে ভাই—কিন্তু তোমার আদর্শের কথাটাতো মোটামুটি তাকে জানাতেই হবে—নইলে যে অধর্ম হবে অসি।

—অধর্ম হবে?

—হ্যাঁ ভাই, বিয়ের সময় কি বলে মন্ত্র পড়েছিলে মনে নাই? সেদিন মন্ত্র পড়ে যে তাকে সকল কর্মের সাথী করে নিয়েছ—সকল সুখ দুঃখের ভাগী করেছো? আর বুঝতেই বা পারবে না কেন সে? তুমি বুঝিয়ে দেবে, তবু যদি না বোঝে তবে বুঝবো সে তোমার দোষ ভাই—তুমি বুঝিয়ে বলতে জান না।

অসিত অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কথাই ঠিক দিদি—এ কথাটি আমি অনেকবার ভেবেছি কিন্তু কোন কূলকিনারাই পাইনি।—এবার তাকে বলবো—সব জানাবো।

—হ্যাঁ জানিও সব। সবার কাছেই কি সব জিনিস গোপন কর্ত্তে হয় ভাই? পুনরায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাটিবার পর মৃণালিনী বলিলেন—ঘুমুলে ভাই?

—না ঘুমুইনি তো।

—অমনি চুপ করে গেলে যে?

—আমি শুধু ভাবছি দিদি—ভাবছি আমি তো বাইরের লোক,

কতটুকুই বা আপনাকে জানি—কিন্তু এই সময়টুকুর ভিতরে যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতেই যে আমার বিস্ময়ের সীমা নাই। মধুকর দাদা হয়তো সব জানেন—আপনাদের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক আমি জানিনে, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় করে জেনে ফেলেছি দিদি, তিনি তো যার তার সঙ্গ পছন্দ করেন না—পাকা জহুরীর মত খাঁটী মানুষটি বেছে বেছে বের করতে পারেন।

মৃণালিনী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—দাদার গুণ-গান করতে গিয়ে যে আত্মপ্রশংসা হ'য়ে গেল অসি।

অসিত বলিল—হোক গিয়ে আত্মপ্রশংসা—তবুও আমি বলবো দিদি। আর শুধুই কি তাই—এই একটু আগে বল্লেন যে ভাল না বাসলে বিপ্লবী হওয়া যায় না—সে কথা যে মধুকর দাদাকে না জেনেছে সে তো বুঝবে না দিদি। মানুষকে এমন প্রাণভরে ভালবেসে আপনার করে নেবার ক্ষমতা কয়জনের আছে?

মৃণালিনী এতক্ষণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন—এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দাদার যে ভারী ভক্ত হয়ে উঠেছ অসি!

—ভক্ত কি আর অমনি হয় দিদি—মন যে আপনিই ভক্তিতে নুয়ে পড়ে।

মৃণালিনী একেবারে তরল হাসিতে কণ্ঠ ভরিয়া বলিলেন—সত্যি নাকি? দাদাটি দেখছি ভাইয়ের মাথাটি একেবারে বিগড়ে দিয়েছেন!

এমন সময় দরজার ভিতর দিয়া গলা বাড়াইয়া মধুকর বলিয়া উঠিলেন—এ কি, গল্পে যে দুইজন একেবারে মেতে উঠেছো। খাবার কিছু রাতের মধ্যে জুটবে, না একেবারে হরিবাসর।

—এই যে হয়েছে বসে পড়ো—অসিও ওঠো ভাই।

পরের দিন সকাল বেলা মৃণালের ডাকে অসিতের ঘুম ভাঙ্গিল—উঠে হাতে মুখে জল দিয়ে নাও অসি, সকালের ট্রেনে কল্‌কাতায় ফিরে যাবে যে! ইহারই মধ্যে লুচি, হালুয়া আরও কি সব খাবার

তৈরী হইয়া গিয়াছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অসিত বলিল—আপনি কি সারা রাত ঘুমোন নি দিদি।

মৃণালিনী বলিলেন—কেন বলতো?

—তা নইলে এই এত সব করলেন কখন?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—তোমার অত প্রশ্নের দরকার কি অসি! এখন হাত চালিয়ে নিজের কাজটি করে যাও দেখি—ওসব বাজে ভদ্রতা করবার সময় আছে নাকি এখন! বলিয়া তিনি খান দুই লুচির সঙ্গে হালুয়া মাখিয়া মুখের ভিতরে পুরিয়া দিলেন।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন—কেমন অসি—কালরাত্রে যে দয়ামায়া না কি সব ভাল ভাল বিশেষণ দিয়ে দাদার গুণ ব্যাখ্যা করছিলে, তেমনি আরো দুই চারিটি বুলি এখনও বল শুনি? দাদাটির কথাবার্ত্তায়ও ঠিকঠিকই মিলে যাচ্ছে বোধ হয়। মৃণালের পিতা এতক্ষণ কথা বলেন নাই—এবার বলিয়া উঠিলেন—সত্যি মধুকর, অসিতের কথা মিথ্যে নয়—যেদিন তুমি আস সেদিন যেন মৃণাল আমার নতুন মানুষ হয়ে ওঠে—কেমন করে তোমাকে খাওয়াবে—যত্ন করবে শুধু এই চেষ্টা। আমাকে বলে মৌমাছি দাদা কল্‌কাতায় কিছু খায় না বাবা, পাছে সমিতির টাকা কিছু বেশী খরচ হয় এই তার সব সময় ভয়।

মধুকর হাসিয়া মৃণালের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। দৃশ্যটি কিন্তু অসিতের দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার মন এই দিদিটিকে ঘিরিয়া কত কি কল্পনা করিয়া ফিরিতে লাগিল। জলযোগ শেষ হইলে মধুকর নিজের সুটকেস হইতে কাগজে মোড়া কি একটা দ্রব্য অসিতের হাতে দিয়া বলিলেন—দেখতো অসিত জিনিসটা একবার। অসিত কাগজের আবরণ সরাইয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া বলিল—রিভলবার এলো কোথা থেকে দাদা?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—গাঙ্গুলী মশাই তৈরী করেছেন—

জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বলিয়া পুনরায় সেটি সুট্‌কেসের ভিতরে লুকাইয়া রাখিলেন। পরে মৃণালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এবার ভোজন-দক্ষিণা চাই মৃণাল। মৃণালিনী বলিলেন—কত চাই ?

—আপাতত শ পাঁচেক।

ঘরের এক কোণে রক্ষিত লেপ কাঁথার ভিতর হইতে পাঁচটি নোটের তাড়া আনিয়া সে মধুকরের হাতে তুলিয়া দিল।

মধুকর সেগুলিকে ভাল করিয়া কোটের ভিতরের পকেটে ভরিয়া লইয়া বলিল—এবার তা হলে আসি মৃণাল।

মৃণাল কিন্তু কথাটি কহিল না। অসিত মৃণালের পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল, চল্লাম দিদি।

মৃণালিনী বলিল—চল্লাম বলতে নেই ভাই—আবার এসো, দিদিকে ভুলো না। অসিত মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কিন্তু পথে আসিয়া সে ইহাদের কোন আচরণেরই কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। মনে তাহার নানা প্রশ্ন বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

দুইজনে আসিয়া গাড়ীর এক নিরালা কোণে চাপিয়া বসিলেন। দূরে দূরে দুই একজন কলের কুলি মজুর ভিন্ন আর অন্য যাত্রী কেহ কামরায় ছিল না। মধুকর ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ করিলেন—খুব আশ্চর্য হয়েছ বুঝি অসি !

অসিত বলিল—সত্যি দাদা, এঁদের সব কথা শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

—সময় হলে সব কথাই জানাব অসি। কিন্তু আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, গাঙ্গুলী মশাই এবং তাঁর মেয়ে মৃণালিনী এঁরা দুজনেই আমাদের লোক। সমিতির কোন লোকের চেয়েই এঁরা কম বিশ্বাসী নয়—এমন কি আমার চেয়েও নয়। আর এত বিশ্বাস তাদের উপরে রাখি বলেই সমিতির সকল অর্থ মৃণালিনীর কাছেই গচ্ছিত রাখি। অনেকদিন তুমি জানতে চেয়েছ অসি,

যে অর্থ আমি কোথায় রাখি—আজ দেখতে পেলে? এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর আমি একটিও খুঁজে পাইনি ভাই। এর বেশী আজ আর কিছু জানতে চেয়ো না। অসিত আর একটি কথাও না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তাহার সমস্ত অন্তর এই অপরিচিত অদ্ভুত দিদিটির উপরে শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আরও কয়েকটি বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে নানা অবস্থায় নানা আ:বেস্টনীর মধ্যে অসিতের দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে দেশে নানাস্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি এবং কয়েকজন দেশী ও ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী এই বিপ্লব সমিতির হাতে নিহত হইয়াছে। এই কয়টা বৎসর গভর্নমেণ্ট পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশদলকে অতিরিক্ত শক্তিশালী করিয়াছেন। কয়েকটি স্থানে আততায়ী স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে—যাহারা পলাইয়া গিয়াছে—তাহাদেরও কেহ কেহ ধরা পড়িয়া নানা নিগ্রহ ভোগের পর বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩।৪ জনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, ৮।১০ জনের দ্বীপান্তর হইয়াছে। যুগবাণী পত্রিকার উপরেও তীব্র রাজরোষ পড়ায় বাধ্য হইয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাস। ইতিপূর্বে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। বৃটিশ সরকার এই যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। নানা কারণে বর্তমানে ইহাদের সমিতির সম্মুখে নানা গুরুতর সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। তাই আজ ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের ২।১ জন করিয়া বিপ্লবী নেতা কলিকাতায় আসিয়া সন্ধ্যার পরে মধুকরের সেই বাগান বাড়িতে সমবেত হইয়াছেন। অত্যন্ত সঙ্গোপনে এই সভার আয়োজন করা

হইয়াছে। যাঁহারা যাঁহারা এই সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছেন —তাঁহারা অধিকাংশই পুলিসের সন্দেহভাজন ব্যক্তি। মধুকর পূর্ব হইতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গেটের কাছে দুইজন দুইটি রিভলবার লইয়া এবং প্রাচীরের উপরে গাছের অন্তরালে লুকাইয়া দুইজন রাইফেল ধরিয়া পাহারা দিতেছিলেন। কোন-প্রকার অতর্কিত আক্রমণ হইলে এই চারিজন প্রাণ দিয়া শত্রুকে ঠেকাইবেন এবং সেই অবসরে ভিতরের সভ্যগণ অন্য পথে পলাইয়া যাইবেন, সে ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঘরের ভিতরে একটি ক্ষীণালোকের সম্মুখে সতরঞ্চির উপরে পনর জন লোক চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন কর্তার সিং, মহারাষ্ট্রের চিন্নায়ার, বোম্বের মিঃ যোশী, মাদ্রাজের মিঃ জিনজাইয়া ও রামন নায়ার, যুক্ত প্রদেশের অতীন্দ্র মুখার্জি, বিহারের রাজেন্দ্র শুকুল এবং বাঙলার নলিনাক্ষ সেন, মধুকর ও অসিত, কিন্তু ইহারা যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অসিতের আজ কৌতূহলের অন্ত ছিল না—এই কয়টি বৎসর ধরিয়া এই সমিতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিলেও কখনও এমন করিয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বিপ্লবী নেতাদের সহিত পরিচিত হইবার তাহার কোনদিন সৌভাগ্য হয় নাই। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত সমিতির কর্ণধার যাঁহার নির্দেশ অবিচলিত চিত্তে সমস্ত প্রদেশের প্রত্যেক বিপ্লবী নেতাই অবনত মস্তকে প্রতিপালন করেন, সেই মিঃ মুখার্জির আজ এই সভায় যোগদানের কথা। তাঁহার প্রতীক্ষাই ইঁহারা করিতেছিলেন। তিনি বাঙালী হইলেও একটা দিনের জন্যও অসিত তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে নাই। ইঁহার সম্বন্ধে সে কত না গুজব শুনিয়াছে। অদ্ভুত তাঁহার সাহস—অদ্ভুত তাঁহার রিভলবার আর রাইফেলের হাত, পৃথিবীতে এমন কোন ভয়ঙ্কর বিপদের নামই নাকি আজ পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই—যাহা তাঁহার মনে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা বা সঙ্কোচ আনিতে পারে। এক নিমিষের মধ্যে তাঁহার কর্তব্য ঠিক

হয়—আজ পর্যন্ত কোন কার্যে তিনি বিফলকাম হন নাই। মানুষ চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার অসীম—যে কোন লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার সারা অন্তরের কথা এক নিমেষে বুঝিয়া লইতে পারেন।

গভর্নমেণ্টের খাতায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ জমিয়া আছে—একবার ধরিতে পারিলেই হয় দ্বীপান্তর বা ফাঁসী তাঁহার, একেবারে নিশ্চিত হইয়া আছে। সরকার হইতে বারে বারে ঘোষণা করিয়া দেওয়া আছে যে এই লোকটিকে জীবন্ত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—কিন্তু তবুও এই অদ্ভুত মানুষটি দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া নগরে গ্রামে সমিতির শাখা প্রশাখার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার তো দূরের কথা কেহ তাঁহার টিকিটিও আজ পর্যন্ত দর্শন করিতে পারে নাই। অসিত আজ সর্বক্ষণ ধরিয়া শুধু তাঁহারই কথা ভাবিয়া যাইতেছিল। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল ঘরের লোকগুলিও ততই বিচলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি যে কোথা হইতে আসিবেন—সে বোম্বাই কি মাদ্রাজ পাঞ্জাব কি আসাম তাহা কেহই জানিতেন না। রেল গাড়িতে চড়িয়া কি হাঁটিয়া আসিবেন তাহাও অজ্ঞাত। শুধু যে আজ রাত্রি ১০টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবেন—এইটাই জানা ছিল এবং আজিকার এই সভাও তাঁহারই নির্দেশে স্থির করা হইয়াছিল। এমনি সময় সম্মুখের রাস্তাটি দিয়া একজন মুশকিল আসানের ফকির চেরাগদানী হাতে জ্বালাইয়া কি সব ছড়া কাটিতে কাটিতে আগাইয়া আসিয়া একেবারে বাগান বাড়ির গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। যে দুইজন গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা কাপড়ের নিচে শক্ত করিয়া রিভলবার চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ ফকিরের মুখে একটি হাসি খেলিয়া গেল এবং মুখ দিয়া কি একটা সাঙ্কেতিক শব্দ বাহির হইতেই যুবক দুইজন মাথা নত করিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়া সরিয়া গেল। ফকির সাহেব

সোজা বাগান বাড়ির ভিতরের ঘরটিতে ঢুকিয়া একপাশে তাহার প্রদীপটি নামাইয়া নিভাইয়া রাখিয়া হাসিমুখে পুনরায় সেই সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিতেই ঘরের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা জানাইলেন। ততক্ষণ ফকিরের বেশের ভিতর হইতে যে লোকটি বাহির হইয়া আসিলেন অসিত নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহারই দিকে তাকাইয়া রহিল। ইনিই মিঃ মুখার্জি। তাহাদের সমিতির সর্বময় কর্তা!

তারপর সমবেত সভ্যদের দিকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন—এই যে আপনারা সকলেই এসেছেন দেখছি—বলিয়া তিনি তাহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন।

মহারাষ্ট্রের মিঃ চিন্নায়ার বলিলেন—মিঃ শান্তনম্ আসতে পারেন নি। তাঁর খুব শক্ত অসুখ—জীবনের আশা নাই।

মিঃ মুখার্জি হাসিয়া বলিলেন—আপনি বোধ হয় এক সপ্তাহ আগের খবর বলছেন—আমি পরশু তাঁকে দেখে এসেছি, আর কোন ভয় নেই, ক্রাইসিস কেটে গেছে।

অসিত অবাক হইয়া গেল—এই ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটির সমস্ত দলের উপরে কি অসীম প্রভাব! গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে ধরিবার জন্য এত ব্যস্ত! কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অসিত যেন বিহ্বল হইয়া গেল—এত তীব্র দৃষ্টি, এত জ্যোতিতে ঝলমল করা চোখ তো সে কখনও দেখে নাই—এ যেন একজোড়া টর্চলাইট।

তারপর রাত্রির বহুক্ষণ ধরিয়া নানা আলোচনার পর স্থির হইল—বর্তমান ইউরোপের এই যুদ্ধে ইংরাজ সরকার বিশেষ করিয়া জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন—সুতরাং এই সুবর্ণ সুযোগে ভারতবর্ষময় বিদ্রোহ করিতে হইবে।

মাস ছয়েক পরে একটি দিন স্থির হইল—ঐ দিনে যুগপৎ ভারতের সর্বত্র—সমস্ত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠান দখল করিতে হইবে। সৈন্যদের ভিতরে বিদ্রোহ করিতে হইবে—রেল ও স্টীমারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে ইত্যাদি। সভার পরে

সেই রাত্রেই প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রদেশে রওনা হইয়া গেলেন। ইহার পরের দিন কোন একটি নিরালা বাড়ির এক কক্ষে বসিয়া কয়েকজন পরামর্শ করিতেছিলেন। মিঃ মুখার্জি, মধুকর, নলিনাক্ষ, অতীন ও অসিত এই পাঁচজন ছিলেন উপস্থিত।

আজ একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা ছিল। কয়েক দিন পরে কলিকাতা হইতে কিছু দূরের একটি বন্দর হইতে কিছু বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ও গুলি-গোলা কয়েকখানি গরুর গাড়িতে বোঝাই হইয়া সৈন্য পাহারায় কলিকাতার দিকে আসিবে জানিতে পারা গিয়াছে। সেইগুলি পথিমধ্য হইতে ছিনাইয়া আনিতে হইবে। অত্যন্ত শক্ত কাজ। অন্তত ১০।১২ জন খুব ভালভাবে প্রস্তুত হইয়া এই কাজে নামিতে হইবে। কাহাকে এই কাজে অধিনায়ক করা হইবে? কে সমস্ত বাধা অস্বীকার করিয়া জীবনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য না হারাইয়া এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে? অনেক আলোচনার পর অবশেষে স্থির হইল মধুকর স্বয়ং অসিত ও আরো দশজন সঙ্গীসহ এই কাজে অবতীর্ণ হইবেন। মধুকরের সহিত অসিতও হাসিমুখে এই ভার গ্রহণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

বিংশ অধ্যায়

ইহারই দিন পনর পরে একদিন রাত্রিবেলা অসিত তাহার মৃণালদির বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই মৃণালিনীর সহিত দেখা হইয়া গেল। মৃণালিনী যেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন এমনিভাবে অসিতকে নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের খবর কি অসি?

অসিত কোন জবাব না দিয়া বিহ্বলের মত শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মৃণালিনী দেখিলেন অসিতের মুখ যেন

একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গিয়াছে—দুই চোখ গিয়াছে বসিয়া—মাথায় রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হইয়া উঠিয়াছে।

মৃণালিনী পুনরায় ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে অসি? মৌমাছি কোথায়?

—তিনি ধরা পড়েছেন দিদি!

—ধরা পড়েছেন?

—হ্যাঁ।

মৃণালিনী সেইখানেই মাটির উপর কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন—আমি সব জানি ভাই। মৌমাছি কয়েকদিন আগে আমাকে সব বলে গিয়েছেন। কিন্তু এমন অঘটন কেমন করে ঘটলো অসি? সব খুলে বলো ভাই!

অসিত বলিতে লাগিল—আমরা ছিলাম বারজন। বিশ পঁচিশ জন সশস্ত্র সৈন্য গরুর গাড়ি দুইখানা পাহারা দিয়ে চলছিল। গাড়ি দুইখানিতে বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, গুলীগোলা বোঝাই। আমরা পথের বাঁকে গা ঢাকা দিয়ে তাদের অপেক্ষা করছিলাম—অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে প্রথমে আমরা তাদের পা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ি—তারাও গুলী ছুড়লো, আমাদের ভিতরে একজন আহত হয়ে পড়লো। মধুকরদা তখন আদেশ দিলেন পায়ে নয় বুকে গুলী কর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জনদুই তাদের মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বাকী সবাই প্রাণভয়ে পালাল। নিকটে গঙ্গার ঘাটে দুইখানা ছোট নৌকা বাঁধা ছিল। আমরা ৮।১০ জন কিছু অস্ত্রশস্ত্র গুলীগোলা নিয়ে সেই নৌকায় চড়লাম। নৌকায় উঠে মধুকরদা বলে উঠলেন, অভয় কই? অভয় প্রথমেই আহত হয়েছিল—কিন্তু আঘাত তার হয়তো তেমন গুরুতর নয় এই ছিল আমাদের ধারণা। অন্য সবাইকে নৌকায় রেখে মধুকরদা আর আমি অভয়কে খুঁজতে গেলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি কিছুদূর এসেই দেখি রাস্তার পাশে অভয় পড়ে আছে। ডান হাতের এক পাশ দিয়ে বুকের দিক হতে তার অজস্র রক্ত ঝরে পড়ছে। মধুকরদা কোন কথা না বলে অভয়কে কচি ছেলের মত

কোলে তুলে নিয়ে নৌকার দিকে দ্রুতপদে ছুটতে লাগলেন—আমি চল্লাম পাশে রিভলভার হাতে করে। তখন চারি পাশে সাড়া পড়ে গেছে। দূরের কুলীবস্তিগুলিতে হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে। নৌকায় এসে দেখি গঙ্গার দুই পাশে লঞ্চে আর নৌকায় ঘিরে ফেলবার উপক্রম করেছে। নৌকা আমরা ছেড়ে দিলাম। অভয় কিন্তু মধুকরদার কোলের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ফেল্লো। গঙ্গার স্রোতে তাকে ধীরে ধীরে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন, দাঁড় টান। একখানা নৌকায় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হয়েছিল—আর একখানাতে ছিলাম আমরা ৫ জন পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে। আমরা বারদুই ফাঁকা আওয়াজ করলাম, কিন্তু কোনই ফল হলো না—লঞ্চে নৌকায় আমাদের ঘিরে ফেলতে লাগলো—'সার্চ লাইট' ফেলতে লাগলো—পালাবার আর কোন পথই রইলো না। তখন তিনি বলে উঠলেন—আমার সঙ্গে মরতে রাজী আছ কে?—আমরা সকলেই অধীর আগ্রহে রাজী হলাম, কিন্তু তিনি বেছে নিলেন অবিনাশকে—বাকী সবাইকে বল্লেন তোমরা অন্য নৌকায় গিয়ে চারজোড়া দাঁড় টেনে পালাও—আমরা যতক্ষণ পারি এদের আটকে রাখবো। সবাই একে একে অন্য নৌকায় গিয়ে উঠলো—আমি তবুও দাঁড়িয়েই রইলাম।

মধুকরদা বল্লেন—যাও অসিত।

আমি বল্লাম—যদি মরতেই হয় দাদা, আমিও আপনার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে মরবো। তিনি ধমকে উঠে বল্লেন—বাজে তর্ক করো না বলছি—শিগগির যাও। তবুও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—এবার তিনি আমার বুকের উপরে রিভলভার ধরে বল্লেন—সৈনিকের অবাধ্যতার শাস্তি কি জান? যাও বলছি—তোমাকে বাঁচতে হবে।

আর একটি কথাও না বলে অন্য নৌকায় উঠে গেলাম। আমাদের নৌকা তীরবেগে কলকাতার দিকে ছুটে চল্লো।

নিজেদের চোখে তো কিছুই দেখি নি দিদি—যেতে যেতে অনেকবার গুলীর শব্দ শুনেছি—অনেক চেঁচামেচি শুনেছি।

অবশেষে আমরা নিরাপদে সাঙ্কেতিক স্থানে পৌঁছলাম। অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে এনে রাখলাম। আজ দিনের বেলায় শুধু এই খবরটুকু জানতে পেরে বুঝেছি যে হয়তো নৌকা তাদের বন্দুকের গুলী লেগে ডুবে গিয়েছিল। চার পাশ থেকে নৌকা আর লঞ্চগুলো বিশেষ করে ঘিরে না ফেললে কখনও তাঁকে ধরতে পারতো না। ধরা পড়েছেন একা তিনি, অবিনাশের কি হলো কিছুই জানা যায় নি।—হয়তো লঞ্চ থেকে তাদের লক্ষ্য করে যে গুলী ছুড়েছিল তারই আঘাতে সে মারা গেছে—নদীতে ভেসে গেছে তার দেহ। আর তো কিছু জানিনে দিদি! এতক্ষণে অসিত মৃণালিনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল তাঁহার সারা দেহখানি যেন একেবারে পাথর হইয়া গিয়াছে—মুখে একটা কথা নাই—দুই চোখের পাতা স্থির, নিঃশ্বাস বহিতেছে কি বহিতেছে না। অসিতের কোন্ কথা যে তাঁহার কানে গিয়াছে, কোন্ কথা যে যায় নাই তাহা কে বলিবে?

অসিত ডাকিল—দিদি!

সহসা যেন চমক ভাঙ্গিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—কি অসি?

—দুঃখ করে তো কোন লাভ নেই দিদি! যাঁর জন্যে এই দুঃখ তাঁকে তো আমাদের আর দশজনের মতো বিচার করা যায় না। যখন আমি নৌকায় তাঁর কাছ থেকে কিছুতেই চলে আসতে চাইনি—তখন সেই জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পেলাম তাঁর দুই চোখ উঠেছে জ্বলে—মুখের ভাব হয়েছে কি ভীষণ কঠোর—সেই দিকে তাকিয়ে যেন মনে হলো এ লোকটার কাছে এ সংসারে কর্তব্যই বুঝি একমাত্র সার বস্তু—দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা সব তাঁর উপলক্ষ মাত্র। সে দেয়ও যেমনি, মেপে নেয়ও তেমনি। মৃণালিনী হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না এ তোমার ভুল অসি! তুমি আঘাত পেয়েছ ভাই—তাঁকে রক্ষা করতে পার নাই, তাই অমনি ভুল করে ভাবছো। নইলে সত্যি করে যদি ভাবতে—দেখতে পেতে—তাঁর সারা অন্তর যে স্নেহ,

ভালবাসায় একেবারে ভরপূর। সে কতটুকু নিতে পারে জানিনে ভাই—কিন্তু দিতে যে পারে অজস্র তার সাক্ষীর তো অভাব নেই অসি! পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত বেদনার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল—অসিত এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই—এবার কানে যাইতেই বলিয়া উঠিল—ও কিসের শব্দ দিদি। মৃণালিনী মুখ তুলিয়া বলিলেন—আজ আমার বিপদের অন্ত নাই ভাই—দুইদিন হলো বাবার নিউমোনিয়া হয়েছে।—চলো তো যাই দিদি, দেখি তিনি কেমন আছেন? অসিত রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া আসিয়া গাঙ্গুলী মশাইয়ের রোগশয্যার কাছে বসিল।

মৃণালিনী বলিলেন—তোমার মুখ চোখ শুকিয়ে গিয়েছে—অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুমি শুতে যাও অসি। অসিত বিছানায় আসিয়া শুইল বটে, কিন্তু ঘুম তাহার চোখের সীমানা দিয়াও গেল না। শুইয়া শুইয়া আজ কত চিন্তাই না তাহার মাথার ভিতরে কিলবিল করিতে লাগিল। সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রির দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে—

বাহিরে আসিয়া দেখে মৃণালিনী ঘরের বারান্দায় একটি খুঁটিতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পাশের ঘরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল গাঙ্গুলী মশাইয়ের কাছে চৌদ্দ পনর বৎসরের একটি ছেলে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—ঘুম ভাঙ্গল ভাই!

—হ্যাঁ দিদি, উনি কেমন আছেন?

—ভাল নয় ভাই, হয়তো এ যাত্রা আর ওঁকে ফেরাতে পারবো না!

অসিত শঙ্কিত হইয়া বলিল—কিন্তু ডাক্তারকে তো তাহ'লে এখনই একবার ডেকে পাঠান দরকার দিদি!

মৃণালিনী ঘরের ভিতরের ছেলেটিকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন—অতুল তো এইমাত্র ডাক্তারের কাছ থেকে এলো—একটু বাদে

তিনি আসবেন। অসিত হাত মুখ ধুইয়া গাঙ্গুলী মশাইয়ের নিকটে গিয়া বসিল।

ডাক্তার আসিলেন—রোগী দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্তায় কোন ভরসার লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এমনি করিয়া আরো দিন তিনেক ধরিয়া অবস্থা তাঁহার অত্যন্ত সঙ্কটের ভিতর দিয়া কাটিয়া অবশেষে চতুর্থ দিনে গাঙ্গুলী মশাইয়ের দিন শেষ হইয়া আসিল—শেষ বেলায় তিনি মারা গেলেন। পাড়ার একদল যুবক অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই মৃতদেহ গঙ্গার ঘাটে লইয়া গেল। মৃণালিনী পিতার শেষ কাজ করিবার জন্য শ্মশানে গেলেন। অসিতের এমনি করিয়া বাহিরে যাওয়া উচিত নয়—মৃণালিনী সেইজন্যই তাহাকে বাড়ি পাহারার ছলনায় রাখিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে ঘরের বারান্দায় একা একা চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অসিতের হৃদয় যেন কিসে চাপিয়া ধরিতেছিল। সেদিনের ঘটনার পরে ছয়টা দিন চলিয়া গিয়াছে —ইহার ভিতরে আরো কত লোক সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়াছে —কতজনকে পুলিশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—সে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। মিঃ মুখার্জি তাহাকে কয়েকটা দিন এখানে আসিয়া লুকাইয়া থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেই নির্দেশই সে পালন করিতেছে। পুলিশ তাহাকেও খুঁজিয়া বেড়াইতেছে কিনা —কতদিন তাহাকে এমনি অজ্ঞাতবাসে দিন কাটাইতে হইবে সে জানে না। কথা আছে যতদিন না তাহাকে এখান হইতে অন্যস্থানে যাইবার আদেশ হয় ততদিন তাহাকে এখানেই থাকিতে হইবে। মধুকরের কথা মনে আসিতেই তাহার মন একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল—যে লোকটি এমন করিয়া দেশকে ভালবাসিয়াছে—নিজের ভাবনা চিন্তা বলিতে এ জগতে যাহার কিছুমাত্র নাই—সেই সর্বত্যাগী লোকটির পরিণাম কি হইবে? সেদিন গঙ্গাবক্ষে রাত্রের অন্ধকারে আরো দুই একটা লোক নাকি গুরুতর আহত হইয়াছে। তারপর রাস্তার উপরে যে দুইটি লোক মারা গিয়াছে—একটি তাহার গুলীতে

আর একটি মধুকরের গুলীতে—তাহার সমস্ত বোঝাই হয়তো একা মধুকরের উপর গিয়া পড়িবে—এই সব প্রমাণ হইলে বিচারে তাহার চরম দণ্ড একেবারে নিশ্চিত।

আরো দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মিঃ মুখার্জির নিকট হইতে খবর আসিল—অসিতকে কলিকাতায় যাইতে হইবে—পুলিশ তাহাকে কোন সন্দেহ করে নাই—ভয়ের কোন কারণ নাই। বিদায় লইবার জন্য মৃণালিনীর ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া অসিত দেখিতে পাইল তিনি বিছানায় পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া চলিয়াছেন। অসিত ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে বসিয়া ডাকিল—দিদি!

মৃণালিনী কিছুক্ষণ পরে খানিকটা শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—কেন ভাই?

—আমি তো চলে যাচ্ছি দিদি—যাবার আদেশ এসেছে যে।

—কিন্তু মৌমাছির কি হবে ভাই! কে তাকে আনবে ফিরিয়ে —কে তাকে করবে রাজদণ্ড থেকে রক্ষা! বলিয়া পুনরায় তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই রহস্যময়ী নারীকে অসিত মোটেই জানে না—মধুকরের আসন যে তাঁহার হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া বিস্তৃত—কি যে তাহার ইতিহাস ইহার কিছুই সে জ্ঞাত নহে—তবু ইহা যে কত গভীর—মধুকর যে তাঁহার হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া বসিয়া আছেন—তাহা বুঝিতে আজ তাহার একমুহূর্তও লাগিল না। অসিতের নিজের মনও কয়দিন ধরিয়া অনবরত মধুকরের জন্যই হাহাকার করিতেছিল—সে সহসা ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না—তাহারও দুই চোখ বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অসিত বলিতে লাগিল —মিঃ মুখার্জি কলকাতায়ই আছেন, মধুকরদার বিচার শেষ না হলে হয়তো তিনি আর কোথাও যাবেন না। তাঁর ক্ষমতা তো আপনার অজানা নয়—তাঁর সেই ক্ষমতায় যতখানি সম্ভব হয় তার তো ত্রুটি হবে না দিদি! মৃণালিনী উদাস ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন —ত্রুটি হয়তো হবে না ভাই—কিন্তু আমার মন বলছে অসি—

এবার তাঁকে তোমরা কেউ রক্ষা করতে পারবে না—আমরা হয়তো আর তাঁকে দেখতো পাবো না ভাই, তাঁহার কথার ভিতর হইতে যেন হতাশার সুর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল—তিনি পুনরায় বলিলেন—তোমাদের নেতাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি ভাই —তবু আমার অনেক কথাই—তিনি জানেন—আমার হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো এখন আমি কি করবো! আর সমিতির হাজার দুই টাকা আছে আমারই কাছে গচ্ছিত, এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিতে বলো ভাই! আমার সমস্ত শক্তি সমস্ত উৎসাহ আজ একেবারে শেষ হয়ে গেছে অসি!

অসিত জবাব দিল—কিন্তু আগে থাকতে এমনি করে ভেঙ্গে পড়া তো উচিত নয় দিদি! বিচার হবে—ভাল উকিল, ব্যারিস্টারও আমাদের অভাব হবে না। এমনও তো হতে পারে—প্রমাণের অভাবে শাস্তি তাঁর মোটেই হবে না।

—কিন্তু এ বৃথাই আমায় তোমার সান্ত্বনা দেওয়া অসি—তোমার কথার পিছনে তোমার নিজের মনই যে সায় দিচ্ছে না —সে কি তুমি বুঝতে পারছো না ভাই! কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর অসিত বিদায় লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একবিংশ অধ্যায়

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মধুকরের বিচারের জন্য তিন জন বিচারক লইয়া একটি বিশেষ বিচার সভা গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য যাহারা আসামী ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া পুলিশ মামলা তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছে। মাস কয়েক হইল মিঃ মুখার্জির নির্দেশমত অসিত কলিকাতায় ছোট্ট একখানা বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে মৃণালিনীকে আনিয়া রাখিয়াছে। মধুকরের জন্য সমিতি হইতে কলিকাতার অত্যন্ত নাম করা কয়েকজন ব্যারিস্টারকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই—আজ বিচারকগণ একমত হইয়া মধুকরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা অসিত তাহাদের সেই "যুগ বাণী" অফিসের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মন হাহাকার করিয়া মরিতেছিল। শেষে মধুকরের মত লোকেরও ফাঁসি যাইতে হইবে! যে কোন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাঁহার হয় তো একদিন পৃথিবীজোড়া নাম হইত—তাঁহাকেই আজ এই দুর্ভাগা দেশে একজন দস্যুর মতো একজন সাধারণ নরঘাতকের মতো অকালে প্রাণ হারাইতে হইবে।

মিঃ মুখার্জির আদেশে অসিতকেই যাইয়া মৃণালিনীকে এই সংবাদ দিয়া আসিতে হইয়াছে। মৃণালিনী সমস্ত শুনিয়া একটা কথাও কহেন নাই—সারাক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু অসিতের বিদায়ের সময় বলিয়াছিলেন—অসি, যা হবার তা তো হবে জানি—এদেশে আমি আর থাকবো না—শুধু যে কয়টা দিন সে বেঁচে থাকবে সে কয়টা দিনই আছি ভাই! তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ ভাই তার শেষ সময়ের খবর তার অন্তিম ইচ্ছা যদি কিছু থাকে তবে আমাকে জানিও অসি। অসিত সমস্ত স্বীকার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছে। অসিত ইহাদের পূর্বতন কোন সম্বন্ধই জানে না, কিন্তু এটা সে নিশ্চিত করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, এ সংসারে মধুকরকে এমন একান্ত করিয়া এমন প্রাণপণ করিয়া আর কেহই মঙ্গল কামনা করে না। তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও হয়তো তাঁহার কাছে ম্লান হইয়া যায়, এই নারীটি আজ দুই মাস ধরিয়া কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী হইয়া দিনের পর দিন আতঙ্কিত আগ্রহে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়াছেন, দিন দুই পরে অনেক চেষ্টা করিয়া অসিত মধুকরের সহিত দেখা করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। জেলের ক্ষুদ্র একটি "সেলে" ছিলেন তিনি বসিয়া। অসিত দেখিয়া অবাক হইয়া গেল—সম্মুখে তাঁহার একখানা গীতা রহিয়াছে খোলা—তিনি তাহারই মাঝে যেন ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো একেবারে ডুবিয়া

গিয়াছেন। চোখে মুখে তাঁহার না নামিয়াছে কোন বিষাদ বা আতঙ্কের ছায়া—না হইয়াছে তাঁহার স্বাভাবিক জ্যোতি এতটুকু ম্লান। কয়দিন পরে যাঁহাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—জোর করিয়া এই পৃথিবীর সহিত যাঁহার সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দেওয়া হইবে তাঁহার মনে এমনি শান্তি কোথা হইতে আসিল? তিনি অসিতের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—কে অসি? অসিত একটা কথাও না বলিয়া শুধু বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তিনি পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিলেন—যা হবার বেশ হয়েছে অসি—এ নিয়ে তোমরা দুঃখ করো না। মৃণালের সমস্ত ভার নিশ্চয় তুমি নিয়েছ—তাকে বলো সেও যেন এ নিয়ে দুঃখ করে নিজের অশান্তিকে আরো বাড়িয়ে না তোলে। এ জগতের পরে যে স্থান আছে সেখানে গিয়ে নিশ্চয় আবার একদিন আমাদের দেখা হবে—সেই আশায় যেন সব দুঃখ সে ভুলে থাকে। অসিত যে কথা বলিতে আসিয়াছিল এবার অত্যন্ত সঙ্কোচে তাহাই আরম্ভ করিল—কিন্তু দাদা প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে রাজার কাছে আবেদন করলে হয়তো সে আবেদন মঞ্জুরও হতে পারে। মধুকর কিছুক্ষণ দুই চোখের দৃষ্টি অসিতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন—ছিঃ অসি, এ কথা কি তোমার বলা ঠিক হলো ভাই! বলতো ভিক্ষা করা প্রাণ নিয়ে আমি কি করবো? এ পৃথিবীতে তার আর কি প্রয়োজন থাকবে? বেঁচে থাকাই তো বড় কথা নয় ভাই—শুধু বেঁচে থাকতেই যদি মানুষ পৃথিবীতে আসতো তা হলে মানুষে আর পশুতে ভেদ রইতো কি? অসিত আর কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। নিজের মনে যে এমনই স্থির প্রতিজ্ঞ, তাহার কাছে সকল যুক্তি সকল কথা যে আপনি চুপ মারিয়া যায়। সেদিন সারাটা দিন ধরিয়া অসিত বারে বারে নিজের মনে ভাবিতে লাগিল—তাই তো যে মধুকরের মতো এমনি করিয়া সর্বস্ব পণ করে নাই—জীবন ও মৃত্যুর সত্যিকারের পরিচয় যে জানে নাই—অন্তরে অন্তরে এমনিই

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া উঠে নাই—সে তো প্রকৃত বিপ্লবী হইতে পারে না—এই শেষ সাক্ষাতে এই শিক্ষাই তো মধুকর তাহাকে দিয়া গেলেন। এই শিক্ষাই তো তাহাকেও সারা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—এমনি করিয়া প্রাণের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করিয়া হয়তো একদিন মরণের পথে আগাইয়া যাইতে হইবে। ইহার দিন দশেক পরে মধুকরের ফাঁসি হইয়া গেল। অসিত সেদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত খবর সংগ্রহ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। ইতিপূর্বে তাহাদের দলের কোন একজন কর্মী এই জেলে ছিলেন, জেলের জনৈক সিপাহীকে কিছু টাকার লোভে বশীভূত করিয়া সেই কর্মীটির নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

একদল কলেজের ছাত্র মধুকরের মৃতদেহ শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। অসিত বা তাহাদের দলের অন্য কেহ নানা কারণে এই দলে যোগ দেয় নাই। এতক্ষণ হয়তো দেহ তাঁর পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে। অসিত চোখ বুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া শুধু ইহাই ভাবিয়া চলিয়াছিল। বিকাল বেলা মিঃ মুখার্জির নিকট হইতে নির্দেশ আসিল সন্ধ্যার সময় তাহাকে যাইয়া মৃণালিনীকে সমস্ত খবর জানাইয়া আসিতে হইবে। এই ভয়ই সে করিতেছিল। তাঁহার কাছে যাইয়া কেমন করিয়া সে এই নিদারুণ সংবাদ শুনাইবে—কি বলিয়াই বা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে! সন্ধ্যাবেলা অসিত যখন মৃণালিনীর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হইল তখন পা দুইখানি তাহার কে যেন পিছন হইতে টানিয়া টানিয়া ধরিতে লাগিল। সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখে ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে—ভিতরে জমাট অন্ধকার। সে শঙ্কিত মনে বারান্দা হইতে সেই অন্ধকারের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দৃষ্টি গোচর হইল না। বাহিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—দিদি কি ঘরে আছেন?

ভিতর হইতে মৃণালিনী বলিলেন—কে অসিত? এসো ভাই!

তাড়াতাড়ি দিয়াশলাই জ্বালিয়া বাতি ধরাইয়া পুনরায় বলিলেন—ভিতরে এসো অসি!

অসিত কুণ্ঠিত পদে ভিতরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া মেঝের উপরে একপাশে বসিয়া পড়িল। আজ যে ফাঁসির নির্দিষ্ট দিন তাহা মৃণালিনীরও অজ্ঞাত ছিল না। এতক্ষণ হয় তো তিনি বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে ছিলেন—ম্লান আলোতে তাঁহাকে অতি অদ্ভুত দেখাইতেছিল—অসিতের মনে হইতেছিল শুধু দেহখানাই বুঝি তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে—মনপ্রাণ কোন সুদূরে উধাও হইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পরে তিনি অসিতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—শেষ হয়ে গিয়েছে তো ভাই?

অসিত ধীরে ধীরে নিজের পকেট হইতে সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—এই চিঠিখানায় তাঁর সব কথা লেখা আছে, দিদি!

চিঠিখানা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—দুঃখ আমি আর করবো না ভাই—এই দুই মাস ধরে নিজের হৃদয়কে একেবারে পাষাণ করে তুলেছি। সেদিন তোমায় বলেছিলাম—আমি এদেশে আর থাকবো না। তোমাকে কিন্তু ভাই কয়েকটা দিন আমার জন্য কষ্ট করতে হবে—আমাকে সঙ্গে করে কাশী রেখে আসতে হবে—কালই যেতে চাই—ভাই!—

—আপনার সঙ্কল্পে আমি বাধা দেবো না দিদি, কিন্তু আপনার চলবে সেখানে কি করে, সে সম্বন্ধে মিঃ মুখার্জির সঙ্গে একটা কথাবার্তা বলে নিতে চাই।

—তুমি ভেবো না অসি। বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে কেউ অভুক্ত থাকে না যেমন করেই হোক দিন নিশ্চয়ই কাটবে।

দিন চারেক পরে কাশীর বাঙালীটোলার একটি অল্প পরিসর ঘরের মধ্যে মৃণালিনীর সম্মুখে অসিত বসিয়াছিল। তাহার ট্রেনের সময় হইয়া আসিতেছিল—এখনই বিদায় লইতে হইবে।

মৃণালিনী বলিতেছিলেন—তোমার এই অদ্ভুত দিদিটিকে তুমি কি চক্ষে দেখেছ, আমি জানিনে, কিন্তু তোমার মনের কোণে যদি কোথাও কোন সংশয় থাকে ভাই তা আর রেখো না। কোন দিন কোন অন্যায় তোমার এই দিদিটি করে নাই অসি। এতে আমার গর্ব কিছু নাই ভাই—এ তোমার সেই সন্ন্যাসী দাদার শিক্ষা! এ জগতে আমাদের কি সম্বন্ধ ছিল কিছুই তার হয়তো তোমরা জান না—কিন্তু এ জগতে জোর করে সে কথা তো বলতে পারবো না ভাই। যদি পরলোকে আবার আমরা মিলতে পারি—সে কথা তখনই বলবো। জানি সেখানে কেউ আমাদের আর বাধা দিতে পারবে না। শুধু এই কথাটি মনে রেখো ভাই জগতে আমাদের দুজনার কারুর মধ্যে এতটুকু কালিমা—এতটুকু মলিনতা স্পর্শ করে নাই। অসিত তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল—যেদিন আপনাকে দেখেছি দিদি—সেই দিনই অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকেছে—সেদিন এও বুঝেছি এ জগতের আর দশজনের মতো আপনার বিচার করা যায় না। সেই দিন থেকে কোন দিনই সে চেষ্টা করি নি শুধু মনে মনে ভক্তি করেছি—পূজা করেছি। মৃণালিনী অসিতের মাথাটি নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কয়েকবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন—সত্যি তুমি আমার ছোট ভাই অসি! কিন্তু আজ এই বিদায় বেলা তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করতে হয় তা তো জানিনে ভাই! অসিত ম্লান হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের আপনিই তো আশীর্বাদ করতে জানেন দিদি—যে আশীর্বাদ অন্য কারুর মুখ থেকে বেরুবে না—সে আশীর্বাণী যেন আপনার মুখ থেকেই বেরুতে পারে।

মৃণালিনী মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু তুমি বিপ্লবী হলেও যে আমার ভাই। অসি—তোমাকে আমি সে আশীর্বাদ করতে পারবো না। বলিয়া তিনি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অসিত বলিল—না পারলে তো চলবে না দিদি—মনে মনে শুধু এই আশীর্বাদই করুন, আপনার এই ভাইটি যেন

তার মধুদাদার উপযুক্ত শিষ্যই হতে পারে—আর কিছু এ জগতে তার কাম্য নাই। অসিত পুনরায় তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পা বাড়াইয়া বলিল—এবার যাই দিদি!

—আর কি দেখা হবে না ভাই?

অসিত চলিতে চলিতে জবাব দিল—না, এই হয়তো আমাদের শেষ দেখা দিদি!

পথে নামিয়া তাহার চোখ ভরিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু একবারও আর পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কিন্তু বিপ্লব আরম্ভের নির্ধারিত দিনের পূর্বেই গভর্ণমেণ্ট সব কথা জানিয়া ফেলিলেন। কোন একটি রাজনৈতিক ডাকাতির মামলার আসামী আই বি পুলিশের নিকট সমস্ত খুলিয়া বলে এবং ইহাদের দলের সিঙ্গাপুরের কোন এক ডাক্তারও দলের সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, ফলে হঠাৎ একেবারে ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল এবং পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার ও অনেক গুপ্ত দলিলপত্র হস্তগত করিয়া ফেলিয়া গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিলেন। কাজেই ভারতবর্ষময় এই যে একটা বিরাট বিপ্লবের সম্ভাবনা তাহা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। গুপ্ত সমিতি হইতে ইস্তাহার বিলি করিয়া নির্ধারিত দিনকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। মাস দুই পরে পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া কলিকাতার কোন জনবহুল অঞ্চলের একটি বাড়ির তে-তলায় আবার একদিন রাত্রে এক গুপ্ত সভা বসিল। এ সভায়ও যথাসম্ভব ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের বিপ্লবী নেতাগণ আসিয়া যোগ দিলেন এবং ছয় মাস পরে পুনরায় অন্য একটি দিন বিপ্লবের জন্য স্থির হইল। সভার পর অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ বিদায় লইলে মিঃ মুখার্জি, অতীন ব্যানার্জি, নলিনাক্ষ সেন ও অসিত

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ইতিপূর্বে বিদেশ হইতে কোন ব্যাঙ্কের মারফত ইহাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ আসিত। এখন সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অথচ যথেষ্ট অর্থ দরকার। এই লইয়াই এখন এই তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক নেতাদের উপরে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে। আরও প্রায় পাঁচ সাত লক্ষ টাকার দরকার। মিঃ মুখার্জি নিজে বড় বড় জমিদারদের নিকট হইতে চার পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন আশা করেন। বাকী দুই তি. লক্ষ টাকা বাঙলা দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইতিপূর্বে বাঙলা দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু এখন গভর্ণমেণ্টের এই বিরুদ্ধ মনোভাবে কোন ব্যক্তিই আর পূর্বের মত অর্থ সাহায্য করিতেছেন না এবং বিপ্লবীদের সঙ্গ যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বড় বড় কয়েকটি ডাকাতি ভিন্ন যে আর এই অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় নাই তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং এই পথই স্থির হইল। কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে একটি জেলা সহরের ট্রেজারী লুঠের পরিকল্পনা হইল। দিন পনর পরে চৈত্র মাসের শেষে ট্রেজারীতে চৈত্র কিস্তির খাজনার টাকা আসিয়া জমিবে, সেই সময় অন্ততপক্ষে দুই তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই সেখানে জমা থাকিবে। সুতরাং পনর দিন পরে উক্ত সহরের ট্রেজারী লুঠের পরিকল্পনাই স্থির হইল। জেলার সদরে সশস্ত্র পাহারার ভিতরে গিয়া ট্রেজারী লুঠ অতি দুরূহ কার্য—কাজেই অত্যন্ত যোগ্য লোকের দরকার। মিঃ মুখার্জি, নলিনাক্ষ সেন ও অমিতের অধীন আরও পনর জন বিপ্লবীকে এই কার্যের ভার অর্পণ করিলেন। সে পনর জনের নামও তিনিই স্থির করিয়া দিলেন। দশজনের নিকট বন্দুক ও রিভলভার থাকিবে, বাকী সাতজনের নিকট প্রধানতঃ থাকিবে লোহার সিন্দুক ও তালা ভাঙ্গিবার জন্য হাতুড়ী, ছেনি ও একপ্রকার কিছু উগ্র

অ্যাসিড যাহা দ্বারা লোহা ও সীসা গলাইয়া ফেলা যায়। কোমরে অবশ্য তাহারাও এক একটি পিস্তল ঝুলাইয়া লইবে—দরকার হইলে, যাহাতে শত্রুর সম্মুখে সতেরজনই রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে চুপ করিয়া অসিত নিজের বিছানায় শুইয়াছিল—দুই চোখের পাতা বন্ধ থাকিলেও মন তাহার উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল—ঘুমের লেশমাত্র চোখে বা মনে কোথাও ছিল না। ঘরের একপাশে অজয় তাহার খেল্‌না লইয়া একমনে কি যেন একটা অত্যন্ত জরুরী কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সেই এতটুকু অঞ্জু—আজ সাত বৎসরের অজয়। অসিতের অর্ধোন্মীলিত চোখের পাতার ভিতর দিয়া অজয়ের মুর্তিখানি বারে বারে ভাসিয়া উঠিতেছিল—তাহার মাথায় কালো কোঁকড়ান চুল, পটোল-চেরা চোখ, টিকালো নাক—সর্বোপরি কাঁচা সোনার মত রং তাহাকে এক অপূর্ব সুষমায় ভরিয়া দিয়াছে। সেই এতটুকু অঞ্জু কেমন করিয়া যে দিনের পর দিন এমন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছে—কবে এমন অপূর্ব শোভায় তাহার সারা দেহ ভরিয়া গিয়াছে—তাহার কোন খবরই তো অসিত রাখে নাই। সেই যে যখন অঞ্জু কোলে কোলে ফিরিত—যখন গ্রাম ছাড়িয়া তাহারা কলিকাতায় আসিয়া বাসা বাঁধিল, তাহার পর হইতে তো সে যথাসাধ্য পুত্রকে এড়াইয়া চলিয়াছে। হয়তো পূর্বের মত আদর করিয়া আর একটি দিনও কোলে করে নাই—নিজের বুকের উপরে তাহাকে দুই বাহু দিয়া চাপিয়া ধরিয়া স্নেহরসে নিজের অন্তরকে ভরিয়া লয় নাই। কল্যাণীর দৃষ্টি ইহা এড়ায় নাই—সে কতদিন ইহা লইয়া কত অনুযোগ করিয়াছে—অভিমান করিয়াছে। কিন্তু অসিত যে কত অসহায় তাহা তো সে জানিতে পারে নাই সে যে বিপ্লবী—এ পৃথিবীর স্নেহ মমতাকে যে তাহাকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। না হইলে স্নেহের বন্ধন কবে কোন্ দুর্বল মুহূর্তে তাহাকে কোথায় টানিয়া নামাইয়া দিবে তাহা কে জানে? কতদিন অঞ্জু আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া

আদর করিয়া আধ আধ স্বরে বলিয়াছে—বাবা, বাবু! অসিত হয়তো মুখে একটি কথাও কহে নাই—কখনও হয়তো অল্প একটু কোলে তুলিয়া লইয়া নামাইয়া দিয়াছে। অভিমানী বালক মুখ ভার করিয়া ঘরের এক পাশে ঘাড় ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়াছে। এমনি কত কথা আজ অসিতের একে একে মনে পড়িতে লাগিল। সে সহসা ডাকিয়া উঠিল—অঞ্জু—অঞ্জুমণি! অজয় ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া অসিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া বলিল—বাবা!—বাবু!—বাবামণি! অসিতের বুক ভরিয়া ক্রন্দনের রোল ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতে যাইতেছিল। সে কিছুক্ষণ অজয়কে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিজের মনকে খানিকটা স্থির করিয়া লইয়া বলিল—কিছু নয় বাবা—যাও খেলা করগে যাও! অজয় কিন্তু নড়িবার নামও করিল না—পুনরায় তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল—তবে ডাক্‌লে কেন? কি বলবে বল না বাবা—এই তো আমি এসেছি। অসিত আর একটি কথাও কহিল না—ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া অজয়কে কোলে লইয়া বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া পুনরায় তাহার দুই নয়ন অঝোরে ঝরিতে লাগিল।

অজয় বলিল—কেন কাঁদছো বাবা?

অসিত এবার জোর করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অজয়ের মুখ চুম্বন করিয়া কহিল—আর কাঁদবো না বাবা! এমনি করিয়া পনেরটি দিন কাটিয়া গেল। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে দুইখানা নৌকা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে—সেই নৌকা করিয়া তাহারা নিজেরা গঙ্গা উজাইয়া দিন তিনেকের মধ্যে কৃষ্ণনগরের কাছে গিয়া পৌঁছিবে। সেখান হইতে সাত আট মাইল পথ হাঁটিয়া তবে গিয়া কৃষ্ণনগর শহরে উপস্থিত হইতে হইবে। সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বর হইতে নৌকা ছাড়িবার কথা। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই—অসিত নিজের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল—নিজের জামাকাপড় পরিয়া লইয়া কয়েক মুহূর্ত

যেন কি ভাবিয়া শূন্যমনে চুপ করিয়া ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা যেন মন তাহার হু হু করিয়া উঠিল—মনে হইল এ ঘরে হয়তো আর কোনদিন ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল, তখন কল্যাণী দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বলিল—চল্লাম কল্যাণী।

কল্যাণী বলিল—ফিরবে কবে?

—ঠিক করে তো বলতে পারি না।

—একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।

অসিত মাথা নাড়িয়া বলিল—আচ্ছা।

সিঁড়ির পাশে অমিয়র ঘর। সেখানে তখন অঞ্জুমণি তাহার জ্যাঠামণির কোলের উপরে মাথা রাখিয়া একমনে গল্প শুনিয়া যাইতেছে—আর মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কথা অসিতের কানে আসিয়া বাজিতেছিল—সিঁড়ি দিয়া নামিবার আগে চুরি করিয়া সেইদিকে খানিকটা তাকাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সন্ধ্যার সময় অসিত আসিয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছিল। তখনও সকলে আসিয়া পৌঁছে নাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলেই আসিয়া পৌঁছিলে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ক্রমাগত দুই রাত্রি ও দুই দিন ধরিয়া দাঁড় বাহিয়া ও গুণ টানিয়া নৌকা তাহাদের সেদিন শেষ বেলায় নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া কাটাইয়া যে যাহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া শহরটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল—একজন রহিল নৌকা পাহারায়। স্থানীয় একজন কর্মী ছিলেন পথ প্রদর্শক। চৈত্র মাস শুক্লপক্ষের কি একটা তিথি। কিছুক্ষণ

হইল চন্দ্র অস্ত গিয়াছে—না আলো না অন্ধকারে সারা পথ প্রান্তর ভরিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাসের কঠিন ভূমির উপর দিয়া তাহারা পথ অতিক্রম করিতেছিল। সম্মুখে চার পাঁচ মাইল ব্যাপী একটি বিরাট প্রান্তর—তাহার পর যে রাস্তাটি সেইটি নাকি একেবারে সোজা শহরে গিয়া মিশিয়াছে। সুতরাং অন্ধকার বাড়িবার আগেই যাহাতে শহরটিতে গিয়া পৌছান যায়—সেই উদ্দেশ্যে তাহারা দ্রুত পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কখনও শুষ্ক মাটির ঢেলায় পা বাধিয়া তাহারা হোঁচট খাইতেছিল—কখনও পতিত জমিতে কি একপ্রকার কাঁটাগাছে তাহাদের কাপড় পিছন হইতে টানিয়া ধরিতেছিল—মাঠের মাঝে ছোট বড় খেজুরগাছ ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া এক একটি দৈত্যের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে মাঝে এক এক ঝাপ্টা ঝড়ো হাওয়া—শোঁ শোঁ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল—খেজুরগাছের ডেগোয় আর পাতায় ঝির ঝির করিয়া একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ হইতেছিল। বহু দূরের কোন গ্রাম হইতে চৈত্রপূজার ঢাকের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই ষোলটি প্রাণীর কোনদিকে কিছুমাত্র দৃকপাত ছিল না—কেবল সম্মুখের দিকে অপূর্ব উন্মাদনায় ছুটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ঘণ্টাতিনেক এমনি করিয়া চলিয়াও সে রাস্তাটি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই তিন ঘণ্টায় তাহারা অন্ততঃ আট নয় মাইল পথ নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়াছে তবু কোথায় রহিল সে পথ। যিনি পথ প্রদর্শক এবার তিনি অনেকখানি ঘাবড়াইয়া গেলেন। গঙ্গা হইতে সোজা পূর্বদিকে আসিবার কথা কিন্তু এখন সকলে মিলিয়া মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আবিষ্কার করিল যে, সোজা পূর্বদিকে না যাইয়া তাহারা দক্ষিণ পূর্বদিক ধরিয়া চলিতেছে। সুতরাং সে পথটি তাহারা নিশ্চয় ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। পথ প্রদর্শকটি এবার নির্দ্দেশ দিলেন যে, এখন সোজা উত্তরে যাইয়া যে স্থানটিতে রাস্তাটি উত্তরদিক হইতে আসিয়া বাঁক্ ঘুরিয়া সোজা পূর্বে চলিয়া গিয়াছে সেইখানটিতে গিয়া পৌছিতে হইবে—তবে সে বাঁক এখান হইতে কত দূর তাহা পূর্ব হইতে তাহার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নহে। সুতরাং পুনরায়

উত্তরমুখী যাত্রা করিতে হইল এবং আরো ঘণ্টা দুই হাঁটিয়া অবশেষে রাস্তাটির সন্ধান মিলিল। কিন্তু রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে—শহরটিতে পৌঁছিতে আরো ঘণ্টাখানেক লাগিবে—তারপর কাজ সারিয়া পুনরায় নৌকায় আসিয়া পৌঁছিতে আর রাত্রিতো থাকিবেই না, বেলা অনেকখানি হয়তো হইয়া যাইবে; এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তাহাই একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ইহা লইয়া বেশীক্ষণ তাহারা সময় নষ্ট করিল না—ঠিক হইল যাহাই ঘটুক তাহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না।

প্রথম আক্রমণে জনদুই পাহারাওয়ালাকে আহত করিতে হইয়াছিল—অন্য বন্দুকধারী যে কয়জন পাহারায় ছিল—তাহারা প্রাণভয়ে গিয়াছিল পলাইয়া। আধঘণ্টার ভিতরে কার্য সমাধা করিয়া বহু পরিমাণ অর্থ লইয়া যখন তাহারা গঙ্গার ঘাটের অভিমুখে সেই রাস্তা ধরিয়া রওনা হইল তখন পর্যন্তও কোন বাধা আসে নাই। কিন্তু আরও খানিকটা আসিতেই বুঝিতে পারিল—সশস্ত্র পুলিসবাহিনী দল বাঁধিয়া শহর ও গ্রামের জনতা মিলিয়া তাহাদের পিছু লইয়াছে—চারিপাশ হইতে তাহাদেরই অস্পষ্ট কলরব তাহাদের কানে আসিতে লাগিল। রাত্রি তখন আর নাই—অন্ধকার মিলাইয়া চারিপাশ ক্রমে চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—ভোরের পাখী উঠিয়াছে কলধ্বনি করিয়া জাগিয়া। তখন তাহারা সেই পথের বাঁকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহার পরেই সেই মাঠ। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখে —দুইপাশ হইতে পুলিসবাহিনী ও গ্রামবাসী মিলিয়া বন্দুক ও লাঠি লইয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং এখানে তাহাদের থামিয়া পড়িতে হইল। পাঁচজন উত্তরে ও পাঁচজন দক্ষিণে মুখ করিয়া বন্দুক ধরিয়া দাঁড়াইল। পর পর কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করিবার পর জনতা ভয়ে পলাইয়া গেল। তারপর এই দীর্ঘ মাঠ; তাহারা প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। কোথাও কাঁটাগাছে লাগিয়া পা ছড়িয়া গেল চৈত্রের চষা মাটির ঢেলার উপরে কে কতবার পড়িয়া চোট খাইল এসব কেহ ফিরিয়াও

দেখিল না। সূর্য তখন পূর্বাকাশে দেখা দিয়াছে—সমস্ত প্রান্তর তাহারই আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। মাঠের চারিপাশ হইতে তাহাদেরই দিকে অতিদূরে দূরে বহুসংখ্যক লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল—তাহার ভিতরে, পুলিস আছে—সাধারণ কৃষক আছে, শহরের কুলিমজুর আছে, ভদ্রলোক আছে; কিন্তু তবুও এই ষোলটি প্রাণী কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া চলিল। নৌকায় আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল, তখন গঙ্গার ধারে ধারে অসংখ্য লোক বন্দুক, ফালা, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নৌকা যেমন চলিতে লাগিল—তীরের লোকজনও তেমনি তাহাদের সাথে দৌড়াইতে লাগিল। একস্থানে দেখা গেল যে, কতকগুলি বন্দুকধারী পুলিস নৌকায় উঠিবার উপক্রম করিতেছে। তাহারা সকলেই বুঝিতে পারিল এবার আর নৌকা করিয়া যাওয়া চলিবে না। নলিনাক্ষ আর অসিত এই দলের অধিনায়ক।

নলিনাক্ষ বলিলেন—নৌকা পশ্চিমপাড়ে নিয়ে চল এবার হেঁটে রওনা হতে হবে।

নৌকা তাদের গঙ্গার পশ্চিম তীরের দিকে আগাইয়া চলিল। এদিকে পুলিসবাহিনীর নৌকাও তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ পুনরায় দলের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভাই সব আজ সত্যিকারের সাহসের পরিচয় দিতে হবে—ধরা আমরা দেবো না—তার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেব, সেও ভাল।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া তাহারা নৌকা বাহিয়া আসিয়াছে—ভাল করিয়া আহার জুটে নাই—তারপর আজ সারাটা রাত্রি এমনি করিয়া ছুটাছুটি করিয়াছে—শরীর তাহাদের অবসাদে ভাঙিয়া আসিতেছে—তবু ষোলটি প্রাণী নলিনাক্ষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল—"ধরা আমরা দেব না,—যুদ্ধ করে মরবো।"

নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। এপারে অনেকদূর পর্যন্ত চর—প্রায় মাইলখানেক এই চর ভাঙিয়া গেলে তবে গ্রাম পাওয়া যাইবে। চরের উপরে চৈত্রের খর রৌদ্রে বালি যেন একেবারে

ফুটিয়া রহিয়াছে—তাহার ভিতরে পা বসিয়া যায়—জুতার ভিতরে বালি ঢুকিয়া পড়ে। বালির উপরে মাঝে মাঝে যেসব স্থানে কিছু কিছু পলি জমিয়াছে, সেই সেই স্থানে কিছুটা স্থানব্যাপিয়া বড় বড় নটা-ঝোপ সতেজে গজাইয়া উঠিয়াছে। দুই একস্থানে এই ঝোপ-গুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, সমস্ত চরটাই একটা নটাবন বলিয়া ভ্রম হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এ পারের গ্রামগুলি খুব দূরে দূরে হওয়ায় এবং চরের উপরে কোন ফসল না থাকায় নিকটে কোথাও লোক-জনের সাড়াশব্দ ছিল না। কিন্তু এক অভাবনীয় বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহাদের ভিতরের যতীন নামে ছেলেটি একেবারে জ্ঞান হারাইয়া বালির উপরে লুটাইয়া পড়িয়া গেল। যতীন দলের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট, বয়স তাহার পনর ষোলর বেশী হইবে না। এই কয়দিনের অত্যাচার—তারপর গত রাত্র হইতে এ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম তাহাকে একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। সমস্যা দাঁড়াইল—কি করা যাইবে যতীনকে লইয়া? সকলে দাঁড়াইয়া কর্তব্য স্থির করিতে লাগিল। অসিত ততক্ষণ যতীনের পাশে বসিয়া তাহার মাথাটা পরম স্নেহে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবিলে তো চলিবে না। পুলিস বাহিনী এতক্ষণে হয় তো এপারে আসিয়া পড়িল আর কি? নলিনাক্ষ আদেশ করিলেন—যতীনকে যখন আর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়—তখন তাহাকে এখানেই হত্যা করিয়া নটা-ঝোপের আড়ালে ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া হউক। এই নির্মম আদেশে সকলেই একেবারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। অসিত প্রতিবাদ করিয়া বলিল—সে হবে না—সে আমি কখনও হতে দেবো না।

নলিনাক্ষ বলিলেন—কিন্তু কি করবে শুনি?

বিপ্লবীদের নিজের প্রাণেরও মায়া করতে নাই—পরের প্রাণেরও না। অসিত পুনরায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল—কিন্তু ও যুক্তি আমি শুনবো না—আপনারা সবাই এগিয়ে যান—আমি যতীনকে নিয়ে এখানেই থাকবো। আপাততঃ এই নটাঝোপের

আড়ালে লুকিয়ে থাকি—তারপর যদি বাঁচি সন্ধ্যার সময় যা হয় করবো বলিয়া অসিত তাহার নিজের ও যতীনের কোমর হইতে পিস্তল দুইটি খুলিয়া নলিনাক্ষের হাতে তুলিয়া দিল। সময় আর ছিল না সুতরাং সকলেই এই সিদ্ধান্তে রাজী হইল। সেই বালির চরে অসিত ও যতীনকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বাহিনী পশ্চিম দিকে আগাইয়া চলিল। অসিত ধীরে ধীরে যতীনকে দুই হাত দিয়া কোলের ভিতরে টানিয়া তুলিয়া নিকটস্থ একটি নটা-ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করিল। উপর হইতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া আসায় এই স্থানটি অনেকখানি গর্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার উপরে বড় বড় নটাঝোপ গজাইয়া স্থানটি একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিল। অসিত এই গর্তের ভিতরে যতীনকে শোয়াইয়া নিজে তাহারই পাশে বসিয়া পড়িল। মিনিট পনর পরে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী তাহাদেরই সম্মুখের পথ দিয়া মার্চ করিয়া চলিয়া গেল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যতীনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল—সে চোখ মেলিয়া হা করিয়া জল চাহিল। কিন্তু এখনই বাহির হওয়া ঠিক হইবে না—গঙ্গারঘাটে হয় তো এপারে ওপারে কিছু লোকজন থাকিতে পারে ভাবিয়া অসিত যতীনের কানের কাছে মুখ লইয়া যথাসম্ভব গলা খাটো করিয়া বলিল—কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ভাই—নইলে তো জল দিতে পারবো না। চারপাশে যে এখনও লোক-জন আছে—আমরা পালিয়ে আছি। যতীনের মাথা হয়তো তখনও ঘুরিতেছিল! সে আর কোন কথা না কহিয়া পুনরায় চোখ বুঁজিল। বেলা যত বাড়িতে লাগিল—এই বালুকারাশি ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঘণ্টা দুই পর একবার অতি সন্তর্পণে নটাঝোপের আড়াল দিয়া নদীর ভিতর নামিয়া অসিত নিজে পেট ভরিয়া জলপান করিয়া এবং নিজের কাপড় ভিজাইয়া যতীনের জন্য জল লইয়া আসিয়া পুনরায় সেই গর্তের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সেই সঙ্কীর্ণ গর্তের ভিতরে দুইটি প্রাণী উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল—উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য বালুকারাশিকে তপ্তকটাহের বালুকার ন্যায় উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

মাঝে মাঝে সেই তপ্ত বালি আর বাতাসে মিশিয়া যেন এক একটি অনলস্রোত বহিয়া যাইতেছিল এমনি করিয়াই সারাদিন কাটিবার পর অবশেষে বেলা গড়াইয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিবার উপক্রম হইল। অসিত বলিল—এবার ওঠো যতীন।

যতীন অসহায়ের মত বলিল—কোথায় যাবো দাদা—তেষ্টায় যে বুক একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

—আগে নদীতে নেমে পেটভরে জল খেয়েনি—তারপর চল গ্রামের দিকে যাই—যা থাকে অদৃষ্টে হবে—এমনি করে তো এখানে বসে থাকলে চলবে না ?

তারপর নদীতে নামিয়া জলপান করিয়া হাত মুখ ধুইয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে তাহারা রওনা হইল। তাহাদের দল ও পুলিস বাহিনী সোজা পশ্চিম দিক ধরিয়া গিয়াছিল। তাহারা নদীর সোজা খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ধরিয়া চলিতে লাগিল, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া রাত্রের মত অতিথি হইতে হইবে—সারাটা দিন কিছুই আহার হয় নাই—শরীর ও মন দুই-ই একান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অসিত ও যতীন পাশাপাশি সেই বালুকা রাশির উপর দিয়া পথ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বালুকারাশির আর সে উত্তাপ নাই—ঠাণ্ডা হাওয়া তাহাদের গা জুড়াইয়া দিতেছিল। লোকের কাছে কি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে হইবে—কোথা হইতে আসিল—কোথায় যাইবে এইসব দুইজনে ঠিক করিয়া লইতে লইতে তাহারা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। মাইল দেড়েক পরে একখানা গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিল। সম্মুখেই একখানা বড় বাড়ি—তাহারা কি জাতি—হিন্দু কি মুসলমান—তাহা তো জানা দরকার। পথে একজন কৃষক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। অসিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল—এ গ্রামের নাম চরপাড়া—বাড়ির মালিকের নাম অম্বিকা মিত্র। বাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ডাকাডাকি করিতে যিনি বাহির হইয়া আসিলেন তিনিই অম্বিকা মিত্র। একটি হ্যারিকেন বাতি উঁচু

করিয়া অসিতের মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি চাই ?

অসিত জবাব করিল—আজ্ঞে আজ রাত্রে অতিথি থাকতে চাই।

—কোথা থেকে আসছেন ?

—কুষ্টিয়া থেকে।

—যাবেন কোথায় ?

—আজ্ঞে নবদ্বীপে যাব।

অম্বিকা মিত্র কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন—তারপর বলিলেন—আমার সঙ্গে আসুন।

তাঁহার সঙ্গে তাহারা যে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল সেটি একতালা দালান—বৈঠকখানা। ঘরের ভিতরের খাটের উপরে তাহাদের বসিতে বলিয়া সম্মুখে আলোটি রাখিয়া অম্বিকা মিত্র পুনরায় প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—আপনারা ?

অসিত বলিল—আজ্ঞে আমরা কায়স্থ।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—আপনার নাম ?

অসিত বলিল—আমার নাম যোগেশ বিশ্বাস। এটি আমার ছোট ভাই—নাম সতীশ বিশ্বাস।

—আপনাদের নিবাস ?

—কুষ্টিয়া মহকুমায়—কুষ্টিয়া থেকে দশ বার মাইল দূরে।

—নবদ্বীপ যাবেন কেন ?

—চাকুরীর চেষ্টায়।

—হেঁটে এলেন কেন ?

—হাতে পয়সা ছিল না।

—কিন্তু এদিক দিয়ে এলেন কেন ? এটা তো পথ নয় !

—পথ চিনিনে—ভুল করে ফেলেছি।

কিন্তু অসিতের কোন জবাবই তাঁহার মনঃপূত হইল বলিয়া যেন মনে হইল না।

পরে ঘরের বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—হারাণ—ও হারাণ—ব্যাটা মরেছে নাকি ?

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর হারাণ আসিয়া উপস্থিত হইল। হারাণ সম্ভবতঃ বাড়ির চাকর—মস্ত বড় লম্বা-চওড়া চেহারা! হারাণের কানের কাছে যেন অম্বিকা মিত্র কি ফিস ফিস করিয়া বলিলেন। হারাণ আসিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া পড়িল! অম্বিকা মিত্র অসিতদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আপনারা বসুন, আহারের বন্দোবস্ত করে আসি। অসিতের এই লোকটিকে ভাল লাগিতে-ছিল না—তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের ভিতর দিয়া যেন একটা দারুণ অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। হারাণকে ডাকিয়া দরজার সম্মুখে কি তাহাদের পাহারা দিবার জন্য বসাইয়া রাখা হইল ?

অসিত পুনরায় ভাবিল—হয়তো এ তাহার মনের ভ্রম।

অপরিচিত লোককে ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া কে রাত্রিতে স্থান দিতে চাহে ?

যতীনের কিন্তু এত ভাবনা চিন্তার অবসর ছিল না—এই কয়টা দিনের অবিশ্রান্ত অত্যাচারে সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইসব কথাবার্তার কোন্ ফাঁকে সে খাটের উপরে শুইয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত ভরসায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অসিত নিজেও জোর করিয়া মন হইতে সমস্ত সংশয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেদের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল অদৃষ্টের হাতে সঁপিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নিজেরও সমস্ত শরীর শ্রান্তিতে ও ক্ষুধায় ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল —ইচ্ছা হইতেছিল সেও যতীনের মত তাহারই পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে অম্বিকা মিত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া অসিতদের সঙ্গে করিয়া বাড়ির ভিতরে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া পুনরায় এই ঘরে লইয়া আসিল। এই ঘরটির পাশে আর একটি ছোট কুঠুরী ছিল —সেখানে বিছানা করিয়া তাহাদিগকে শুইতে দিল। অসিত, যতীন পাশাপাশি শুইয়া পড়িল। যতীন কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুনরায়

ঘুমাইয়া পড়িল। আহারের পর দারুণ আলস্যে অসিতের দুই চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু মন তাহার দারুণ উৎকণ্ঠায় বারে বারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই ঘরের একটি মাত্র দরজা—দরজাটি ভেজান ছিল। তাহার মনে হইল কে যেন বাহির হইতে দরজাটির শিকল তুলিয়া দিল। একি সত্য না তার মনের ভ্রম—বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া দরজার নিকটে আগাইয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে দরজা ধরিয়া টান দিল—কিন্তু একি! সত্যই ত দরজা বাহির হইতে কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুহূর্ত মধ্যে তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। দুই কানের ভিতর দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। ঘরটি হইতে বাহির হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই—চারিপাশে পাকা দেওয়াল সুতরাং খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মত উদ্ধারের সমস্ত চেস্টাই যে একেবারে নিষ্ফল তাহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কিন্তু এত দুঃখ কষ্টের পর শেষে এমনি করিয়া তাহাদিগকে ধরা দিতে হইবে? কিন্তু কি ইহাদের উদ্দেশ্য? কেন ইহারা তাহাদিগকে আটক করিতে চায়? সকালবেলা তাহাদের দলের কথা পুলিশ বাহিনীর অনুসরণের কথা হয়তো ইহারা জানিয়াছে। সেই সন্দেহই করে নাই তো? না—এমনি করিয়া ধরা দেওয়া চলিবে না—সে দরজা ধরিয়া প্রাণপণে নাড়া দিতে লাগিল—কিন্তু সেই দৃঢ় দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া অসাধ্য ব্যাপার। ঘরের আশেপাশে দুই চারিটি লোকজনের অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। অসিত বুঝিল এযাত্রা আর রক্ষা নাই; সে ধীরে ধীরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল—সমস্ত শরীর দিয়া তাহার ঘাম ছুটিতেছিল। পাশে যতীন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল—একবার ভাবিল তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া সমস্ত জানাইয়া দেয়—কিন্তু পুনরায় ভাবিল, আহা বেচারী সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এতক্ষণে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে যতটুকু পারে শান্তিতে ঘুমাক। এই হয়তো জীবনের শেষ শান্তি। এমনি করিয়া কয়েক ঘণ্টা অসিত চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিল। বাহিরের গণ্ডগোল ক্রমেই বাড়িতে

লাগিল। হঠাৎ এক সময় যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—অসিতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল—অমনি চুপ করে বসে আছেন যে দাদা? অসিত ধীরে ধীরে তাহাকে সমস্ত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া বলিল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া যতীন কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ যেন একেবারে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গেল দরজার দিকে। অসিতকে বলিল—এমনি চুপ করে ধরা দেওয়া হবে না দাদা। আসুন দরজা আমরা ভেঙ্গে ফেলি, বলিয়া দুই হাতে দরজার কপাট ধরিয়া যথাসাধ্য নাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু সে রুদ্ধ দরজা খুলিবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। অসিত তাহার নিকটে আসিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—ও কপাট খুলবে না যতীন—সে চেষ্টা আমি করে দেখেছি।

—কিন্তু কি হবে দাদা?

—কি আর হবে ভাই। নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করে তো বেরুইনি—যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

দুইজন পুনরায় বিছানায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল! কিছুক্ষণ পরে অসিত বলিল—ভয় করছে যতীন?

যতীন তাহার দিকে চোখ তুলিয়া বলিল—আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন দাদা!

অসিত বলিল—সন্দেহ নয় ভাই—কিন্তু তুমি অমনি করে মুষড়ে পড়লে কেন?

যতীন জবাব দিল—প্রাণের ভয় আমি করিনে দাদা—কিন্তু ভাবছি, যে ব্রত নিয়েছিলাম কিছুই তো তার করে যেতে পারলাম না।

অসিত মৃদু হাসিয়া বলিল—ফলাফলের চিন্তা যে আমাদের করা নিষেধ ভাই। "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—ফল দেবার মালিক যিনি তিনি যদি না দেন সে নালিশ তো জানাবার আর স্থান নাই ভাই।

যতীন খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইয়া বলিল—ঠিক বলেছেন দাদা—এতক্ষণ নিজের জীবনটাকে খুব বড় বলে ভেবেই তো লাভ ক্ষতির

হিসেব নিকেশ করতে যাচ্ছিলাম—সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেল। কতক্ষণ পরে বাহির হইতে অনেকগুলা বুটের মস মস্ শব্দ ভাসিয়া আসিয়া একেবারে তাহাদের ঘরের কাছে আসিয়া থামিল।

অসিত বলিল—বুঝেছ যতীন, পুলিস এলো!

যতীন বলিল—হাঁ বুটের শব্দ শুনা যাচ্ছে।

তারপর পুলিসের হাতে পড়িলে তাহারা কি বলিবে না বলিবে সে সম্বন্ধে নিজেরা পূর্ব হইতেই যুক্তি করিয়া রাখিল। রাত্রি আর নাই—বাইরে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতেছিল—ঘরের দরজা জানলার ফাঁক দিয়া তাহারই আভাস দেখা যাইতেছিল এমন সময় হঠাৎ সশব্দে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল একদল পুলিস সঙ্গে তাদের একজন ইউরোপীয় সাহেব উপর-ওয়ালা। সাহেবটির হাতে একটি পিস্তল। ঘরে ঢুকিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে কয়েকজন পুলিস অসিত ও যতীনকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। অসিত বা যতীন কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না—একটুও বল প্রকাশ করিল না। ভাল করিয়া বাঁধিয়া যতীনকে কয়েকজন মিলিয়া ধরিয়া পাশের অন্য একটি কক্ষে লইয়া গেল। কয়েকজন পাহারা অসিতের নিকটে বসাইয়া রাখিয়া সাহেবটিও পাশের কক্ষে চলিয়া গেল। সেখান হইতে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার কথাবার্তার শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। অসিত বুঝিতে পারিল —পুলিসের নানা প্রশ্নবাণ্ যতীনের উপর বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতেই শুধু যতীন রেহাই পাইল না। একটু পরেই কিল, চড়, ঘুষি, বেটনের আঘাত যে নির্বিচারে তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে অসিত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া অসিত যেন একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। পাশের ঘরে প্রহারের শব্দ কিন্তু একটুও না কমিয়া বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এমনি চলিবার পর হঠাৎ এক সময়ে প্রহারের শব্দ একেবারে থামিয়া গেল।

কয়েকজন বলিয়া উঠিল—জল, জল আনুন শিগগীর অম্বিকাবাবু।

অম্বিকাবাবুই হয়তো ঘর হইতে জল আনিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইলেন—অসিত সে শব্দও শুনিতে পাইল।

যতীন কি অজ্ঞান হইয়া পড়িল?—তাহাই হয়তো হইবে। বেচারী এই কয়দিনের অত্যাচারে একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর এই অমানুষিক প্রহার সহ্য করিতে পারিবে কেন? রাগে ও দুঃখে অসিতের দুই চোখ জ্বালা করিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে আর পাশের ঘর হইতে প্রহারের শব্দ ভাসিয়া আসিল না। অসিত মনে করিল হয়তো যতীন এতক্ষণে পুনরায় খানিকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বেলা তখন অনেকখানি হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একজন দেশী পুলিস কর্মচারীর সহিত অম্বিকা মিত্র আসিয়া অসিতের ঘরে ঢুকিল। অম্বিকা মিত্রের এক হাতে একখানা খাবারের থালা—অন্য হাতে জলের গ্লাশ। অম্বিকা মিত্র পুলিস কর্মচারীর নির্দেশমত অসিতের সম্মুখে খাবারের থালা ও জলের গ্লাশটি নামাইয়া রাখিল। থালায় নানাপ্রকার মিষ্টান্ন সাজান রহিয়াছে। পাশের সিপাইটি অসিতের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল। পুলিস কর্মচারীটি অসিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ কিছু খেয়ে নিন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। অম্বিকা মিত্রের হাতে খাবারের থালা দেখিয়া তাহার সমস্ত মন একেবারে রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। এই বিশ্বাসঘাতকের একরাত্রির অন্নঋণ তাহারা তো ভাল করিয়াই শোধ করিয়াছে। আবার তাহার খাবার মুখে তুলিবে?

অসিত লাথি মারিয়া খাবারের থালা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল—সমস্ত খাবার ঘরময় ছড়াইয়া একাকার হইয়া গেল। অসিত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল—ওর খাবারে বিষ—ওর জলে বিষ—ও ছুঁলেও পাপ হয়। পুলিশ অফিসারটি গোয়েন্দা বিভাগের পাকা লোক। তিনি ইঙ্গিতে অম্বিকা মিত্রকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। অম্বিকা মিত্র বাহিরে গেলে—ধীরে ধীরে অসিতের নিকটে আসিয়া বসিয়া কণ্ঠে রাজ্যের মমতা টানিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখুন আপনার মনের অবস্থা বুঝি। কিন্তু কিছু না খেলে তো চলবে না!

আচ্ছা অম্বিকাবাবুর খাবার না খেতে চান আমরাই খাবার এনে দেবার যোগাড় কচ্ছি। কি আপনার নাম জানি না। তবে আপনারাও তো ভদ্র সন্তান। নিজেরা যে কেন এইসব কাজ করেন তাতো বুঝি—নিজেদের স্বার্থের জন্য তো আর নয়—দেশের জন্যে—দেশের মঙ্গলের জন্যে। আমরা মশাই সরকারের চাকর—কি করি বলুন—মন কি আর এসব করতে চায়—তবু তো পেটের দায়ে না করে পারিনে—নইলে আমরাও কি মনে মনে কম স্বদেশী মশাই! পরে নিজের উপরস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীটিকে ইঙ্গিতে বলিলেন—ওরা মশাই ইংরেজ—ওরা আমাদের সুখ দুঃখের কথা কি বুঝবে—তবে আপনি যদি আমার কথা শোনেন কিছু উপকার আমি আপনার করতে পারি। অসিত কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাহার দিকে শুধু তাকাইয়া রহিল। পুলিশ কর্মচারী সেপাই দুইটিকে ইঙ্গিতে ঘরের বাহিরে যাইতে বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—আপনার সঙ্গীটি সব স্বীকার করেছেন মশাই। ছেলে-মানুষ যা করেছে—ভালই করেছে। আমি বলছি আপনিও একটা স্বীকারপত্র লিয়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল তাদের নামগুলো বলে দিন। আপনি রাজসাক্ষী হবেন—বেকসুর খালাস পাবেন। ইয়ংম্যান্—সামনে কত ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে—নিজে আবার মুক্ত মানুষ হয়ে সংসারে মন দিন।

অসিত নিতান্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—তার মানে—কাদের নাম—আর কিসের সাক্ষী?

পুলিশ কর্মচারীটি মুখের একটি বিশেষ ভঙ্গি করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া বলিল—ওসব প্রকাশ হয়ে গেছে মশাই।

কাল রাত্রের ডাকাতির কথা আপনার সঙ্গীটি সব প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি যখন সমস্ত স্বীকার করে বেঁচে যাচ্ছেন—আপনিই বা কেন সারাজীবন জেলে পচে মরবেন, বলুন তো? আর তিনি যখন সব বলে দিয়েছেনই তখন আপনি না বললে তো আমাদের কোন অসুবিধা হবে না—তবে আপনার ভালর জন্যেই

বলছিলাম কি না? সরকারী কাজ করলেও যতটুকু দেশের লোকের উপকার করতে পারি—সেটা তো করা উচিত—তবু তো মনে ভাবতে পারবো—না একটা লোককে যথার্থই উপকার করেছি। অসিত কিন্তু আর একটা কথাও কহিল না। সে বুঝিতে পারিল ইহাও গোয়েন্দা পুলিশের বহুপ্রকারের কৌশলের একটা কৌশলমাত্র।

কিন্তু আশ্চর্য এপর্যন্ত অসিতকে প্রহার করা তো দূরের কথা—একটা কড়া কথা পর্যন্ত কেহ বলিল না। অবশেষে বেলা গোটা দশেকের সময় অসিত ও যতীনকে হাতকড়া দিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া একখানা গরুর গাড়িতে চাপাইয়া লইয়া পুলিশ বাহিনী শহরের দিকে যাত্রা করিল। প্রহারের ফলে যতীনের হাঁটিয়া যাইবার আর কোন উপায়ই ছিল না। বিকাল বেলা তাহাদের কৃষ্ণনগর জেলে লইয়া যাওয়া হইল এবং ইহারই পরের দিন আরো বারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিল। নলিনাক্ষ এবং আরও দুইজন নানা কৌশলে পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। এদিকে গোয়েন্দা পুলিশ দিনের পর দিন জেল হইতে তাহাদের হেফাজতে লইয়া গিয়া নানা অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াও যখন কাহারও মুখ হইতে অন্য কাহারও নাম সংগ্রহ করিতে পারিল না তখন অগত্যা এই চৌদ্দজনের নামেই মামলা আরম্ভ করিয়া দিল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভাল ব্যারিস্টার দিয়া মামলা চালাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কোনই ফল হইল না। এ মামলাও "স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে" বিচার হইল। মাস দুই পরে রায় বাহির হইল। অসিত, যতীন ও আরো কয়েকজনের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং বাকী সকলের পনর বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ড। অসিতেরা কিছুদিন ধরিয়া এমন

কিছু হইবে বলিয়া পূর্ব হইতেই নিজেদের মনকে প্রস্তুত করিতেছিল। তাই আজ তাহাদিগকে রায় পড়িয়া শুনান হইলে তাহারা সহজভাবেই তাহা গ্রহণ করিল। বারজন নীরবে দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া একান্ত নির্বিকারভাবে আবার জেলে আসিয়া যে যাহার সেলে ঢুকিয়াছে। বেলা গড়াইয়া শেষ হইয়াছে। অসিত চুপ করিয়া নিজের সেলে বসিয়াছিল। তাহার থালা বাটিতে জল ও খাবার দিয়া গেল—জমাদার আসিয়া সেলের দরজা বন্ধ করিল। অসিত একবারও তাহার আসন হইতে উঠিল না। সে যেন একেবারে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো আপনার ভিতরে আপনি সমাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল এদেশ আর তাহার নয়—এ জগতও নয়। এই আকাশ—এই বাতাস—এই সমস্তই তাহাকে ছাড়িয়া কোন নিরুদ্দেশের দেশে গিয়া সারাজীবন কাটাইতে হইবে! আত্মীয় স্বজনের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না—অথচ সে থাকিবে বাঁচিয়া—অথচ সে থাকিবে এই পৃথিবীতেই। এ তো মৃত্যু—এজীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে তফাৎ কোথায়? সেই আন্দামান—সেই কালাপানির দেশ—সেখানকার কত ভীষণ অত্যাচারের কথা সে শুনিয়াছে—সেখানে যাহারা যায়, তাহারা তো আর ফিরিয়া আসে না। ইহার চেয়ে মৃত্যুও তো তাহার ভাল ছিল। ফাঁসী গেলে তো তবু নিজের দেশের আলোতে—নিজের দেশের বাতাসে—নিজের দেশের মাটিতে মিশিয়া যাইতে পারিত। তিলে তিলে সারাজীবন ধরিয়া কোন অজানা দেশে পচিয়া মরিতে হইত না। দুইদিন পরে তাহাদের কলিকাতায় আনিবার জন্য স্টেশনে লইয়া আসা হইল। রিজার্ভ গাড়িতে তাহাদিগকে তোলা হইলে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চারদিন পরে—সেদিন বৈকাল বেলা অসিতদের একখানা ছোট ধুতি কোর্তা পরাইয়া হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি লাগাইয়া আলিপুর জেলের বাহিরে লইয়া আসিল। অফিস হইতে তাহাদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হইল—তাহারা আন্দামান যাইতেছে!

জেল গেটের বাহিরে কয়েদী-গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের বারজনকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সেই ছোট্ট গাড়িটির মধ্যে পাশাপাশি বসিয়া বারটি প্রাণী কোন্ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছে। কেহ কাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, কেহ একটা কথাও কহিতেছে না। শুধু নীরবে সমস্ত অন্তর নিয়া নিরীহ পশুর মতো নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে একেবারে বিসর্জন দিয়া অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সমর্পণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতার রাজপথ দিয়া গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাদের মনে হইতেছে—গাড়ির চাকা যেন তাহাদের বুকের উপর দিয়া সমস্ত পাঁজরাগুলাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া যাইতেছে। পথে পথে অজস্র লোকের ভিড়—কেরানীরা অফিস হইতে ফিরিতেছে। দলে দলে ছাত্রেরা স্কুল কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া জটলা করিতে করিতে পথ চলিতেছে, রাস্তার দুইপাশে অসংখ্য বিপণিতে ভিড়ের অন্ত নাই। কোথায় যেন যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল—তাহারই খানিকটা রেশ কোন রকমে গাড়ির মধ্যে একমুহূর্তের জন্য ভাসিয়া আসিল। গড়ের মাঠের দিকে অসংখ্য লোক হয়তো খেলা দেখিতে ছুটিয়া যাইতেছে। দেশের কোথাও তো সুখ দুঃখের, মানুষের দৈনন্দিন আহার বিহারের একটুকুও পরিবর্তন হয় নাই—শুধু তাহারা বারটি প্রাণী এমনি করিয়া লৌহ-শৃঙ্খল পরিয়া লোহার খাঁচায় বন্দী হইয়া কোন্ অজানা দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে।—"কেন এমন হয়।"—কেন এমন হইল? এই প্রশ্ন সহসা অসিতের পরাধীন বাঙালী মনের ভিতর হইতে মোচড় দিয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়া পাইতেও বেশিক্ষণ লাগিল না। সে ভাবিল মুক্তির ডাক যাহার নিকট আসিয়াছে—এই দেশে এ অবস্থা তো তাহার অবশ্যম্ভাবী। এখানে মুক্তির ডাকে আর মৃত্যুর ডাকে কোন তফাৎ নাই। যাহারা এ ডাক শুনে নাই—শান্তি তাহাদেরই জন্য—সংসারের সুখ দুঃখের হিসাব-নিকাশ তাহাদেরই। এমনিই তো হয়—এমনিই হইয়াছে।

মুক্তির মূল্য দিতে গিয়া ইতিপূর্বেও তো কতজন প্রাণ দিয়াছে—কতজন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। তাহারাও চলিয়াছে আরও কতজন যাইবে—এমনি করিয়াই হয়তো একদিন যাত্রার শেষ হইবে—চির আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইবে। অসিত কি সেদিন বাঁচিয়া থাকিবে? নাই বা থাকিল বাঁচিয়া। বাঁচিয়া থাকিবে তার দেশ—বাঁচিয়া থাকিবে তার জাতি। গাড়ির লৌহজালের ভিতর দিয়া কলিকাতার রাজপথের দিকে তাকাইয়া এই কথাই তাহার মনে হইতেছিল, সহসা অসিত গাহিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।" সঙ্গে সঙ্গে বাকী এগারজন তাহারই সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া চোখ বুজিয়া অপূর্ব আবেগে গাহিয়া চলিল। ঝড়ো হাওয়া যেমনি করিয়া ছিন্নমেঘের টুকরাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, তেমনি করিয়া তাহাদের মনের সমস্ত মেঘ কোথায় এক নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ রূপ—সারা অন্তর ভরিয়া নামিয়া আসিল গভীর প্রশান্তি। আউটরাম ঘাটে আসিয়া গাড়ি থামিল। তাহাদিগকে গাড়ি হইতে নামাইয়া সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল। সম্মুখেই গঙ্গায় একখানা জাহাজ লাগিয়াছিল—জাহাজটার নাম "রাজা"। এই জাহাজই আন্দামানে তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। বারজন হাতে পায়ে শিকল পরিয়া সারবন্দী হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওপাড়ে পশ্চিম আকাশের কোণে পাতলা মেঘের আড়ালে সূর্য ঢলিয়া পড়িয়াছে।—মেঘের মাথার মাথায় কে যেন সোনার রং ঢালিয়া দিয়াছে। পিছনে কলিকাতানগরী—সম্মুখে গঙ্গা তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। ইহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া বারজন বন্দী শেষবারের মতো নিজেদের দেশের এই অপূর্ব সৌন্দর্য দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছিল। জাহাজে উঠিবার পূর্বে বারজনই তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত কপালে ঠেকাইয়া জন্মভূমিকে শেষ নমস্কার জানাইয়া গেল। অসিত সহসা নীচু হইয়া নিজের পায়ের তলা

হইতে দুই মুঠি ভরিয়া পথের ধুলা তুলিয়া বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল—তাহার দেশের মাটির শেষ স্পর্শ! জাহাজের ডেক হইতে তাহাদিগকে সিঁড়ি দিয়া খোলের ভিতরে নামাইয়া লওয়া হইল। মাঝে মাঝে বিজলী বাতি জ্বালাইয়া স্থানটির অন্ধকার দূর করা হইয়াছে। এই বিস্তৃত স্থানটির একপাশে মোটামোটা লোহার শিক দিয়া খানিকটা জায়গা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। অসিতদের সেইখানে ঢুকাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এটি নাকি রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। বাকী স্থান সাধারণ কয়েদীদের জন্য। ইতিপূর্বেই বহুসংখ্যক সাধারণ কয়েদী আনিয়া সেস্থান পূর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে। খানিক পরে পুনরায় তাহাদের সেই লোহার খাঁচা খুলিয়া কিছু চিড়া চিনি, তেঁতুল লেবুর রস ও জল রাখিয়া যাওয়া হইল—চারিদিনের ইহাই তাহাদের খাদ্যবস্তু। বাহিরে হয়তো তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—কিন্তু জাহাজের খোলের ভিতরে কোন সন্ধানই তাহার পাওয়া যাইতেছিল না। প্রত্যেকের জন্য একখানা করিয়া কম্বল দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা জাহাজের মেঝের উপরে সেই কম্বল বিছাইয়া লইয়া দেহ এলাইয়া দিল। উত্তেজনা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল—এখন দেহ-মনের শ্রান্তিতে দুই চোখ তাহাদের বুঁজিয়া আসিল কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র তাহাতে ছিল না—বারটি মন দেহের সীমানা ছাড়াইয়া নিজেদের দেশের আলোতে বাতাসে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও মুখ দিয়া আর একটা কথাও বাহির হইল না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আজ সকালের দিকে অমিয় কল্যাণী ও অজয়কে লইয়া জেল গেটে গিয়া অসিতের সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছেন। আজই যে তাহাদিগকে আন্দামানে পাঠান হইবে এ খবরও তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই আজ বিকালে সন্ধান করিয়া তিনি

জাহাজ-ঘাটের একপাশে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমনি অপেক্ষা করিবার পর অসিতদের গাড়ি আসিয়া ঘাটে পৌঁছিল—তাহাদিগকে গাড়ি হইতে নামান হইল—সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল—তারপর জাহাজে তোলা হইল—সমস্ত তিনি অলক্ষ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন। অসিতদের যখন আর দেখা গেল না তখন সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। এই সন্ধ্যাবেলা সারা বাড়িখানি একেবারে শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছিল—ইহার কোথাও যেন আজ একটা লোকজনও নাই—একেবারে গভীর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কল্যাণী নিজের ঘরখানিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সারাটা বাড়ির আবহাওয়া একেবারে থমথমে হইয়া উঠিয়াছে। অজয় মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়াছিল—সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে না পারিলেও গুরুতর কিছু একটা যে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সেও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই একটা কথাও বলিতে সাহস হইতেছিল না—কিন্তু এই নীরবতা সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না—তাহার যেন নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসিতেছিল। সেই সকালবেলায় সে তাহার বাবাকে দেখিয়া আসিয়াছে—বাবা তাহার কেন সেইখানে রহিয়াছেন? কেন বাড়ি চলিয়া আসেন না? বাবা বাড়ি না থাকিলে যে তাহার ভাল লাগে না—বাবার কাছে না শুইলে যে তাহার ঘুম হইতে চাহে না। বাবা কি ইহা বুঝেন না—তাহার কথাটি কি একবারও মনে হয় না? বাবার কি চেহারা হইয়াছে—তাঁহার পরনে ছোটছেলের মতো হাফ্‌প্যান্ট গায়ে কি এক অদ্ভুত ধরনের জামা—এই পোশাকে ভারি বিশ্রী দেখাইতেছিল তাঁহাকে। বাবা জানালার লোহার শিকের ওপাশে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাহাদের নিকট আসেন নাই—তাহাকে কোলে করেন নাই। তাহাদের দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ পরে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন—জ্যাঠামণি কাঁদিতেছিলেন, মা কাঁদিতেছিলেন—দিদিমা কাঁদিতে-

ছিলেন—সকলের দেখাদেখি সেও কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর আজ সারাদিন জ্যাঠামণি তাহাকে একবারও ডাকেন নাই—কোলে করেন নাই, ভাত খান নাই—এখন এই সন্ধ্যাবেলাও তাহাকে ডাকিলেন না, একটুও আদর করিলেন না—নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। মা সারাটা দিন একটা কথাও কহে নাই—তাহাকে আদর করে নাই—শুধু বিকালবেলা তাহাকে নিজের কোলের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সারাটা দিন মাও তো স্নান করে নাই—আহার করে নাই। কেন ইহারা এমন করিতেছে? কেন বাবা বাড়ি আসিতেছে না? বাবার কি হইয়াছে—কে তাহার জবাব দিবে? কাহারও কাছে যে জিজ্ঞাসা করিবে সে সাহসও আজ তাহার হইতেছে না। সহসা সে মুখ তুলিয়া মায়ের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওমা—মাগো—কেন অমন কচ্ছ মা? কি হয়েছে বল না? কিন্তু কল্যাণী কোন জবাবই দিতে পারিল না। অজয় পুনরায় বলিল—বাবা কবে আসবে মা—কি হয়েছে তাঁর—আমায় বল না মা। বাবার জন্য আমার মন কেমন করে মা।

কল্যাণী কি যেন জবাব দিতে গেল—কিন্তু সহসা ক্রন্দনের রোলে তাহার কণ্ঠস্বর একেবারে ডুবিয়া গেল—কোন কথাই আর বাহির হইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া লইয়া অজয়কে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—মন তো কেমন করলে চলবে না বাবা। সে তো শিগগির আসবে না—তুই বড় হবি—লেখাপড়া শিখবি—তারপর সে ফিরে আসবে।

—সে যে অনেকদিন মা?

—হাঁ অনেকদিনই তো বাবা।

—অতদিন আমি বাবাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো মা?

—থাকতে হবে যে অঞ্জু।

—কিন্তু কোথায় যাবে বাবা?

—সে অনেকদূর, তুই সে দেশ চিনিস নে অঞ্জু।

—বাবা কেন যাবে সেখানে ?

—দেশের কাজে অঞ্জু—সেদিন যে বলেছিলাম তোকে, কত বড় কাজের ভার নিয়েছেন তিনি।

—বড় কাজই যদি—তুমি তবে কাঁদছো কেন মা—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

কল্যাণী আর কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু অঞ্জুকে তেমনি করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আরো খানিকক্ষণ কাটিবার পর কল্যাণী বলিল—ওঠ তো অঞ্জু—তোর জ্যাঠামণি যে সারাদিন খাননি—চল তাঁকে ডেকে আনবি।

কল্যাণী অজয়ের হাত ধরিয়া অমিয়র ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অজয় তাহার জ্যাঠামণির কোলের কাছে গিয়া ডাকিল—জ্যাঠামণি।

অমিয় সহসা উঠিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া অজয়কে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল—কি জ্যাঠামণি ?

—মা খেতে ডাকছে—খেতে চলো।

দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—কে বউমা —তুমি এসেছো! চল বউমা খাব বইকি—আমাকে যে বাঁচতে হবে—নইলে আমার অঞ্জুকে দেখবে কে—সব ভার যে আমারই উপর সে ফেলে রেখে গেছে। বলিতে বলিতে তিনি হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। কল্যাণী নিজের ঘরের জানালার শিকের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বাহিরে কলিকাতা নগরী তখন গভীর সুপ্তিতে মগ্ন। কল্যাণীর সারা অন্তর জুড়িয়া আজ যে হাহাকার—তাহার দেহের সমস্ত প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইতে চাহিতেছিল তাহার তুলনা নাই। তাহার সমস্ত অনুভূতি যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—চিন্তায় চিন্তায় মন তাহার একেবারে বিকল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর—কোন্ অজানা দেশে—কোন্ ভয়ঙ্কর স্থানে কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে ? কত অত্যাচার হইবে তাহার উপর—জেলের কয়েদী

সে—নির্মমভাবে তাহাকে দিয়া কত না কাজ করাইয়া লইবে—ঘানি ঘুরাইবে—যাঁতা পিঁষাইবে—আরো কত কি ? এমনি করিয়া কি সে বাঁচিবে ? আর কি কখনও ফিরিয়া আসিবে ? তাহার অন্তরের ভিতর হইতে যেন বারে বারে কে হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিতে লাগিল—না আর সে ফিরিয়া আসিবে না—এই শেষ—এই শেষ। এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেইখানে বসিয়াই কল্যাণী কখন ঘুমাইয়া পড়িল—ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল—অসিতকে যেন কোন্ এক দেশে লইয়া গিয়াছে—সেখানে চারিদিকে কেবল বন—দলে দলে বাঘ ভল্লুক বিকট চেহারার সব লোক, তাহারা অসিতকে মারিতেছে—অসিতকে দিয়া কাঠ কাটাইতেছে, অসিত যেন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতেছে। হঠাৎ কল্যাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া সহসা মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অজয়ের ঘুম গেল ভাঙ্গিয়া—সে তাহার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—ওমা—মাগো—তুমি ঘুমোওনি কেন ? ওঠো ওমা—লক্ষ্মী মা ঃ তুমি কাঁদলে আমার যে কান্না পায় মা ! কল্যাণী চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল—খানিকটা সামলাইয়া লইয়া কি ভাবিয়া যেন অজয়কে বলিল—অঞ্জু বাবা !

—কেন মা ?

—তুই ঠাকুর দেবতাকে ডাকতে পারিস বাবা ! খুব মন দিয়ে খুব ভাল করে ডাকতে পারবি বাবা ?

অজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁ, মা, আমি রোজ মনে মনে বলি—হরিঠাকুর, আমার বাবাকে ভাল রেখো—আমাদের সবাইকে ভাল রেখো।

—কে তোকে ডাকতে শিখিয়ে দিল অঞ্জু ?

—দিদিমা শিখিয়ে দিয়েছেন মা !

—আজ থেকে রোজ খুব মন দিয়ে তাঁকে ডাকবি—বলবি তাঁকে

যেন হরিঠাকুর ভাল রাখেন—আবার তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়ে আনেন।

অজয় বলিল—এখন ডাকবো মা ?

—আয় বাবা তুইজন একসঙ্গে বসে ডাকি। তারপর অজয় তাহার মায়ের দেখাদেখি চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া মনে মনে তাহার হরিঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল।

ষড়বিংশ অধ্যায়

পরদিন অনেকখানি বেলা হইবার পর সিটি দিয়া জাহাজ ছাড়িল। জাহাজের গায়ে গোলাকার কতকগুলি কুড়ি-পঁচিশ ইঞ্চি পরিধির ছিদ্র ছিল—ছিদ্রগুলির মুখে এক একখানি করিয়া কাচের ঢাক্‌নি—সেগুলির ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্য চোখে পড়ে। এগুলিকে "লুফোল" বলে। জাহাজ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই অসিত তাহার একটি "লুফোল" এর ভিতরে মুখ দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ এমনি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার খেয়াল নাই—যখন তাহার চমক ভাঙিল, তখন কলিকাতা শহর তাহার চোখের অন্তরাল হইয়া গিয়াছে। এখানটা বোধ হয় বজবজ—তারপর গঙ্গার ধারের বৃক্ষশ্রেণীর শ্যামল নীলিমায় তাহার তুই চোখ ভরিয়া উঠিল। তীরের প্রত্যেকটি তরুলতা যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল—দূরের ঘাটে ঘাটে অসংখ্য নরনারী স্নান করিতেছে—ছেলেরা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে। তীরের কাছ ঘেঁসিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বক, গাংচিল, শালিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোথাও ভাঙ্গন ধরিয়াছে—উঁচুপাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জলের ভিতরে ছিটকাইয়া পড়িয়া আবর্তের স্থষ্টি করিতেছে। সাদা ফেনার পুঞ্জ স্থষ্টি হইয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও তুই চারিখানি বাড়িঘর চোখে পড়িতেছে—সেখানে গৃহস্থের নিত্যকার গৃহকর্ম চলিতেছে। ঐদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে

অসিতের মন এক অভূতপূর্ব উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল। এই তাহার দেশ—ইহার প্রতিটি নরনারী তাহার কত না আত্মীয়—প্রতিটি পশুপক্ষীর সহিত তাহার পরিচয়—প্রতিটি বৃক্ষলতা পর্যন্ত তাহার অন্তরের বস্তু—ইহার ধূলিকণা তাহার কাছে স্বর্ণরেণু। তীরে একটি স্থানে বোধহয় কয়েকটি শিশু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছিল—ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না—তবু অসিত যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল অঞ্জুর কথা—সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল কল্যাণীর কথা। তাহাদের আর হয়তো সে এজীবনে দেখিবে না! এই সবে অঞ্জুর বয়স আট বৎসর চলিতেছে। অসুখে বিসুখে কে দেখিবে তাহাকে? লেখাপড়ায়, চরিত্রগঠনে কে তাহাকে করিবে পরিচালিত? এই সমস্ত দায়িত্বের সব চাইতে বড় অংশ যাহাকে বহন করিবার কথা, এমন করিয়া সে আজ চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে নির্বাসনে। সহসা সে সেখানে দাঁড়াইয়াই, দুই চোখ বুজিয়া মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভগবান, অঞ্জুকে আমার ভাল রাখিও, তাহাকে শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিও। কিন্তু সহসা তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—এই যে দেশ,—যেখানে সহস্র নাগপাশের বন্ধন মানুষকে প্রতিনিয়ত অমানুষ করিয়া তোলে—সেখানে সত্যিকারের মানুষ হইবার তো দুঃখের অন্ত নাই। যেখানে চারিপাশে অন্যায় অত্যাচার দুঃখ দুর্দশা, সেখানে সত্যিকারের মানুষ তো প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। সে পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিল—হে ভগবান তাই হোক—অঞ্জু আমার তেমনি মানুষই হোক—অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেও মাথা তুলে দাঁড়াক্—আমি এতটুকু দুঃখও পাব না। যে সাধনায় নিজের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল—নবীনের দল আত্মাহুতি দিয়া সে সাধনায় একদিন সিদ্ধিলাভ করুক!

সহসা তাহার মনে হইল—সে এই দলের নায়ক, কে কি ভাবে আছে তাহাতো তাহাকে দেখিতে হইবে। "লুকোল" হইতে মুখ

ফিরাইয়া ভিতরের দিকে তাকাইয়া দেখিল—দলের সকলেই একপ্রকার বেশ সামলাইয়া লইয়াছে। মাঝখানে কম্বল পাতিয়া জন আটেক গোল হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। যদুনাথ কিছু কিছু জ্যোতিষ জানিত—হাত দেখিতে পারিত—তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সকলে ঘিরিয়া বসিয়া যে যাহার হাত বাড়াইয়া ধরিয়াছে। যদুনাথ পরম গম্ভীর হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দুই চারিটি রসিকতা করিয়া সকলকে হাসাইয়া তুলিতেছে। মহেশের বুদ্ধি একটু মোটা—সকলে যখন তখন তাহার সহিত ঠাট্টা তামাসা করিত। যদুনাথ তাহার হাত দেখিয়া বলিল—তুই বেটা আর দেশে ফিরে আসবিনে, আন্দামানে একটা বার্মিজ মেয়ে বিয়ে করে কয়েদীর বংশ বৃদ্ধি করতে থাকবি। তাহার মন্তব্যে একটা হাসির হল্লা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ মহেশের হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া হ্যাণ্ডসেক্ করিয়া বলিল—তোর সৌভাগ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি মহেশ—এক কথায় যাকে বলে গোভাগ্যি—এমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে বলতো ?

অন্যজন বলিল—তাহ'লে তুই শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস—কে বলে দ্বীপান্তর ?

আর একজন বলিল—আমরা তাহলে বরযাত্রী ?

মহেশ বলিল—ইস, তাই কখনও হয় ? তোর সব গাঁজাখুরী।

উমেশ বলিল—কেন হবে না শুনি ? সেখানে বার্মিজ মেয়েছেলের যে ছড়াছড়ি জানিসনে, ব্রহ্মদেশের কাছে যে !

যদুনাথ ততক্ষণ ভবেশের হাত লইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবার পর বলিল—তোর ভাই পাঁচ ছয় বৎসর পর দেশে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে—খুব সম্ভব মুক্তি পেতে পারিস—নাও পারিস।

প্রমথ বলিল—আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'বিয়ে তল তল বান' তোর দেখছি তেমনি হলো।

যদুনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম ?

প্রমথ হাসিয়া জবাব দিল—আচার্যিমশাই বোশেখ মাসে চাষাদের কাছে বর্ষফল বলে বেড়ান—বান কেমন হবে—ফসল কেমন হবে—জলে মাছ থাকবে কি পরিমাণ—এই সব।

চাষারা জিজ্ঞেস করলো—বান এবার কেমন হবে আচার্যিমশাই ?

আচার্যি মশাই অনেক ভেবে চিন্তে বললেন—এবার 'বিন্নে তল তল বান'।

চাষারা বুঝলো যে, এবার এমন বান হবে যে বিন্নে অর্থাৎ বেনার ঝোপ তলিয়ে যাবে। সুতরাং ফসলও ভাল হবে।

আচার্যিমশাই সিধে পেলেন বড় করে। কিন্তু বর্ষা এলে দেখা গেল সেবার বর্ষা মোটেই হলো না। চাষারা রাগ করে এসে আচার্যি মশাইকে ধরলো—তবে যে বলেছিলেন, 'বিন্নে তল তল ? বর্ষার জল গেল কোথায় ? আমাদের সঙ্গে ফাঁকি নাকি ?

আচার্যিমশাই হেসে বল্লেন—সাধে কি তোদের চাষা বলে সব ? কথার মানে বুঝিসনে—রাগ করবি শুধু। বলেছিলাম যে 'বিন্নে তল তল বান' অর্থাৎ বিন্নে ঝোপের নীচে মাত্র জল আসবে অর্থাৎ বর্ষা এবার মোটেই হবে না।

চাষারা ভাবলো—তাই তো আচার্যিমশাইতো ঠিকই বলেছেন—তারাই বুঝতে পারেনি। তোরও হয়েছে তেমনি। সকলে আর এক চোট হাসিয়া উঠিল। রামপ্রসাদ মিশির পালোয়ান ব্যক্তি, সময় ও সুযোগ পাইলে সে যেখানে সেখানে দুই-চারিটি ডন্ বৈঠক দিতে ছাড়ে না—বিরাট তাহার শরীর—বিরাট তাহার আহার। জেলখানায় সব চাইতে সেই বেশী অসুবিধায় পড়িয়াছে। তাহার দিকে অসিতের নজর পড়িতে দেখিল—সে একপাশে নিজের ছোট কাপড়খানার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া একটা ল্যাঙ্‌ট তৈরী করিবার পরিকল্পনা করিতেছে। অসিতের দিকে নজর পড়িতেই হাসিয়া বলিল—একটা ল্যাঙ্‌টের যোগাড় করছি দাদা—দিব্যি সমুদ্দুরের হাওয়ায় বসে দু'চারটে ডন্ বৈঠক দেওয়া যাবে কি বলেন ? অসিত হাসিয়া সম্মতি জানাইল। যতীন এক পাশের শিক ধরিয়া ওপাশের

সাধারণ কয়েকজন কয়েদীর সহিত গল্প জমাইয়া লইয়াছে। কিন্তু সহসা সুধীরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে একেবারে চমকাইয়া উঠিল—তাহার কি হইল? সকলকে পরিহার করিয়া সে একেবারে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ যেন উঠিয়াছে একেবারে শুকাইয়া। বয়স তাহার এই মোটে পনর, ষোল। গতবার কোন এক মফঃস্বল ইস্কুল হইতে আসিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। ছেলেটি ঘাবড়াইয়া গেল নাকি? অসিত তাহার নিকট বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিল—এমন একলাটি চুপ করে বসে কি ভাবছিস ভাই? মন খারাপ লাগছে? কিছুক্ষণ সুধীর কোন কথারই জবাব দিল না পরে সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মনের কথা বলেছেন হ্যাঁ, মন খারাপ হয়েছে বইকি দাদা? তাই বলে ভয় আমি পাইনি। কিন্তু এর চেয়ে ফাঁসি হলেও যে আমি হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারতাম। যাদের শাসন মানবো না—যারা অত্যাচারী—উঠতে বসতে এই পঁচিশটা বছর ধরে কেমন করে তাদের অত্যাচার সহ্য করবো দাদা? এতে যে নিজের আত্মার অপমান!—নিজের দেশের অপমান! আমি এমনি করে এ অত্যাচার সহ্য করবো না—বন্দীর আইন কানুন, জেলের কোন আইন কানুন কিছুই মানবো না—একা একা যুদ্ধ করে মরবো। তাহার এই উত্তেজনায় যে যাহার কাজ ভুলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভবিষ্যতের আশায় তাহাদিগকে বাঁচিতে হইবে—হইলই বা পঁচিশ বৎসর—তাহার পরও তো তাহারা ফিরিয়া দেশের কাজ করিতে পারে—সেই আশায়ই তো সব অপমান সব দুঃখকষ্ট নীরবে মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিতে হইবে। এমনি অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া অসিত তাহাকে কতকটা শান্ত করিল। তাহার পর স্নান করিয়া চিনি ও তেঁতুল দিয়া চিড়া খাইয়া কম্বল পাতিয়া যে যাহার মত শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পূর্বে তাহাদিগকে একঘণ্টার জন্য বেড়াইতে ডেকে লইয়া

যাওয়া হইল। বাহিরে আসিয়া হঠাৎ তাহাদের মনে হইল—এই বুঝি তাহারা সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে—পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া কোথাও স্থলের কিছুই তাহাদের চোখে পড়িল না—কেবল ধূ ধূ করিতেছে নীলজল। জাহাজ গঙ্গার পূর্বধার ঘেঁসিয়া চলিতেছিল—দৃষ্টি পড়িতেই বহুদূরে নীলরেখার মত স্থলের শেষ চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। জাহাজের ডাক্তার তাহাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া জানাইলেন—ঐ যে বহুদূরে বেলাভূমি দেখা যায়, ঐখানে প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলা বসে—ঐ কপিল মুনির আশ্রম। জাহাজ এইবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িল আর কি! অসিতদের চোখের সম্মুখ হইতে সেই অস্পষ্ট নীলরেখা ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা দৃষ্টির অন্তরাল হইবার আগে শেষবারের মত দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া জন্মভূমির উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানাইয়া লইল। সেই শ্যামরেখা যখন একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন তাহারা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরাইয়া তাকাইল। এক অভাবনীয় দৃশ্য উঠিল অসিতের সম্মুখে ফুটিয়া—রাশি রাশি নীলজলের ঢেউ—সীমাহীন সংখ্যাহীন—আর তাহারই ঠিক উপরে তপ্তকাঞ্চনথালির মতো অস্তগামী সূর্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহারা সকলেই অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল—নীলজলের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কোন এক অদৃশ্য হাত যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়াইয়া দিতে লাগিল। মাত্র অল্প খানিকটা সময়—তাহার পরেই হঠাৎ এক সময় সেই স্বর্ণথালাখানা যেন ঝপ করিয়া সমুদ্রের জলে ডুব মারিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটা অতি তরল অন্ধকারের পর্দায় সমস্ত সংসার আবৃত হইয়া উঠিল। দূর সমুদ্রে, চারিপাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বহুসংখ্যক নীল লাল আলো বারে বারে জ্বলিতে আর নিভিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন—ঐগুলি "লাইট পোস্ট", ঐগুলি দেখে জাহাজের পথ ঠিক করা হয়। ঐ যে লাল আলো, ঐ আমাদের পথ—ঐ মাদ্রাজের—ঐ বোম্বাইয়ের এমনি আরও কত।

নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে—তাহাদিগকে পুনরায় জাহাজের খোলের ভিতরে লইয়া আসা হইল। রাত্রির মতো আহার করিয়া তাহারা গল্প গুজব করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যে যেন জাহাজের মাথা একেবারে বিগড়াইয়া গেল—জাহাজ খোলামকুচির মতো অসহায়ভাবে দুলিতে লাগিল। বঙ্গোপসাগর নাম হইলে হইবে কি—বাঙালী জাতটার সহিত তাহার কোথাও একটুও মিল নাই, এমন উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল সাগর নাকি খুব কমই আছে। বিশেষতঃ এই সময়টাও ভাল নয়।

অসিতেরা তাড়াতাড়ি যে যাহার মতো শুইয়া পড়িল—কেহ লেবুর জল পান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও রেহাই নাই—জাহাজের সে দোলানী একটুও থামিল না—সারারাত্রি তেমনি চলিল—সকালের দিকেও কিছুমাত্র কমিবার লক্ষণ দেখা গেল না। অসিত বুঝিল ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা—বাকী কয়দিন তাহাদের এমনি করিয়াই কাটাইতে হইবে। অসিতের মাথা বারে বারে ঘুরিয়া উঠিতেছিল। অতিকষ্টে উঠিয়া কয়েকবার লেবুর রস পান করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু সঙ্গীদের সাত আটজনের অবস্থা উঠিয়াছে অত্যন্ত কাহিল হইয়া। সকালবেলা দেখা গেল, বমি করিয়া আরও অন্যবিধ কুকর্ম করিয়া তাহারা সারা গায়ে ও কাপড়চোপড়ে মাখাইয়া জাহাজের মেঝেয় অসহায়ভাবে দেহ এলাইয়া দিয়াছে। যদুনাথ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে—আরও কয়েকজন তাহারই পাশে তেমনি করিয়া গড়াইতেছে। পালোয়ান রামপ্রসাদ কসিয়া সেরখানেক চিড়া গোগ্রাসে গিলিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু সারারাত্রি ধরিয়া সুদে আসলে তুলিয়া দিয়া তাহারই মাঝে লেপটিয়া পড়িয়া আছে—আর মাঝে মাঝে শুধু বলিতেছে—এ ভাইয়া—ভাইয়া হো—আরে মরগিয়া রে ভাইয়া, আরে শির তো···

ক্রমে বেলা হইলে কেহ কেহ উঠিয়া বসিল। যতীন, সুধীর, মহেশ এরা কয়জন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের

অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইল না, যতীন রহস্য করিয়া বলিল—আরে এ মিশিরজি—দুচার ঠো ডন্ দি জীয়ে না—দুচার ঠো বৈঠক খিঁচিয়ে না। রামপ্রসাদ একে নিজের জ্বালায় বাঁচিতেছিল না—তাহার উপর এই রসিকতায়—জ্বলিয়া উঠিয়া—আরে তেরি—বলিয়া গালাগালি শুরু করিয়া দিল। যতীন ও অন্যান্য সকলে এত কষ্টেও হাসি চাপিতে পারিল না।

উমেশ বলিল—নেহি ভাই, আউর সের ভর চিড়া খা লেও···। রামপ্রসাদেরও গালাগালির মাত্রা তেমনি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এমনি করিয়া চার দিন চার রাত্রি কাটিবার পর সেদিন তাহাদিগকে ডেকে বেড়াইতে লইয়া আসিলে তাহারা দক্ষিণে, বামে, সম্মুখের দিকে তাকাইয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাদের চারিপাশে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ—এক একখানা অতিকায় কারুকার্যময় নীল রঙএ আঁকা ছবিকে যেন সমুদ্রের মাঝে আটিয়া রাখিয়াছে। উত্তাল সমুদ্র ছাড়াইয়া কখন যে তাহারা এই দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। প্রায় সর্বত্রই দুইপাশে ছোট বড় দ্বীপ। মাঝখান দিয়া জাহাজ চলিতেছে—মনে হয় এ যেন কোন বড় নদীর ভিতর দিয়া তাহারা চলিয়াছে। কোন কোন দ্বীপে ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্বত্র অসংখ্য নারিকেল গাছ। নারিকেল গাছের নীচে নীচে যেখানে সেখানে অসংখ্য আনারস গাছে আনারস ফলিয়া রহিয়াছে। জাহাজ হইতে উহারা কতদূরে তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই—পাহাড়ের দূরত্ব অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট নাম-না-জানা বৃক্ষসকল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অসিতরা সেই ডাক্তারবাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—এই সব দ্বীপে বহু কাঠের কারখানা আছে—এখান হইতে বহু কাঠ ভারতবর্ষে চালান হইয়া যায়। কোথাও বা নারিকেল তেলের কারখানা। এমনি সব দেখিতে দেখিতে তাহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহাদের জাহাজের আশপাশ

দিয়া মোটর লঞ্চ ছুটিয়া চলিয়াছে। বড় বড় ইংরেজ কোম্পানী এখানে আসিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে। কয়েদী ও কয়েদীর বংশধরেরা এখানকার মজুর। কিছুদূর যাইতে ডাক্তারবাবু সম্মুখের দিকে আঙুল তুলিয়া বলিলেন—ঐটির নাম "রস্ আইল্যাণ্ড"। এতক্ষণ ধরিয়া তাহারা সে সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে তাহার তুলনা নাই—তবু সমস্ত সৌন্দর্যকে যেন হার মানাইয়াছে এই "রস্ আইল্যাণ্ড"। তাহারা কথাটি না বলিয়া সেই ছোট্ট স্থানটির সৌন্দর্য দুই চোখ ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

ডাক্তারটি বলিলেন—এইখানে আন্দামানের সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারীরা বাস করেন।

অসিত মনে মনে বলিল—হইবে না কেন ?

জগতের যত শ্রেষ্ঠ জিনিস হয় দেবতায় না হয় দানবে ভোগ করিবে! ডাক্তারটি পুনরায় আঙুল তুলিয়া দেখাইলেন—ঐ যে সামনে 'এবারডিন আইল্যাণ্ড' ঐ যে আন্দামানের জেল—ঐ জেলের টাওয়ার দেখা যায়। দূরে "এবারডিন দ্বীপ" ও জেলের টাওয়ারের চূড়া তাহাদের চোখে ভাসিয়া উঠিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

'প্রিজন ভ্যান' জেল গেটে আসিয়া থামিলে তাহাদিগকে নামাইয়া পুনরায় সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল। অসিত জেলের দিকে তাকাইতেই তাহার চোখে পড়িল গেটের উপর ইংরাজীতে লেখা আছে—"পোর্ট.ব্লয়ার সেলুলার জেল"। জেলার কেরী সাহেব খাঁটি ইংরাজ। জেল অফিস হইতে বাহির হইয়া একেবারে অসিতদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খানিকক্ষণ তাহাদের ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন—"দেখো, সব ঠিকসে চলো—এ ইণ্ডিয়া নেহি—বাংলা মুলুক নেহি—সমঝকে চলো—নহিতো হাম্ সবকই ঠিক করকে দেগা।" অসিতেরা

চুপ করিয়া নূতন দেশের প্রথম সম্ভাষণ গ্রহণ করিল। তারপর তাহাদিগকে গেটের ভিতরে লইয়া আসিয়া খানাতল্লাসী করা হইল। অসিতের কাপড়ের এক পাশে গিঁট দিয়া কি যেন বাঁধা ছিল—জমাদার গিঁট খুলিয়া ফেলিলে খানিকটা ধূলাবালি বাহির হইয়া পড়িল। কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া সেই ধূলাবালি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আঁরে মাট্টি কাঁহে বাঁধকে লে আয়া?" গঙ্গার ধারে পায়ের তলা হইতে যে মাটি অসিত মুঠা ভরিয়া তুলিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—তাহাই আঁচলের একপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেই ধূলাবালির দিকে তাকাইয়া রহিল—ভারতবর্ষের মাটি—বাঙলা দেশের মাটি—তাহার মাটিমা—জন্মভূমির শেষ চিহ্ন! অসিতের দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

তারপর তাহাদিগকে জেলের ভিতরে লইয়া আসা হইল এবং কিছুক্ষণ একটি সেডের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়া স্নান করাইতে লইয়া গেল। কয়েক বাটি করিয়া নোনা জল গায়ে ঢালিয়া তাহারা কোনোপ্রকারে স্নান সারিয়া লইল। আহারের পরে সাত নম্বর ওয়ার্ডের দোতালায় প্রত্যেককে এক একটি সেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। অসিত নিজের সেলের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত জেলটি দেখিয়া লইতেছিল। জেলের দেয়াল ঠিক বৃত্তাকারে চারিপাশে ঘিরিয়া আছে। সেই বৃত্তের মাঝখানে একটি গম্বুজ আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহারই চারিদিকে আড়া-আড়িভাবে কতকগুলি বড় বড় অট্টালিকা দাঁড়াইয়া আছে। অট্টালিকাগুলির প্রত্যেকটি তেতালা। প্রত্যেকটি অট্টালিকার সহিত টাওয়ারটি কাঠের পাটাতন দিয়া যুক্ত এবং ইহাই পথ—অট্টালিকা হইতে বাহিরে যাইতে হইলে বা বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। প্রতিটি অট্টালিকা এক একটি ওয়ার্ড—এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের সম্মুখে এক একটি "ওয়ার্কশপ"। কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর অসিত নিজের ঘরের দিকে তাকাইয়া দেখিল। তাহার সেলের মাঝখানে একটি

তক্তা এবং তাহারই উপর দুইখানা কম্বল পড়িয়া আছে।—অসিত বুঝিল ইহাই তাহার শয্যা। সে এই শয্যায় নির্বিকারভাবে তাহার শ্রান্ত-দেহ এলাইয়া দিল। বেলা গড়াইয়া গেলে সেলের দরজা খুলিবার শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙিল। পুনরায় তাহাদের বারজনকে নীচে নাম'ইয়া লইয়া আসিয়া ওয়ার্ডের সম্মুখে ফাইল করিয়া বসাইয়া রাখা হইল। তারপর থালায় করিয়া খাবার এবং বাটিতে 'মিঠা পানি' দিয়া গেল। তাহারা আহারান্তে থালা-বাটি ধুইয়া আবার ফাইল হইয়া বসিল। পুনরায় আর একদফা সকলকে সার্চ করা হইল। ইতিমধ্যে জেলার কেরী সাহেব আসিয়া চেয়ার পাতিয়া তাহাদের সম্মুখে বসিয়া মিট্ মিট্ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। বার পাঁচ সাত সকলকে 'সরকার সেলাম' করাইয়া পুনরায় যাহার যাহার সেলে লইয়া রাত্রের মতো বন্ধ করিয়া রাখা হইল। অসিত নিজের সেলের দরজার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—পশ্চিম দিগন্তের সূর্য তখনও হয়তো শেষ রশ্মিটুকু পৃথিবীর উপরে নিঃশেষে ঢালিয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা তরল কুয়াশার আবরণ সারা আকাশময় ছড়াইয়া গেল। শুক্লপক্ষের চাঁদ ইতিপূর্বেই আকাশে উঠিয়াছিল—তাহারই একফালি জ্যোৎস্না কেমন করিয়া যেন অসিতের ঘরের মধ্যেও আসিয়া পড়িল। দেওয়ালের ওপাশে ক্রমশঃ উঁচু হইয়া পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহারই গায়ে গায়ে টিন ও টালির অসংখ্য সেড। এই সমস্ত সেডে বাহিরের কয়েদীরা বসবাস করে। এই সমস্ত বস্তি হইতে দুই চারিটি আলো মাঝে মাঝে টিম টিম করিতেছে। আশ্চর্য এই দেশ—ইহার কি জেলের ভিতরে কি বাহিরে সর্বত্রই কয়েদীর বাস—যাহারা এখানে জন্মিয়াছে, তাহারাও কয়েদীরই বংশধর। অসিতের পিছনের জানালাটি দিয়া তাকাইলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভিতরে দুই একখানা লঞ্চ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহারই উজ্জ্বল আলোয় সমুদ্রের জল ঝিক-মিক করিয়া উঠিতেছে। সেইদিকে

চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার নিজের শত-সহস্র ছবি মনের মধ্যে একের পর এক ফুটিয়া উঠিতে ও মিলাইতে লাগিল। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে সে নিজের দেশ ছাড়িয়া এই আট শ' মাইল দূরে কোন এক অদ্ভুত দেশে আসিয়া পড়িল! এদেশ কি বাঙলা দেশেরই মতো! ইহারও কি মাঠে মাঠে তেমনি করিয়া সবুজ ধানের উপরে ঢেউ তুলিয়া পাগলা হাওয়া নাচিয়া বেড়ায়! দোয়েল কোকিল থাকিয়া থাকিয়া সময়-অসময় তেমনি করিয়া গান গাহিয়া উঠে! মাঠে মাঠে বাঙলা দেশের মতো পালে পালে গরু চরিয়া বেড়ায়? ঘরে ঘরে তেমনি করিয়া "বুকভরা মধু" লইয়া এদেশে মা বোন অপেক্ষা করে! জেলের ঘণ্টায় ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। সহসা অসিতের মন একেবারে কলিকাতার নিজেদের বাসায় একমুহূর্তে উড়িয়া গেল। সেখানে আছে অঞ্জুমণি, সেখানে আছে কল্যাণী—সেখানে আছেন তাহার দাদা। অঞ্জুমণি হয়তো এতক্ষণে তাহার জ্যাঠামণির কোলের ভিতরে শুইয়া আছে—তিনি ধীরে ধীরে তাহাকে গল্প বলিয়া যাইতেছেন। অঞ্জু এক একবার তাঁহার কোল হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া এক একটি বেয়াড়া প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া দিতেছে। জ্যাঠামণি তাহার তেপান্তরের রাজপুত্রের গল্প বলিতেছেন। যে রাজপুত্র নিজের দেশ ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া কোন এক নিরুদ্দেশের দেশে চলিয়া গিয়াছিল। হয়তো অঞ্জু মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ, জ্যাঠামণি, বাবা কি তবে সেই তেপান্তরের দেশেই গেছে? জ্যাঠামণি তাহার সহসা কোন জবাব দিতে পারিলেন না—তাঁহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি দুই চোখ মুছিয়া বলিলেন—হ্যাঁ জ্যাঠামণি, সেইখানেই গেছে!

—কেন বাবা সেখানে যেতে গেল জ্যাঠামণি?

জ্যাঠামণি খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—সেই যে তেপান্তরের দেশের টুকটুকে রাজকন্যে, তোর জন্যে তাকেই আনতে গেছে।

অঞ্জু মাথা তুলিয়া তাহার জ্যাঠামণির মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন জ্যাঠামণি? বাবা কতদিনে ফিরে আসবে বল না—আমার মন যে বাবার জন্যে কেমন করে?

তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—আসবে জ্যাঠামণি, শিগগিরই ফিরে আসবে বই কি? চল খেতে চল, ঘুমুবি কখন?

কল্যাণী—মুখ তাহার শুকাইয়া গিয়াছে—চুল তাহার রুক্ষ হইয়া জটা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।—সময় মতো স্নান নাই—যখন-তখন হু হু করিয়া নানা কর্মের ফাঁকে ফাঁকে দুই চোখের জলে বুক তাহার ভাসিয়া যাইতে থাকে। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়ে সে নিজের ঘরের জানালা ধরিয়া উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে—সারা রাত্রি একটুও ঘুমাইতে পারে না। কখনও অঞ্জুকে নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকে—এই তাহার শেষ সম্বল, এই তাহার একমাত্র ভরসা! রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া জাগিয়া উঠে—তারপর দুই চোখ মুছিয়া লইয়া বিছানার উপরে স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে—সহসা দুই হাত জোড় করিয়া ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া মনে মনে কি যেন প্রার্থনা করিতে থাকে। এতক্ষণ পরে অসিতের মন আবার নিজের দেহে ফিরিয়া আসিল। কখন দুই চোখের জল অজস্রধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া তাহার দুই চোয়াল বুক একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছে। এই তাহার "সেল"। এখানেই কতকাল যে তাহাকে কাটাইতে হইবে, কে জানে? কত অপরিচিত ব্যক্তি, কত খুনী,—বদমাস এখানেই দিনের পর দিন কাটাইয়া গিয়াছে। ঐ তাহার বিছানা—ঐ নোংরা কম্বলে—ইতিপূর্বে কতজন তাহার শয্যা রচনা করিয়াছে। সেইদিকে তাকাইয়া তাহার সমস্ত শরীর ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু না—না, ঘৃণা করিলে তো তাহার চলিবে না—এই ঘরে, এই

কম্বলেই তো তাহাকে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে। অসিত সেই তক্তাখানার উপরে একখানা কম্বল পাতিয়া এবং অন্য একখানা ভাঁজ করিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। ভোরবেলা অসিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চুপ করিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নূতন দেশের উষার পরিপূর্ণ রূপ দেখিয়া লইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে জমাদার আসিয়া তাহাদের সেলের দরজা একের পর এক খুলিয়া যাইতে লাগিল। পনর দিন তাহাদের সাধারণ কয়েদীর সহিত মিশিবার হুকুম নাই। অঙ্গে করিয়া কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনিয়াছে কিনা তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য এই সতর্কতা। আরও কিছুক্ষণ পরে থালায় করিয়া তাহাদের "লাপসী" দিয়া গেল—এই তাহাদের সকালবেলার খাদ্য। বাঙলা দেশের জেলের "লাপসীর" নমুনা তাহারা দেখিয়া গিয়াছিল—ইহা তাহার উপরেও এককাঠি—ডালের নামও নাই—সেরখানেক চাউল মণখানেক জল দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিলে যে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয় ইহা তাহাই। আহারাদির পর এক বাণ্ডিল করিয়া নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল। ইহা দিয়া দড়ি পাকাইতে হইবে। এমনি করিয়া কবে এই পনর দিন তাহাদের শেষ হইবে—কবে এখানকার অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত তাহারা মিলিত হইতে পারিবে—এই আশায় তাহারা দিন গণিতে লাগিল। পাঞ্জাবের কর্তার সিং, মোহন সিং, ইউ পি-র ধর্মদাস, বাঙলাদেশের জ্যোতিপ্রকাশ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় বিপ্লবীগণ এখানেই আছেন—ইঁহাদের সাহচর্য কি কম সৌভাগ্যের কথা? পনর দিন তাহাদের কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে এইসব নানা প্রদেশের বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের আলাপ-পরিচয় হইল। এই জেলের কর্তৃপক্ষের সুপার হইতে আরম্ভ করিয়া জমাদার, সেপাই প্রভৃতির নানা কুৎসিত মূর্তি তাহাদের চোখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

কেরী সাহেব কয়েদীর মুখে ইংরাজী বুলী সহ্য করিতে পারিতেন না। ইংরাজীতে কিছু বলিতে গেলে বলিতেন—ইংরাজী মাংতা নেহি—হিন্দিমে বোলো। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট সিপাহী জমাদারের কোন দুর্ব্যবহারের কথা কেহ বলিলে তাঁহাকে হামেশা বলিতে শোনা যাইত যে, একটা মুরগী মারিলে নয় আনা লোকসান হয়—আর একটি কয়েদী মরিলে দৈনিক সাড়ে পাঁচ আনা করিয়া খোরাকী বাঁচিয়া যায়! হেড জমাদার দেদার বক্স পেশোয়ারী। তাহার মুখে সর্বদা বিশ্রী গালাগালি লাগিয়াই থাকিত। আবার স্বদেশী কয়েদীদের উপরেই যেন তাহার আক্রোশ ছিল সব চাইতে বেশি। কাজের একটু এদিক ওদিক হইলে শুনা যাইত—ক্যাহে কাম কমতি হ্যায়? সরকার কা খানা খাতা হ্যায়—শরীর বানাতা হ্যায় ইত্যাদি। এমনি করিয়া সাত আট মাস অসিতদের কাটিয়া গেল। এখন তাহাদের নারিকেলের ছোবড়া একটা কাঠের উপরে রাখিয়া মুগর দিয়া পিটাইয়া তাহার সূত্র বাহির করিতে হইত। সারাদিন পিটাইতে পিটাইতে হাতে ফোস্কা উঠিয়া ঘা হইয়া যাইত কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণের কাজ করিয়া না দিতে পারিলে তো বিশ্রাম নাই। কাজেই যত কষ্টই হউক কাজ করিয়া যাইতেই হইত। এই সাত আটটা মাসে প্রত্যেকের ওজন পনর-ষোল পাউণ্ড করিয়া কমিয়া গেল। রামপ্রসাদ মিশিরের সে পালোয়ানী শরীর আর নাই—একশ আশি পাউণ্ড হইতে নামিয়া সে একশ ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আহার লইয়া হইয়াছে তাহার আরও মুশকিল—যেভাত দিয়া যায় তাহা তাহার পেটের একপাশে পড়িয়া থাকে—কোন প্রকারে জল দিয়া পেট ভরাইয়া লয়। যদুনাথ এত কষ্টেও দুই চারটা রসিকতা করিতে ছাড়ে না—সিপাহী জমাদার নিকটে না থাকিলে নিজের জায়গা হইতে উঠিয়া আসিয়া এখনও দুই

একজনের হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয়। যতীন ও অন্যান্য সবাই একপ্রকার যাই হোক অবস্থার সহিত নিজেদের মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সুধীরকে লইয়া হইয়াছে মুশকিল। সে সর্বদা বিমর্ষ হইয়া থাকে। কিছুদিন কাজ করিবার পর তাহার হাতের আঙুলে বড় বড় ঘা হইয়া পড়িয়াছিল—তাই কাজ তাহার পরিমাণ মতো হইত না। কখনও ফাঁক পাইলে সকলের অলক্ষ্যে অসিতেরা ভাগাভাগি করিয়া কিছু কিছু তাহার কাজ করিয়া দিত। প্রত্যহ জমাদার গালাগালি করিত। সুধীরও মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিত না—দুই একদিন হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত। সে যেন এই অবস্থাকে কিছুতেই সহ্য করিয়া লইতে পারিতেছিল না। তাহাকে লইয়া অসিতদের ভাবনার অন্ত ছিল না—দিন দিন মেজাজ তাহার এত রুক্ষ হইয়া উঠিতেছিল যে, কর্তৃপক্ষের বা সঙ্গীদের কাহারও কোন কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিত না। জেলের খাবার মুখে তুলিতে পারিত না—প্রায়ই সব ফেলিয়া দিত। শরীর তাহার শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন কাজ তাহার হয় নাই। বিকালবেলা জমাদার কাজ বুঝিয়া লইতে আসিয়া বলিল—এই, তোমারা কাম কাহে নেই হুয়া। সুধীর একপাশে গুম হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথার জবাব দিল না।

জমাদার পুনরায় মুখ খিঁচাইয়া বলিল—আরে এতো বহুত নবাবী হুয়া রে—বাত নেহি বলতা! শালা হারামীকা বাচ্চা! কিন্তু জমাদারের মুখের কথা মুখে আছে—সুধীর তড়াক করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহার নাকে দুই তিনটি ঘুঁসি বসাইয়া দিল—জমাদারের নাক ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। জমাদার চট করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল—সুধীর তখন ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গর্জাইতেছিল—সেই মূর্তির দিকে তাকাইয়া জমাদার আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। তখনই জেলার কেরী সাহেবের কাছে সংবাদ গেল। তিনি আসিয়া কি যেন

বলিতেই সুধীর তাহার গায়ের জামা পরিধানের জাঙ্গিয়া খুলিয়া একেবারে বিবস্ত্র হইয়া ফেরীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—
—এহি তোমারা জাঙ্গিয়া হ্যায়—এহি তোমারা কোর্তা হ্যায়—তোমারা কোর্তা জাঙ্গিয়া ভি নেহি পরেঙ্গে, খানা ভি নেহি খায়েঙ্গে—হাম আজাদী হ্যায়।

অসিতেরা যে যাহার জায়গায় বসিয়া বসিয়া সুধীরের কীর্তি দেখিতেছিল। তাহাদের কিছুই করিবার ছিল না। ইহার পরিণাম যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে নিতান্ত শঙ্কিত মনে ভাবিয়া তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কেরী সাহেবের আদেশে কয়েকজন টেণ্ডাল ও মেটে মিলিয়া সুধীরকে ধরিয়া তাহার সেলে লইয়া গেল। অসিতেরা সকলে যে যাহার জায়গায় নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। অসিতের দুশ্চিন্তার আর অন্ত ছিল না। ইহার অর্থ যে কি তাহাতো কাহারও নিকট অবিদিত নয়। এই তো সেদিন একটি কয়েদী কাজ 'রিফিউজ' করায় তাহার উপর যে নির্মম প্রহার চলিয়াছিল—তাহার ফলেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইল! এমন তো হামেশাই চলিতেছে। জেলার জমাদার হইতে সাধারণ মেট পর্যন্ত প্রতিদিন উঠিতে বসিতে যে অসহনীয় অত্যাচার করিয়া যাইতেছে তাহার সমস্তখানি নির্বিচারে একান্ত পাওনা বলিয়া সহ্য করিয়া যাওয়াই তো এখানকার নিয়ম। তাই চিরদিন ধরিয়া যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম ইহারা সহ্য করিবে কেমন করিয়া? যাহারা নাম-করা বদমাইস গুণ্ডা তাহাদের শায়েস্তা করিবার জন্যই তো এই আন্দামান জেল। তাই তো বাছিয়া বাছিয়া এত জায়গা থাকিতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া এই স্থানটি নির্বাচন করা হইয়াছে। অসিতদের 'প্রিজনার্স' টিকিটেও বদমাস, গুণ্ডা, ডাকাত এই সব ভাল ভাল বিশেষণ তাহাদের নামের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সাত আটটা মাসের মধ্যে প্রতিবাদ তাহারা কোনদিন করে নাই—সমস্তই মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সুধীর আজ কেমন করিয়া এমনি

বিগড়াইয়া গেল! তাহার দেহের ভিতরের স্বাধীন মানুষের মনটি হঠাৎ গর্জিয়া উঠিয়া এ কি বিপর্যয় কাণ্ড করিয়া বসিল। এখানে আসিয়া কত দিন কত ফাঁকে অসিত তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সুধীর কিছুতেই কানে তোলে নাই। সে জবাব করিয়াছে—হয় সে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবে—আর না হয় মরিয়া যাইবে, কিন্তু এমন করিয়া জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এই যে প্রতিনিয়ত অপমান বহন করিয়া পশুর জীবন যাপন করা ইহা সে কোন প্রকারেই সহ্য করিবে না। নিতান্ত ছেলে মানুষ—নিতান্ত সেন্টিমেণ্টাল! এমনি করিয়া অকালে সত্যই জীবনটাকে শেষ করিয়া দিবে নিশ্চয়!

সুধীরের সেলে লইয়া তাহাকে সত্যই নিদারুণ প্রহার করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন সমস্তই সে নির্বিচারে সহ্য করিয়াছে একটি কথাও কহে নাই, একটু অস্ফুট চীৎকার করিয়াও প্রতিবাদ বা যন্ত্রণা জানায় নাই। অসিত সেলে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইল তাহার সেলের একপাশে থালায় খাবার দিয়া গিয়াছে। সে তাহা স্পর্শও করে নাই—অন্য পাশে তেমনি উলঙ্গ হইয়া দুই চোখের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অসিতকে তাহার সেলে বন্ধ করিয়া গেলে সে কতবার লোহার দরজার ফাঁকের ভিতরে মাথা ঢুকাইয়া তাহাকে ডাকিয়াছে কতবার কত বুঝাইয়াছে আহার করিতে বলিয়াছে, কিন্তু সুধীরের নিকট হইতে একটা কথারও জবাব আসে নাই। সে হয়তো তেমনি করিয়া তখনও বসিয়াছিল। অগত্যা বিরক্ত হইয়া অসিত নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সারাটা রাত্রি বারে বারে সুধীরের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আহা বেচারীকে কি প্রহারটাই না করিয়াছে। সারাটা রাত্রি অনাহারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভোরবেলা জমাদার আসিয়া অসিতের ঘরের দরজা খুলিয়া সুধীরের সেলের নিকটে যাইয়াই আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল। অসিত তাড়াতাড়ি সুধীরের সেলের দিকে ছুটিয়া গিয়া সেই

দিকে চাহিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল—এ কি, সুধীর যে কম্বল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া সেলের দরজার সঙ্গে ফাঁসি লাগাইয়া মরিয়া আছে। তাহার মৃতদেহ লোহার দরজার সাথে লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে। চোখ দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—জিব খানিকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অসিত দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। জেলার আসিলেন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। মৃতদেহ সেখান হইতে নামাইয়া নীচে লইয়া যাওয়া হইল। অসিতদের ইতিপূর্বেই যাহার যাহার সেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—সারাদিন তাহাদের এমনি বন্ধ করিয়া রাখা হইল। সুধীরের দেহ কোথায় লওয়া হইল—কি করিল কোন খবরই তাহারা পাইল না।

আজ আবার সন্ধ্যাবেলা অসিত নিজের সেলে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাল সন্ধ্যায় নিজের সেল হইতে মুখ বাড়াইয়া কতবার সুধীরকে আহার করিবার জন্য একটু শান্ত হইয়া থাকিবার জন্য কত করিয়া অনুরোধ করিয়াছে—কিন্তু তাহার অপমানিত আত্মা এতটুকু শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। সুধীর তাহাদের ভিতরে সব চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু বোধ হয় সব চাইতে বেশী সাহসী—সব চাইতে বেশী বিদ্রোহী। সে যাহাকে একবার শত্রু বলিয়া জানিয়াছে অবস্থা বিশেষে তাহারই অনুজ্ঞা মানিয়া চলিতে—তাহারই আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া জীবনধারণ করিবার মতো মনোবৃত্তি তৈরী করিয়া লইতে পারে নাই। এ তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—অসিত প্রথমাবধি তাহার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। রাত্রি এতক্ষণ বোধ হয় আট-নয়টা বাজিয়া গিয়াছে—অসিতের সেদিকে লক্ষ্য নাই—সে এক মনে ভাবিতেছিল। জেলের চারিদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। তাহাদের পর পর বারটি সেলের মধ্যে আজ একটি শূন্য পড়িয়া আছে। সুধীর আজ আর নাই। বাকী দশজনও নিশ্চয় অসিতের মতই এখন চুপ করিয়া নিজের নিজের সেলে বসিয়া এমনই ব্যাকুল

হইয়া ভাবিয়া চলিয়াছে। যে বারজন একই পথের পথিক হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিল,—তাহাদের একজনের আজ এখানেই এমনি করিয়া শেষ সমাধি হইয়া গেল! কি হইল সুধীরের দেহ? হয়তো সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিয়াছে—আর না হয় মৃত পশুর মত তাহাকে কোথাও মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছে—এতটুকু সম্মান—এতটুকু দরদ কেহ দেখায় নাই। যশোর জেলার কোন পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় কলেজে ভর্তি হইয়াছিল—মধুকর আনিয়াছিলেন তাহাকে দলে টানিয়া। সংসারে তাহার কে কে আছে অসিত জানে না—হয়তো বাড়ীতে তাহার পিতামাতা ভাই বোন পরিপূর্ণ সংসার আছে। সে সমস্ত অবিচলিত চিত্তে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ছাড়িয়া আসিয়াছে নিজের সমস্ত ভবিষ্যতের—নিজের জীবনমৃত্যুর চিন্তা! কিন্তু আক্ষেপ করিয়া তো কোনই লাভ নাই। ইহাই তো এখানকার নিয়ম! উঠিতে বসিতে যেখানে মানুষের উপরে পশুর মত ব্যবহার করা হয়—একজন কয়েদীর জীবনের চেয়ে যেখানে একটি মুরগীর মূল্য বেশী—সেখানে ইহার চাইতে বেশী কিছু আশা করাই তো নির্বুদ্ধিতা! এ মৃত্যু লইয়া আর কোন হৈ চৈ হইবে না। কাল হইতে আবার তাহাদের যথানিয়মে কাজ করিয়া যাইতে হইবে—কোন প্রতিবাদ চলিবে না।

প্রতিবাদ করিলে তাহাদের অদৃষ্টেও অনুরূপ অবস্থাই ঘটিত। সুধীর নিজের হাতে মুক্তির পথ বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু সেপাই জমাদারের প্রহারের ফলে মৃত্যু ঘটাও তো একটুও আশ্চর্য ছিল না। এই নজিরেরও তো এখানে অভাব নাই। ইহার কোন বিচার নাই—কোন প্রতিবাদ নাই। মাছের শোকে বিড়াল যেমনি করিয়া কাঁদে—তেমনি দরদ লইয়াই হয়তো একটা বিচারের প্রহসন হইবে—হয়তো সুধীরের টিকেট খাতায় লিখিয়া রাখা হইবে—ডায়রিয়ায় বা কলেরায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ব্যস—সমস্ত দায়িত্ব সমস্ত কর্তব্য তাহাদের শেষ হইল! কিছুক্ষণ পূর্বে অসিতের দুই চোখের কোণ বাহিয়া অঝোরে যে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িয়া তাহার দেহ ভাসিয়া

যাইতেছিল—এখন সেই ধারা একেবারে শুকাইয়া গিয়া দুই চোখ তাহার হিংস্র পশুর মত জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ছয় বৎসর পরের কথা। সেদিন অমিয়র অফিস হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তিনি হাত মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিতেই অজয় দৌড়াইয়া তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতে, তাঁহার পাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—আজ মির্জাপুর পার্কে মস্ত বড় সভা ছিল, আমি দেখে এলাম জ্যাঠ্যামণি।

অমিয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুই কেন গেলি—অজু—এইসব মিটিংএ যায় নাকি? শেষে একটা গণ্ডগোল হোক—মারামারি হোক!

অজয় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ইস্ মারামারি আবার করবে কে সেখানে? কত লোক—উঃ, বাপ্ রে। পার্কে রাস্তায় আশেপাশের বাড়ীর ছাদে কোথাও কি একটু ফাঁক ছিল? অত লোক আমি কোনদিন দেখি নি। মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন সভায়। তিনি বক্তৃতা দিলেন, আমি তাঁর একেবারে কাছে গিয়ে বসেছিলাম। হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন—জ্যাঠামণি—আমি ভাল বুঝতে পারলাম না কিন্তু কয়েকটা কথা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। প্রথমে বল্লেন—মেরে পিয়ারে ভাইয়ো—আউর বহিনো, একবার বল্লেন—নন্ কো-অপারেশনের কথা। নন্ কো-অপারেশনের মানে জান জ্যাঠামণি? —অসহযোগ—ইংরেজের সঙ্গে আর আমরা কেউ কোন সম্বন্ধ রাখবো না—তার চাকরী করবো না। তারপর বাঙলায় কতজন বক্তৃতা দিলেন। ছেলেদের ইস্কুল কলেজ ছাড়তে হবে—দলে দলে পিকেটিং করতে হবে—ন্যাশন্যাল ইস্কুল তৈরী হবে তাতেই তারা পড়বে। আরও কত কথা—সব কি আমার মনে আছে! একজন

খুব বড় মুসলমান উর্দুতে কি সব বক্তৃতা দিলেন—আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কংগ্রেস নাকি সবাইকে এই সব করতে আদেশ করেছে। তুমি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছো—জ্যাঠামণি! অমিয় এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিলেন—কঠিন হইয়া জবাব দিলেন—না, ওরা সব ভুল বলে—ছেলেদের মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, বাজে চিন্তায় মন দিতে নাই। আর ইংরাজের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখলে চলবে কেন? ইংরেজ যে দেশের রাজা! অজয় খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তবে কেন বল্লেন জ্যাঠামণি। মহাত্মা গান্ধী কত ভালো লোক তুমি তো জান না—দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে সেখানে যেসব ভারতবাসী থাকে তাদের কত সুখ সুবিধে করে দিয়ে এসেছেন। ইংরাজরা তাঁর উপরে কত অত্যাচার করেছিল—তাঁর প্রাণ নিতে চেয়েছিল—তবু তিনি একটুও ভয় পান নাই। অবশেষে তাঁরই জয় হয়েছে।

অমিয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—এসব তুই কেমন করে জানলি অজু?

অজু হাসিতে হাসিতে বলিল—'নায়কে' লিখেছে যে—আজকের নায়ক পড়নি জ্যাঠামণি? আমি রোজ নায়ক পড়ি—বড় ভাল লাগে আমার। সবার সঙ্গে আমিও সভায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলাম—"বন্দে মাতরম্—আল্লা-হো-আকবর—মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়।" উঃ কি সে চীৎকার! মানুষ যেন সব আনন্দে পাগল হ'য়ে গেল। হাঁ, সেই যে সত্যেন দত্তের জালিয়ানওয়ালাবাগের কবিতা বেরিয়েছিল—

—"বিশ হাজারের নিবিড় ভিড়ে চালিয়ে গোলা ফুরিয়ে টোটার পুঁজি—"সে কথাও হলো। সমস্ত সভার লোক যেন জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে রাগে গর্জে উঠলো।

অজয় আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে—অমিয় কল্যাণীর ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন—বৌমা! কল্যাণী তাড়াতাড়ি দরজার পাশে

আসিয়া দাঁড়াইল। অমিয় বলিলেন—তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম বউমা! অজয়ের সমস্ত ভালমন্দের ভার যে আজ তোমার উপরে একথা তো ভুললে চলবে না—আজ পিতামাতা দুজনের ভারই যে একা তোমাকেই নিতে হ'বে? কল্যাণী অমিয়র কথার কোন অর্থই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমিয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সারা ভারতবর্ষময় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—দলে দলে ছেলেরা সব ইস্কুল কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে। আজ অজয় বিকালে পার্কে গিয়েছিল—সভায় বক্তৃতা শুনতে। এমনি করে তো ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—তুমি নিষেধ কর না কেন?

কল্যাণী বলিল—কিন্তু আপনি থাকতে সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়েই বা পড়বে কেন? নিষেধ যদি করতে হয় সেতো আপনিও করতে পারেন।

অমিয় এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—কিন্তু আমাকে যে ও মানতেই চায় না।

কল্যাণী বলিল—আপনার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে—ছেলেকে এত আস্কারা দেওয়া তো ভাল নয়। কোনদিন একটা কটু কথা বলবেন না—একটু শাসন করবেন না—এমনি করে যে ও কাউকে মানতে চাইবে না। আর আপনার কথাই যদি না শোনে, আমার কথাই বা শুনবে কেন?

অমিয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কটু কথা বলতে যে আমি পারিনে বউমা—আমার বুক যে ভেঙ্গে যায়। ওর মুখ ভার দেখলে আমার যে অসির কথা মনে পড়ে—আমার বুকের মাঝে যে শূল বিঁধতে থাকে। কিছুক্ষণ তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় বলিয়া উঠিলেন,—আমি দুর্বল মানুষ বউমা—অসির মত সাহস আমার নাই—তার মত মনও আমার নয়। আমি চাই অজয় আমার লেখাপড়া শিখুক—ভাল চাকরী করুক—এই সংসারের সুখ দুঃখ আর দশ জনের মত করে ভোগ করুক।

কল্যাণী বলিল—আমিও তো তাই চাই—।

—তবে—কাল থেকে ওকে চোখে চোখে রেখো—ইস্কুল থেকে এলে আর কোথাও বেরুতে দিও না। এই ছোটবেলায় একবার যদি স্বদেশীর নেশা মাথায় ঢোকে—তবে তার প্রায়শ্চিত্ত যে সারা জীবন ধরে করতে হবে। আমিও এখন থেকে শক্ত হবো—খবরের কাগজ আর বাড়ীতে রাখবো না—ওতে আরও উত্তেজনা এনে দেয়। বলিয়া তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। পরের দিন হইতে বাড়ীতে খবরের কাগজ আসা বন্ধ হইয়া গেল। অজয় প্রথমে জ্যাঠামশাইয়ের নিকট আবদার করিল—মুখভার করিল কিন্তু তিনি কিছুতেই কাগজ রাখিলেন না। মায়ের কাছে পয়সা চাহিয়াও পাইল না। ইহারই কয়েক দিন পর হইতে প্রত্যহ ইস্কুল হইতে আসিয়া অজয় সেই যে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইত আর ফিরিত সন্ধ্যায়। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলে ভাল করিয়া কোন জবাব দিত না—কোন প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত। সেদিন অমিয়, অজয় কোথায় যায় জানিবার জন্য গোপনে গোপনে তাহার পিছু লইলেন। অনেক দূর আসিয়া অবশেষে বাগবাজার অঞ্চলের একটি বড় রাস্তার ধারের একখানা বাড়ীর কাছে গিয়া অজয় কাহার যেন নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার সমবয়সী একটি ছেলে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল অজয় ভিতরে ঢুকিল। অমিয় ধীরে ধীরে বাড়ীর কাছে আগাইয়া গেলেন। রাস্তার উপরে বৈঠকখানা। অজয় আর সেই ছেলেটি সেই ঘরে গিয়া বসিয়াছে। অজয়ের হাতে একখানা খবরের কাগজ—অমিয় দূরে দাঁড়াইয়া জানলার ভিতর দিয়া সমস্ত দেখিতে পাইলেন। অজয় একেবারে তন্ময় হইয়া “নায়কের” পাতায় ডুবিয়া গিয়াছে। অমিয় রাস্তার অপর পাশে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে কাগজ পড়া শেষ হইলে অজয় যখন বাহির হইল তখন বেলা আর নাই। অমিয় তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া সন্ধ্যার পরে বাড়ী ঢুকিলেন। পরের দিন হইতে বাড়ীতে আবার খবরের

কাগজ আসিতে লাগিল। আজকাল সন্ধ্যাবেলা অজয় অমিয়র পাশে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া যায়—অমিয় বসিয়া বসিয়া শুনেন। মাস কয়েক পরে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা খবরের কাগজ হাতে করিয়া অজয় অমিয়র ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দেখেছো জ্যাঠামণি আজকের কাগজ? সেই যে চিত্তরঞ্জন দাশ—যাঁকে সবাই সি, আর, দাশ বলে—তিনি সব ছেড়ে দিয়ে স্বদেশীতে নেমেছেন। অমিয় হাত বাড়াইয়া কাগজ লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অজয় প্রশ্ন করিল—খুব বড় ব্যারিস্টার তিনি, না জ্যাঠামণি?

অমিয় জবাব দিলেন—হ্যাঁ, মাসে হাজার হাজার টাকা পেতেন তিনি।

অজয় কাগজের পৃষ্ঠা ঘুরাইয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া আঙুল দিয়া নির্দেশ করিয়া বলিল—দেখেছো জ্যাঠামণি, কাগজের সম্পাদক "সখার ডাক" নাম দিয়ে কি লিখেছেন তাঁর সম্বন্ধে! অমিয় কাগজখানা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—কি লিখেছেন তুই পড় তো অঞ্জু, আমি শুনি। অজয় মহা উৎসাহে সমস্ত লেখাটি পড়িয়া গেল। পড়া শেষ হইলে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা জ্যাঠামণি—আজকাল সব লোকে গবর্ণমেণ্টের চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে না?

অমিয় বলিলেন—কই না রে, কে বল্লে ছেড়ে দিচ্ছে?

অজয় বলিল—কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মত যাঁরা ভাল ভাল লোক তাঁরা তো দিচ্ছেন?

—কদাচিৎ কেউ চাকরী ছাড়ছে অঞ্জু—চাকরী কি অত সহজেই ছাড়া যায়?

—কিন্তু তাহলে স্বরাজ আসবে কেমন করে? গান্ধীজী যে চাকরী ছাড়তেই বলছেন!

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—বড় হলে বুঝবি অঞ্জু, চাকরী ছাড়ব বল্লেই ছাড়া যায় না।

অজয় বলল—আমাদের ক্লাশে ছেলেদের মধ্যে রোজ এই নিয়ে

কত তর্ক হয়, জ্যাঠামণি! আমাদের প্রফুল্লর বাবা পুলিশে চাকরী করেন বলে সকলে তাকে কত ঠাট্টা করে। আমাকে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। আমি বুক ফুলিয়ে বলি—আমার বাবার সঙ্গে কার তুলনা? আমার বাবা সকলের আগে স্বদেশী করে আন্দামানে গেছেন। প্রফুল্ল মিথ্যে করে বলেছিল—তুমি নাকি সরকারী চাকরী কর। আমি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম—মিথ্যে কথা—আমার জ্যাঠামণি কখনও সরকারী চাকরী করেন না।

অমিয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—কিন্তু তুমি তো ভাল করনি!

—কেন জ্যাঠামণি?

—আমি যে সরকারী চাকরীই করি অঞ্জু!

—সরকারী চাকরী?

—হাঁ, তাই তো!

অজয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল—কিন্তু আমি যে তাহলে মিথ্যে কথা বলেছি, জ্যাঠামণি আমাকে যে সত্যিকথা কথা কাল তাদের জানাতে হবে?

—তা হবে বই কি অঞ্জু—মিথ্যে তো বলতে নেই!

পুনরায় কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া সে বলিল—আমাকে সবাই ঠাট্টা করবে জ্যাঠামণি—তোমার নামে নিন্দে করবে—আমি তা সহ্য করতে পারবো না যে।

অমিয় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—যারা ভাল ছেলে—তারা কোনদিন কারুর গুরুজনকে ঠাট্টা করে না অঞ্জু!

অঞ্জু এবার সহসা কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু যাঁরা সব ভাল লোক তাঁরা যে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিচ্ছেন জ্যাঠামণি—কি হবে চাকুরী করে?

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—চাকুরী না করলে টাকা আসবে কোত্থেকে রে!

অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল—চাই না আমরা টাকা—কি হবে টাকা দিয়ে ?

অমিয় ধীরে ধীরে অজয়কে নিজের কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, টাকা কি আর আমার নিজের জন্যে চাই অঞ্জু! টাকা না হলে কি দিয়ে তোকে মানুষ করে তুলবো—তোকে যে মানুষ হতে হবে জ্যাঠামণি —মানুষ হতে হবে! কিন্তু অজয় মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল—তোমার নিন্দে শুনে আমি মানুষ হব না জ্যাঠামণি!—দাও না চাকরী ছেড়ে—তোমার খুব নাম হোক—দেশের লোকে তোমার নামে জয় দিক—যেমনি করে মহাত্মার নামে জয় দেয়—চিত্তরঞ্জন দাশের নামে জয় দেয়! অমিয় তাহার কোন কথার জবাব না দিয়া তাহাকে শুধু বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিলেন—বুক তাঁহার যুগপৎ ভয়ে ও গর্বে একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠি।

ত্রিংশ অধ্যায়

বিকালবেলা কল্যাণী নিজের ঘরে একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আজ ছয়টা বৎসর পরে সে ভাল করিয়া আয়নায় নিজের চেহারার দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয়টি বৎসরে শরীর তাহার কি হইয়া গিয়াছে! মাথায় চুলের রাশ রুক্ষ হইয়া জটা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—দুই চোখ গিয়াছে বসিয়া চোখের নীচের দুই পাশের হাড় দুইখানি উঠিয়াছে জাগিয়া। বয়স তাহার এই বত্রিশ বৎসর হইল। এই ছয়টি বৎসর পূর্বে চেহারা তাহার সত্যই দেখিবার মত ছিল। কিন্তু আর মাত্র কয়েকটি বৎসর পরে চুলে তাহার পাক্ ধরিবে—মুখের হাড়গুলি উঠিবে জাগিয়া—দেখিতে সে একেবারে কুৎসিত হইয়া যাইবে। সহসা বুক ভাঙ্গিয়া তাহার দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। দৌড়-ঝাঁপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অজয় আসিয়া ঘরে ঢুকিল। হাতের বই-খাতা একপাশে টেবিলের উপরে

রাখিয়া দিয়া কল্যাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। কল্যাণীর তাহার দিকে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিল—ও কিরে অমন মুসলমানের মত টুপি পরে এলি কোথেকে? অজয় হাসিতে হাসিতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —ইস্ মুসলমানের মত বই কি? একে কি বলে জান মা—গান্ধী-টুপি, খদ্দর দিয়ে তৈরী। ভাল করে চেয়ে দেখ না—লাল কালি দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' লেখা রয়েছে যে!

কল্যাণী বলিল—কিন্তু তুই কোথায় পেলি শুনি?

—আমি কিনেছি মা—চার আনা দাম নিয়েছে। আমাদের ক্লাশে আরও কত ছেলে কিনেছে। খাটের উপরে বসিয়া পড়িয়া অজয়কে তাহার কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কল্যাণী কতক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অজয় দুই হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কাল একটা জিনিস দেখে এসেছি মা।

কল্যাণী বলিল—কি রে?

—তুমি আগে বল মা—জ্যাঠামণিকে বলবে না? জ্যাঠামণি শুনলে রাগ করবে।

কল্যাণী বলিল—আবার বুঝি সভায় গিয়েছিলি?

—না মা সভা নয়—কাল বিকালে মীর্জাপুর পার্কে চরকা-প্রদর্শনী হচ্ছিল। দলে দলে লোক চরকা নিয়ে বসে সূতো কাটছিলো। একপাশে পুরুষ—একপাশে মেয়েছেলে—আমি গুণে দেখেছিলাম মা পুরুষেরা ছিল পঞ্চাশ জন—মেয়েছেলেও ছিল পঞ্চাশ জন। একশ'টা চরকায় একসঙ্গে সূতো তৈরী হচ্ছিল। ঘরের ভেতরে ভোমরা যেমন ভোঁ-ভোঁ করে ডেকে বেড়ায়—তেমনি করে চরকার শব্দ হয়—একশটা ভোমরা যেন একসাথে গান ধরেছিল মা। বড় ভাল লাগছিল আমার। হাঁ মা, তুমি চরকা দেখেছো?

কল্যাণী বলিল—দেখেছি আমাদের গাঁয়ে তাঁতিদের বাড়ী ছিল।

—আমাদের ক্লাশের অধীরের মা নাকি খুব চরকা কাটতে পারেন

বল্লে—এ মাসের সূতো দিয়ে তাঁর নাকি একখানা কাপড় তৈরী হবে। আচ্ছা মা, তুমি কেন চরকা কাট না? জ্যাঠামণিকে যদি বল, তিনি চরকা কিনে এনে দেবেন।

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—চরকা কেটে কি হবে রে?

—বাঃ তুমি জান না বুঝি? মহাত্মা যে বলেছেন চরকা কাটলে স্বরাজ আসবে? কেন বলেছেন জান মা—ইংরেজেরা বছরে আমাদের দেশে ষাট কোটি টাকার কাপড় বিক্রী করে—আমরা যদি নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরী করে নি—তাহলে আর তাদের কাপড় এদেশে বিক্রী হবে না—তারা না খেতে পেয়ে মরবে। আমাকে একখানা খদ্দরের ধুতি আর জামা কিনে দেবে মা?

কল্যাণী বলিল—কিন্তু অত মোটা কাপড় তুই পরতে পারবি কেন?

—তুমি দেখো মা, আমি খুব পারবো—বড় ইচ্ছে করে মা খদ্দরের ধুতি পরে জামা গায়ে দিয়ে—গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে ইস্কুলে যাই।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে, নে এখন খেতে চল, বলিয়া কল্যাণী তাহাকে রান্না ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। পরের দিন বিকাল-বেলা অজয় ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। আজ কয়েকজন কলেজের ছাত্র আসিয়া ছুটির পরে তাহাদের ইস্কুলের সামনের ছোট পার্কটায় সভা করিয়াছে। তাহা-দের ইস্কুলের ফার্স্ট ক্লাশের সেকেণ্ড ক্লাসের কত ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হইল এমনকি থার্ড ক্লাশের দুই-তিনজনের নামও তাহারা লিখিয়া লইল। অজয়ের ভারী ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে আগাইয়া যাইতেই তাহারা বলিয়া উঠিল—তাহাকে লওয়া হইবে না—তাহার বয়স এখনও ষোল বৎসর হয় নাই। ষোল বৎসরের কমে নাকি স্বেচ্ছা-সেবক করা হয় না। সেই হইতে অজয়ের মন মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল তাহার বয়স এই চৌদ্দ বৎসর আট মাস হইল—আরও এক বৎসর চার মাস না গেলে সে স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবে না। ততদিন কি স্বদেশী

আন্দোলন থাকিবে? স্বরাজ যদি ইহার ভিতরেই আসিয়া যায় তবে তো আর স্বদেশী আন্দোলন হইবে না। তখন কি আর স্বেচ্ছাসেবকের দরকার হইবে? যদি স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকই না হইতে পারিল—তবে কি হইবে তাহার লেখাপড়া শিখিয়া? কি হইবে ইংরেজী শিখিয়া? আচ্ছা স্বরাজ পাইলে ইংরেজরা তো সব বিলাতে চলিয়া যাইবে? তখন আর ইংরাজী শিখিয়া লাভ কি? হঠাৎ ইংরাজী শিখিবার সমস্ত উৎসাহ তাহার নিভিয়া গেল। অজয় যদিও সেদিন, তাহার জ্যাঠামশাই যে সরকারী চাকুরী করেন তাহা তাহাদের ক্লাশের সকলের কাছে বলিবে—মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও ভুলাইবে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সে তাহা কাহারও কাছে বলিতে পারে নাই। ক্লাশে প্রফুল্লর দুর্দশা সে তো নিজের চোখেই নিত্য দেখিত—তাহাকে সকলে পুলিশ সাহেব বলিয়া ঠাট্টা করিত—তাহার পিতার সম্বন্ধেও কেউ বিশেষ সম্মান করিয়া কথা বলিত না। হয় তো অজয়কেও সকলে তেমনি করিয়া ঠাট্টা করিবে, তাহার জ্যাঠা-মণিকেও কেহ সম্ভ্রম করিয়া কথা বলিবে না—সে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? সেদিন ক্লাশে আসিয়া প্রফুল্ল সকলকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিল—এই ভাই, তোমরা শোন সব্বাই—অজয় একটা আস্ত মিথ্যাবাদী। সেদিন যে ও বলেছিল ওর জ্যাঠামণি সরকারী চাকুরী করেন না—আজ আমি বাবার কাছে শুনে এসেছি—কাস্টম্‌স হাউস তো গভর্ণমেণ্টের—কাস্টম্‌স হাউসে যারা চাকরী করে তারাও সরকারী চাকুরে। প্রফুল্লর কথা শুনিয়া সকলে নানা গবেষণা আরম্ভ করিল—পরে ইস্কুলের থার্ড মাস্টার মহাশয়ের নিকট হইতে তাহাদের সংশয় ভঞ্জন করিয়া আসিয়া অজয়কে কেহ কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কিন্তু সেই যে তখন হইতে অজয় ঘরের মেঝের উপরে চোখ নামাইয়া চুপ করিয়া একপাশে বসিয়াছিল—শেষ পর্যন্ত আর একবারও ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহে নাই—কাহারও সহিত একটি কথাও কহে নাই। ছুটি হইলে ধীরে ধীরে ক্লাশ হইতে বাহির

হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে তাহাদের ক্লাশে তাহার কেহ বন্ধু রহিল না। প্রফুল্ল অজয় প্রভৃতি যাহাদের অভিভাবকগণ সরকারী চাকুরী করেন তাহাদের সব এক বেঞ্চে বসিতে হইত—কোন ছেলে তাহাদের সহিত বসিতে চাহিত না। অজয় কোনদিন ইহার কোন প্রতিবাদ করিত না—সমস্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ ন্যায্য পাওনা বলিয়া চুপ করিয়া সহ্য করিত। বাড়ীতেও অজয় তেমনি চুপ চাপ থাকিত। যে ছেলে দিনরাত হরিণের মত সব সময় ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইত—হাসিয়া চীৎকার করিয়া সব সময়ে বাড়ীঘর মাতাইয়া তুলিত—তাহাকে এমনি চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িল। আজকাল আর অজয় সন্ধ্যাবেলা তাহার জ্যাঠামণির জন্য বসিয়া থাকে না। কোন কোন দিন তাহার নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকে—কোনদিন বা আলোর সম্মুখে চুপ করিয়া বই খুলিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলা অমিয় প্রত্যহ অজয়ের আশায় নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—অজয় প্রায়ই আসে না। যদিবা কোনদিন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যান কিন্তু অজয় একটি কথাও কহে না। গল্প বলিতে গেলে যাহার আগ্রহের অন্ত থাকিত না—গল্পের মাঝে মাঝে কত সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া যে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত—সেই অজয় আজকাল এমনি অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।—কোন আগ্রহই আর তাহার দিক হইতে প্রকাশ পায় না। অমিয়র মনে হয় অজয় কিছু শুনিতেছে না। তাঁহার গল্প বলিবার সমস্ত আগ্রহ নিঃশেষ হইয়া যায়—মাঝখানেই হয় তো তিনি থামিয়া পড়েন। অমিয় ভাবিয়া পান না, অজয় এমনি হইয়া গেল কেন? কি হইয়াছে তাহার? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অমিয় অঞ্জুকে নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—তোর কি হয়েছে অঞ্জু—কেন তুই আর আগের মত আমার কাছে আসিস নে—কথা বলিস নে। অজয় কোন কথার জবাব না দিয়া

চুপ করিয়া তাঁহার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর অমিয় বুঝিতে পারিলেন—অজয় তাঁহার কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তিনি জোর করিয়া অঞ্জুর মুখ নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া পুনরায় বলিলেন—আমাকে বলবি না অঞ্জু—তুই ছাড়া আমার আর কে আছে রে? তুই যদি আমাকে এমনি করে ব্যথা দিস—তবে আমার দুঃখ আর কাকে জানাব বল্‌তো? বলিতে বলিতে তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজয় মাথা তুলিয়া বলিল—আমাকে যে সবাই ঠাট্টা করে, অপমান করে জ্যাঠা-মণি! অমিয় বলিলেন—কে তোকে ঠাট্টা করে—কেন করে অঞ্জু?

—তুমি সরকারী চাকরী কর বলে সবাই যে আমাকে অপমান করে—তোমাকে তাচ্ছিল্য করে! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার অমিয়র নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

—করলেই বা আমাকে তাচ্ছিল্য—যারা ভাল ছেলে তারা তো কারু গুরুজনকেই তাচ্ছিল্য করে না অঞ্জু! তাদের যা ইচ্ছে তাই করুক তাদের কথায় কান দিসনে জ্যাঠামণি। তুই তো আমাকে ভালবাসিস—তুই তো আমাকে তাচ্ছিল্য করিস নে!

—কিন্তু জ্যাঠামণি—মহাত্মা যে বলেছেন সরকারী চাকরী করতে নাই—ইংরেজের সাহায্য করতে নাই।

কিন্তু অমিয় তাহার কোন কথার আর কোন জবাব দিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের ভিতরে নানা চিন্তা বারে বারে পাক খাইয়া উঠিতে লাগিল। একি সর্বনাশ হইল তাহার—যে অঞ্জুকে নিজের পুত্রের মত করিয়া আদর যত্নে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ অন্তরের সমস্ত স্নেহ যাহার উপরে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন—নিজের পুত্র তো অনেক দিনই তাঁহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—আর কোন দিন যে নিজের কাছে তাহাকে ফিরিয়া পাইবেন সে আশাও বড় একটা নাই—এই অজয়ই তো তাঁহার সারা চিত্ত ঘিরিয়া ছিল—

পুত্রের অভাব অনেকখানি পূরণ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ এমনি করিয়া একি সর্বনাশা চিন্তা তাহার মাথায় ঢুকিয়া তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অমিয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—আর একান্ত চেষ্টা করিয়াও অঞ্জু তাহার পূর্বের সে শ্রদ্ধা তাঁহার উপরে রাখিতে পারিতেছে না। সমস্ত চিত্ত তাঁহার ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

মাস খানেক পরে সেদিন সন্ধ্যার পরও অজয় বাসায় ফিরিয়া না আসায় রীতিমত উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। অজয় কোথায় গেল—কি হইল ভাবিয়া অমিয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাস্তায় নামিয়া তাহাকে খুঁজিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন—এমন সময় তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া একটি যুবক আসিয়া সংবাদ দিল—অঞ্জু পুলিশের লাঠিতে আহত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। যুবকটি অন্যান্য সংবাদ যাহা বলিল—তাহার মর্ম এই ঃ—কোথায় রাস্তা দিয়া কাল নিশান লইয়া কিসের জন্য বিক্ষোভ জানাইতে জানাইতে একদল ছাত্র পথ চলিতেছিল। সেই দলে অজয় ছিল—পুলিশ আসিয়া হঠাৎ শোভাযাত্রা আক্রমণ করে—লাঠি চালায়, অজয় এবং আরও আট-দশটি ছেলে আহত হয়। সমস্ত ব্যাপারটি অমিয় ভাল করিয়া বুঝিয়াও উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে কখন কল্যাণী আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে। অমিয় তাহার দিকে ফিরিয়া দেখেন তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। অমিয় বলিলেন—ছিঃ, কেঁদ না বউমা—শিগগির এস এখনই আমাদের হাসপাতালে যেতে হবে যে। একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া কল্যাণীকে গাড়িতে উঠাইয়া নিজে ড্রাইভারের পাশে বসিয়া মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে জোরে চালাইতে বলিয়া অমিয় দুই চোখ বুঁজিয়া মনে মনে ভগবানের পায়ে শুধু মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

পাশাপাশি আট-দশটি বেডে আট-দশটি ছেলে শুইয়াছিল—তাহাদের অনেকেই অজয়ের চেয়ে বয়সে বড়—কেহ বা তাহার

সমবয়সী। অমিয় অজয়ের পাশে বসিয়া ডাকিলেন—জ্যাঠামণি! কল্যাণী ডাকিল—অঞ্জু বাবা!

কিন্তু অজয়ের তখন ভাল করিয়া জ্ঞান ছিল না। সে বড় বড় করিয়া দুই একবার উদ্দেশ্যহীন ভাবে চাহিয়া পুনরায় চোখ বুঁজিল। পাশের নার্সটি মাথায় আইস-ব্যাগ ধরিয়াছিল—কথা বলিতে নিষেধ করিল। হাউস সার্জন আসিয়া জানাইয়া গেলেন—বিশেষ ভয়ের কারণ নাই—মাথায় আঘাত লাগিয়া এমনি হইয়াছে—সকাল পর্যন্ত অনেকটা ভাল হইয়া যাইবে। অজয়ের মাথার একপাশ খানিকটা কাটিয়া গিয়াছিল। অন্যান্য বেডের ছাত্রদেরও আত্মীয়স্বজন কেহ কেহ ইতিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জন দুই বয়স্ক ছাত্রের—সম্ভবতঃ তাহারা কলেজে পড়ে—একজনের হাত ও একজনের পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। জন তিনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সারারাত্রি নিদ্রাহীন চোখে এই আহত ছেলেদের ভিতরে বসিয়া বসিয়া অমিয়র মাথায় নানা চিন্তা আসিয়া বাসা বাঁধিতে লাগিল। বিলাত হইতে কোন্ মহামান্য অতিথি বোম্বাইয়ে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছেন—আর ইহারা কয়েক শত মাইল দূরে এই কলিকাতা শহরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই যে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল—তাহা কি এমনি নির্মমভাবে দমন করা একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল? এই বিক্ষোভ ও আজিকার সারাদিন ধরিয়া শহরে যে হরতাল চলিতেছিল তাহার ভালমন্দ বিচার না করিয়াও তাঁহার বারে বারে শুধু এই কথাই মনে হইতেছিল—কাহাকেও আঘাত করে নাই—অহিংসা যাহাদের মূলমন্ত্র সেই নিরীহ শোভাযাত্রীদের উপরে এমন নির্মম আঘাত হানিবার কি কারণ থাকিতে পারে? জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা তিনি ভাল করিয়াই কাগজে পড়িয়াছিলেন—সেই স্মৃতি তাঁহার মনে আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নির্মমতার নিদর্শন অতি বিরল—হয় তো অনুরূপ ঘটনা একটিও আর পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা একের পর এক উল্টাইয়াও বাহির করা যায় না। তবে ইহাই কি নিয়ম? পরাধীন

জাতির অদৃষ্টে এমনই কি জুটিয়া থাকে? অমিয় যতবার এইসব ভাবিতে লাগিলেন—ততবারই আপনার মনে ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাইলেন না। রাজনীতি তিনি বুঝেন না—তাহার স্বরূপও তাঁহার জানা নাই তবু ইহা যে মানুষের নীতি নয়—ইহা তাঁহার মন নিশ্চয় করিয়া জানাইয়া দিল। তাঁহার দুর্বল মন—মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্বলতার সমস্ত ছদ্ম আবরণ একেবারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। উত্তেজনায় তাঁহার সারা দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বারে বারে শুধু মনে হইতে লাগিল—এতদিন তবে যাহা করিয়াছেন, তাহা ভুল, যে শ্রদ্ধার মূর্ত্তি অন্তরে ধারণ করিয়াছেন—সে তাহার ছদ্মরূপ মাত্র—সত্যকার রূপ আজ এই তাঁহার চারিপাশে আহতদের ভিতরে প্রকট! যুক্তি এখানে অচল। শোষণনীতির ভিতরে ধর্ম্ম নীতির অন্বেষণ পণ্ডশ্রম মাত্র।

দিন দশেকের মধ্যে অজয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই দশদিন অমিয় অফিসে যান নাই। দিন রাত্রি অজয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছেন। আজ বেলা গোটা তিনেকের সময় যখন তিনি অফিস হইতে বাহির হইলেন—তখন বাহিরের আকাশ বাতাস আলো সব যেন নূতন করিয়া তাঁহার চোখে ধরা পড়িল—মুক্ত আকাশতলে যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাঁচিলেন। আজ এইমাত্র তিনি অফিসে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মন বারে বারে বলিতে লাগিল—এ ভাল হইল—বেশ হইল! আজ এই দুই মাস ধরিয়া যে দ্বন্দ্ব তাঁহার অন্তরে চলিতেছিল—তাহাতে তিনি জয়ী হইয়াছেন—প্রলোভনকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অমিয় কখন গড়েরমাঠে আসিয়া ঢুকিয়াছেন—সে খেয়াল তাঁহার ছিল না! আজ মনুমেণ্টের নীচে একটি সভা ছিল। দলে দলে শত শত হাজার হাজার লোক সেখানে আসিয়া জমা হইতেছে। অমিয় আজ কাগজে দেখিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি এখানে বক্তৃতা করিবেন। সমগ্র কলিকাতা

শহরের লোক যেন—গড়েরমাঠে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অতি অভূতপূর্ব উন্মাদনা—এ কি প্রচণ্ড উল্লাস—সমগ্র জনসমাজকে যেন কোন্ দুর্নিবার আকর্ষণে জোয়ারের জলের মতো গড়েরমাঠে টানিয়া আনিতেছে। ছাত্র আছে, যুবক আছে, বৃদ্ধ আছে, কুলী, কেরাণীর ভেদাভেদ নাই—হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, মাড়োয়ারী সমভাবে আসিয়া একই স্থানে মিলিত হইতেছে!

এ যেন—"বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।"

একপাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে অমিয়ের অন্তর একেবার উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন—সেই বক্তৃতার প্রতিটি বাণী তাঁহার দুই কানের পরদা ভেদ করিয়া একেবারে যেন মর্মে গিয়া বিঁধিতেছিল। যখন বাড়ি ফিরিতেছিলেন তখনও তাঁহার মনে অসহযোগ, অহিংসা, ত্যাগ, চরকা এই সব কথাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া একের পর এক জাগিয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া কল্যাণীর ঘরের কাছে গিয়া ডাকিলেন—বউমা! কল্যাণী একপাশে আসিয়া দাঁড়াইলে বলিতে লাগিলেন—আজ চাকরী আমি ছেড়ে দিয়ে এলাম বউমা।

কল্যাণী আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—ছেড়ে দিয়ে এলেন?

—হাঁ।

—কিন্তু হঠাৎ কি কারণ হলো—আর বছর দুই পরে যে পেন্‌সনের সময় হোত?

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—কারণ? কারণ তো এক কথায় তোমাকে সব বোঝাতে পারবো না বউমা! আর পেন্‌সনের কথা? সে তো আমি ভাল করে বুঝেই সব করেছি—টাকার লোভ আর আমার নাই বউমা! যে টাকা এতদিন ধরে চাকরী করে রোজগার

করেছি—তাতেই আমার বাকী জীবনটা চলে যাবে—তোমাদেরও হয়তো খুব শিগগির কষ্টে পড়তে হবে না। কিন্তু যার জন্যে সঞ্চয় সেই যে চায় না টাকা। তুমি তো জান আমি স্নেহের কাঙাল—টাকার নয়। আমার অঞ্জুমণিই যদি আমাকে চাকরীর জন্যে শ্রদ্ধা করতে না পারে—তবে কি হবে সে টাকা দিয়ে বলতো? কল্যাণী জবাব দিল—কিন্তু অতটুকু ছেলে, তারই কথায় আপনি অত বড় চাকরী ছেড়ে এলেন?

অমিয় পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—ছেলে অতটুকু বউমা, কিন্তু ব্যাপারটি তো অতটুকু নয়—অঞ্জু ছাড়া আমার আর কে আছে বলতো? আর এইই শুধু আজ একমাত্র কারণ নয়। অঞ্জুই আমার চোখ ফুটিয়েছে। সেদিন হাসপাতালে সারারাত্রি ধরে বসে বসে এই চিন্তাই আমি অনবরত করেছিলাম—তারপর এই কয়দিন ধরেও কম ভাবিনি। জীবনটা এখন থেকে আমার অন্যপথে চালিয়ে নিতে চেষ্টা করবো। আমি ভীতু মানুষ, আমি নিতান্ত সংসারী মানুষ—কিন্তু আজ তোমায় আমি সত্যি করে বলছি বউমা—ভয় আর আমার নাই—অর্থের মোহ আর আমার নাই—আমি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেব।

কল্যাণী বিস্ময় ও আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কিন্তু পুলিশে দলে দলে লোক ধরে জেলে দিচ্ছে যে!

অমিয় তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন—হয়তো আমার অদৃষ্টেও অন্যথা হবে না বউমা! কিন্তু তোমাদের ব্যবস্থা আমি করে যাবো—সেদিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কল্যাণী পুনরায় বলিল—আপনার যে শরীর—যে স্বাস্থ্য।

কিন্তু অমিয় কোন জবাব না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। অজয় এতক্ষণ ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল—হঠাৎ একেবারে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া অমিয়কে জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি চাকরী ছেড়ে দিয়েছো জ্যাঠামণি!

অমিয় তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—হাঁ রে, তুই খুশি হয়েছিস তো অঞ্জু?

অঞ্জু মাথা হেলাইয়া জানাইল—সে খুব খুশি হইয়াছে।

—আমি যদি জেলে যাই, তুই কাঁদবি না তো?

অজয় খানিকটা কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—কান্না আমার পাবে জ্যাঠামণি। কিন্তু ভাল কাজে তো চোখের জল ফেলতে নাই! সবাইকে আমি বুক ফুলিয়ে বলবো—আমার জ্যাঠামণি যে সে লোক নয়—কত বড় চাকরী তিনি ছেড়েছেন—দেশের জন্য জেলে গেছেন। আবার যখন তুমি ফিরে আসবে জ্যাঠামণি—তোমার কোলের মধ্যে বসে বুক আমার আনন্দে ফুলে উঠবে যে!

অমিয় আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে অজয়ের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

মাস খানেকের ভিতরে চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় নেতাদের সহিত অমিয়র পরিচয় হইয়া গেল। স্থির হইল তিনি গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন। গ্রামে নিজেদের বাড়ীতে একটি আশ্রম করিয়া সেখানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তাঁত ও চরকা প্রচলন প্রভৃতি করিতে হইবে। কলিকাতায় তখন "গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন" নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহারই অধীনে বাঙলার সর্বত্র স্কুল কলেজ খোলা হইতেছে। কলিকাতা হইতে আর ও জন তিনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি অমিয়র আশ্রমে যোগ দিবেন ঠিক হইল। কল্যাণী ভাসুরের কোন কাজের প্রতিবাদ করে নাই। সমস্তই নীরবে সমর্থন করিয়া চলিয়াছে। অজয় যাত্রার পাঁচ ছয় দিন পূর্বেই মহাউৎসাহে সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যে ইস্কুল "গোলামখানা" যেখানে শুধু ইংরাজের খেয়ালখুশী মত তাহাদের ভাষা, তাহাদের আচার

ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে আর তাহাকে পড়িতে হইবে না। গ্রাম সে কখনো দেখে নাই—তাহার মার নিকট সে কত গল্প শুনিয়াছে। মনে মনে কত তাহার ছবি আঁকিয়াছে—নদী গাছপালা, মাঠ—মাঠ ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। তাহার নিজের গ্রাম—নিজের জন্মমাটি!

জ্যাঠামণি বলেন—গ্রামই তো দেশের আসল রূপ—গ্রামের উন্নতি না হইলে স্বরাজ আসিবে না! কলিকাতা হইতে ডাঃ রায়, অধ্যাপক বসু যাইবেন, আর যাইবেন নামকরা লেখক জ্যোতির্ময় দত্ত। উঃ কত বড় বড় লোক ইঁহারা সকলে। সে দেশের কাজ করিবে—অবসর সময়ে ইঁহাদের নিকট লেখাপড়া করিবে। আর সে কি যা তা লেখাপড়া? সেকালের মুনিঋষির আশ্রমের মতো—গুরুর কাছে বসিয়া বসিয়া সে সর্বপ্রকারের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইবে। সংস্কৃত ভাল করিয়া পড়িবে। আচ্ছা গেরুয়া রঙে কাপড় ছোপাইয়া লইয়া পড়িলে—মাথায় স্বামী বিবেকানন্দের মত পাগড়ী বাঁধিলে কেমন হয়? পাগড়ী বাঁধিবে কি মাথায় গান্ধী টুপি দিবে এ লইয়া তাহার মনে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়। এমনি করিয়াই রাতদিন নানা চিন্তা অজয়ের মাথায় খেলিতে থাকে। কিছুদিন ধরিয়া কাত্যায়নী দেবী বাড়ী আসিয়া বাস করিতেছিলেন। দুই বাড়ীতে খান-তিনেক ঘর এখনও কোন প্রকারে টিকিয়া ছিল। সেইগুলি সংস্কার করিয়া লইয়া এবং আরও দুই একখানা নূতন করিয়া তুলিয়া আশ্রমের কাজ চালান হইবে ঠিক হইল। অজয় গ্রামে আসিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। এতদিন সে এক পাও বাহিরে যায় নাই। গ্রাম যে এত সুন্দর তাহা তো সে জানিত না। এত ফাঁকা জায়গা—যেখান সেখান হইতে তাকাইলেই—প্রত্যেক দিকের আকাশের একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত চোখে পড়ে। কলিকাতার বাসায় এতটুকু হাওয়ার জন্য তাহারা কত সময় জানালার পাশে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিয়াছে—আশেপাশের বাড়ীগুলার ফাঁক দিয়া কোনক্রমে একটু হাওয়া ঘরে ঢুকিলে, তাহার মন উল্লাসে ভরিয়া

উঠিয়াছে। আর এযেন আলো ও হাওয়ার সমুদ্র—কোন বাধা নাই—বন্ধ নাই। আলোবাতাসের জন্য পথ চাহিয়া থাকিতে হয়, ইহা এখানকার লোকে ভাবিতেই পারে না। সারা গ্রামময় কত গাছ—আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল আরও কত সব। অজয় সবগুলির নামও জানে না। বাড়ীর সম্মুখে নদী—মানুষ অবাধে এখানে স্নান করে, সাঁতার কাটে। অজয় সাঁতার দিতে জানে না—গাছে চড়িতে পারে না। সে মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিল, এই সবই তাহাকে শিখিয়া লইতে হইবে। মাস খানেকের মধ্যে বাড়ীঘর সংস্কার করিয়া লওয়া হইল। কলিকাতা হইতে ডাঃ রায়, অধ্যাপক বসু এবং সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় দত্ত আসিয়া পৌছিলেন। ইতিপূর্বেই এই অঞ্চলে আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছিল—এখন রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে বিদ্যালয় বসিল। পঁচিশ ত্রিশটি ছেলে ইহারই মধ্যে জুটিয়া গিয়াছে—তাহারা লেখাপড়া করিবে, চরকা কাটিবে—তাঁত বোনা শিখিবে। ইহাদের ভিতরে যাহারা একটু বয়স্ক, দরকার হইলে আন্দোলনের অন্যান্য কাজও তাহারা করিবে। ইহা ছাড়া নানা স্থান হইতে আরও বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ হইতে লাগিল। নিকটবর্তী মহকুমা সহরটিতে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য অন্য একটি ক্যাম্প করা হইল—সেখান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটিং করিবে। স্বদেশী জিনিসের প্রচার করিবে ইত্যাদি কর্মপ্রণালী স্থির হইল। আজ বৈকালে অমিয়র নিজেদের গ্রাম সোনাতলায় খুব বড় একটি সভা হইবে বলিয়া প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর হইতেই দলে দলে হিন্দু মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক সোনাতলার দিকে আসিতেছিল। সভায় বসিয়া এই জনসমাগমের কথা চিন্তা করিয়া অমিয়র বুক আনন্দে ও গর্বে ফুলিয়া উঠিল। সভা আরম্ভের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনজন ভদ্রবেশী মুসলমান আসিয়া সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের ভিতরে একজনকে অমিয় চিনিতেন—তিনি জামালপুরের লতিফ মিঞা—তাঁহাদের মহকুমা সহরের

উকিল। লতিফ মিঞা অন্য দুইজনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অন্য দুইজনের আর একজনও উকিল এবং একজন এ অঞ্চলের বিশেষ নামকরা তালুকদার। লতিফ মিঞা জানাইলেন—তাঁহারা আর ওকালতী করিবেন না—তিনজনেই আন্দোলনে যোগ দিবেন। অমিয় একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের মত নাম করা মুসলমান আন্দোলনে যোগ দিলে, আর ভাবনা কি—দুই দিনেই সমস্ত মুসলমান সমাজ কংগ্রেসে আসিয়া পড়িবে না! অমিয় তাঁহাদের সহিত ভাবের আবেগে কোলাকুলি করিয়া লইয়া—কলিকাতার বন্ধুদের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। সভা সেদিন খুব জমিয়া উঠিল—ডাঃ রায়, অধ্যাপক বসু, জ্যোতির্ময় দত্ত ও অমিয় বক্তৃতা দিলেন। লতিফ মিঞা খেলাফৎ আন্দোলনের কথা মুসলমানদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—বিলাতী কাপড় আর লবণ বর্জন করিতে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত সভার লোক যেন একেবারে মাতিয়া উঠিল। মুহুর্মুহুঃ সেই জনতা বন্দে মাতরম্, আল্লা হো আকবর, মহাত্মা গান্ধীকি জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। অক্ষয় এবারও আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। পরের দিন বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চাঁদার খাতা লইয়া অমিয় গ্রামে বাহির হইলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

আশ্রমের কাজ লইয়া অমিয় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সব কাজ যত সহজ মনে হইয়াছিল—এখন কাজের বেলায় তাহার ভিতরে নানা গলদ দেখা দিতে লাগিল। চরকায় যে সূতা হইতে লাগিল—তাহার পাক ঠিক হয় না—বুনাইবার সময় বারে বারে ছিঁড়িয়া গিয়া বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে। অনেক সময় মিলের সূতা মিশাইয়া তবে কাজ চালাইতে হয়। এই কয়টি মাসের মধ্যে ছাত্রদের লেখাপড়া একটুও অগ্রসর হয় নাই। স্থানে স্থানে সভা-

সমিতি করিতে, আশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে এবং মাঝে মাঝে মহকুমা শহরটির ভলাণ্টিয়ার ক্যাম্পে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেই অমিয়র সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত। এমনি সময় হঠাৎ চা-বাগান হইতে ফেরত কুলীদের লইয়া চাঁদপুরে ভীষণ গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল এবং তাহারই ঢেউ আসিয়া গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছিল। কয়েকদিন ধরিয়া অমিয়র নিকট গোয়ালন্দ যাইবার জন্য সংবাদ আসিতেছিল। সেদিন সংবাদ আসিল, চাঁদপুরে কুলীদের উপরে ভীষণ অত্যাচার হইতেছে—লাঠিচার্জ ও সঙ্গীনের খোঁচায় তাহাদিগকে দলে দলে আহত করা হইয়াছে; সুতরাং গোয়ালন্দেও কিছু করা দরকার। দুই-একদিনের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আসিয়া গোয়ালন্দে পৌঁছিবেন। কলিকাতা হইতে স্বামীজী আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন—আরও লোকের দরকার। সুতরাং অমিয়কে আর বিলম্ব না করিয়া রওনা হইতে হইল—ডাঃ রায় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। গোয়ালন্দে পৌঁছিয়া সমস্ত খবর শুনিয়া তাঁহারা একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। কোন্ মন্ত্রবলে মহাত্মা গান্ধীর ডাক চা-বাগানে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহারই ফলে দলে দলে হাজার হাজার কুলি চা-বাগান ছাড়িয়া নিজেদের দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছে। সাহেবদের চাকুরী তাহারা করিবে না—গান্ধী মহারাজের আদেশ আসিয়াছে। কেমন করিয়া এই বাণী সেই দূরতম প্রদেশে পৌঁছিয়া একেবারে বাগানের পর বাগানের কুলীদের এক মুহূর্তে হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে এমনি পাগল করিয়া—চাকুরী ছাড়িয়া টানিয়া আনিল! কোন বিপদ-আপদের কথা তাহাদের মনে জাগিল না—পথের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবিল না। যে যাহার স্বল্পমাত্র সম্বল লইয়া—স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। এমনি করিয়া হাজারে হাজারে যখন চাঁদপুরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়িল। সাংঘাতিক কথা তো! এমনি হইলে সমস্ত চা-বাগান যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং আরম্ভ হইল কুলীদের উপরে অকথ্য নির্যাতন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মহকুমা হাকিম, পুলিশের কর্তারা দল বাঁধিয়া আসিয়া কুলীদের বুঝাইতে লাগিলেন—ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কেহ তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিল না—সকলেই মুখে গান্ধী মহারাজ কী জয় ধ্বনি করিয়া স্টীমারে চড়িয়া গোয়ালন্দ অভিমুখে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় স্টীমার ঘিরিয়া রাখিলেন—তাহাদের কাহাকেও আর স্টীমারে উঠিতে দিলেন না। দিনের পর দিন কুলীরা চাঁদপুরের সেই জাহাজের ঘাটে পড়িয়া পড়িয়া পচিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের দল আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমনি করিয়া তাহাদের সংখ্যা দশ হাজারের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্য দিয়া লাঠিচার্জ ও সঙ্গীনের খোঁচায় অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সেই নিরক্ষর কুলীর দল অনাহারে, অর্ধাহারে লাঠি ও সঙ্গীনের আঘাত সহিয়া তেমনি করিয়াই চাঁদপুরে পড়িয়া রহিল—একজনও পুনরায় চা-বাগানে ফিরিয়া গেল না। এমনি সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইহাদের ভিতরে আসিয়া পড়িয়া তাহাদের আহারের, রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। জনৈক স্বামীজী পূর্বেই গোয়ালন্দে আসিয়া স্টীমারের ও রেলের কুলি এবং স্টীমারের সাংেং-সুখানীদের ভিতরে আন্দোলন করিতেছিলেন। আজ অমিয় ও ডাঃ রায় এখানে পৌঁছিলে পুনরায় তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নির্দেশ পাঠাইয়াছেন, গোয়ালন্দের সমস্ত কুলীদের ধর্মঘট করাইয়া সমস্ত স্টীমার বন্ধ করিয়া দাও এবং তিনি নিজেও এই উদ্দেশ্যে গোয়ালন্দে আসিতেছেন।

পরের দিন দেশবন্ধু গোয়ালন্দে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকাল বেলা গোয়ালন্দের চরে সভা বসিল। সেই বারশত কুলি দেশবন্ধুর বক্তৃতায় একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। যদুনন্দন মিশির, কুলির সর্দার—সভার পরে তাহাকে লইয়া আলোচনা হইল—ঠিক হইল

আগামীকল্য হইতে কোন কুলি কোন প্রকার মাল বহন করিবে না। স্টীমারের প্রায় সমস্ত সারেং-সুখানীরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিতে স্বীকৃত হইল। আগামীকল্য হইতে যে স্টীমার চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু এই যে বারশত কুলি—"যাহারা দিন আনে দিন খায়"—তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিবে! ধর্মঘট যে কতদিনে শেষ হইবে তাহারও তো কোন স্থিরতা নাই। ঠিক হইল—এই বারশত কুলিকে কংগ্রেসই প্রত্যহ খাদ্য যোগাইবে। দেশবন্ধু জানাইলেন—কলিকাতা হইতে সমস্ত খরচের ব্যবস্থা তিনি করিবেন। সেই দিনই রাত্রে স্বামীজী এবং অমিয়র উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দেশবন্ধু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গোয়ালন্দের সেই চরের উপরে চাটাই দিয়া ছাউনি করিয়া বারশ লোকের আহারের স্থান, রান্নার স্থান করা হইল। পরের দিন হইতে প্রত্যহ দুইবেলা সমস্ত লোকের আহারের ব্যবস্থা সেখান হইতেই করা হইতে লাগিল। স্টীমারে কেহ আর মাল তুলে না—নামায় না। সারেং-সুখানীরা স্টীমার ছাড়িয়াছে—কুলিরা কয়লা তুলে না—স্টীমার চলিবে কি করিয়া? কোন সময় হয়তো দেখা যাইত স্টীমারের ক্যাপ্টেন দোতালায় দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টিতে পাড়ের দিকে তাকাইয়া আছে—কুলিরা দল বাঁধিয়া ঘাটের পাশে পাশে বসিয়া জটলা করিতেছে—একজনও কাজে যাইতেছে না। সেই দলের ভিতর হইতে কেহ কেহ সাহেবের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেছে না। কোন কোন সময় সাহেবেরা নিজেরাই আসিয়া নোঙর তুলিতেছে—নিজেরাই কোনক্রমে স্টীমার ওপারের চরের পাশে লইয়া গিয়া নোঙর করিতেছে। সাহেবদের ভিতরে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—এই বারশ লোক না জানি কোন সময় ক্ষেপিয়া উঠে—না জানি কখন তাহাদের স্টীমারে ঢুকিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া যায়।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। দুই একদিন পর পর চাঁদপুর হইতে সেখানকার সমস্ত খবর আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

সেখানে দশ হাজারের উপরে কুলি আসিয়া জমিয়াছে। সেই সমস্ত কুলিদের জন্য সেনগুপ্ত তাঁহার যাহা কিছু সমস্ত বিলাইতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ দশ হাজার লোকের সমস্ত খরচ বহন করা তো কথার কথা নয়। জমিদারী তাঁহার বিক্রয় হইতে বসিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সাহায্য সেখানে পৌঁছিত, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র। এমনি করিয়া মাস-খানেক কাটিয়া গেল—ধর্মঘট তেমনি চলিতেই লাগিল। কিন্তু এমনি করিয়া আর কতদিন চলিবে? চাঁদপুরের চা বাগানের কুলিদের ভিতরে কলেরা দেখা দিল—প্রত্যহ দুই চারিটি করিয়া মরিতে লাগিল। অবস্থা তখন সত্যই উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে এতদিনে সেনগুপ্ত তাঁহার যথাসর্বস্ব প্রায় নিঃশেষ করিয়া ইহাদের পিছনে ঢালিয়া দিয়াছেন, ইহার পর কি হইবে? কোথা হইতে অর্থ আসিবে—ইহাই এক ভয়ানক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় কোন সদাশয় জমিদারের সহায়তায় কয়েকখানি দেশী কোম্পানীর জাহাজ মিলিল—তাহাতে করিয়াই অবশেষে প্রত্যহ কুলিদের গোয়ালন্দঘাটে আনিবার ব্যবস্থা হইল। সেদিন প্রথম দুইখানা জাহাজ কুলি বোঝাই করিয়া গোয়ালন্দে আসিয়া ভিড়িল। দলে দলে এই সব কুলিরা যখন স্টীমার হইতে নামিয়া—সার বাঁধিয়া তীরে উঠিয়া আসিতেছিল—অমিয় তখন ঘাটের এক পাশে দাঁড়াইয়া দুই চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত স্থানে দিনের পর দিন কাটাইয়া, অনাহারে, অর্ধাহারে থাকিয়া রোগে ভুগিয়া কি ইহাদের চেহারা হইয়াছে! ইহারা কি মানুষ নয়! ইহাদের কি ইচ্ছার এতটুকু স্বাধীনতাও নাই! কাজ করিবে না—নিজের দেশে ফিরিয়া যাইবে—ইহাই কি এত বড় অপরাধ, যাহার জন্য এমনি অমানুষিকভাবে ইহাদের গতিরোধ করিতে হইবে—সৈন্য ও পুলিশ লেলাইয়া দিয়া এমনি করিয়া পশুর মত প্রহার করিতে হইবে। অমিয়র বুক ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ইহাই তাহার দেশ—

ইহারাই তাহার দেশের লোক। প্রত্যহ এমনি করিয়া হাজার খানেক লোক আসিতে লাগিল। তাহাদের আহার করাইয়া—গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হইত। যদি কেহ অসুস্থ হইত, তাহাকে গোয়ালন্দে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। দুই একটি করিয়া কলেরা তখনও ইহাদের ভিতরে দেখা দিতেছিল। কোন দিন হয়তো জাহাজের মধ্যেই দুই একজন মরিয়া থাকিত। মৃত-দেহগুলি নামাইয়া আনিয়া সেগুলি পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও স্বেচ্ছাসেবকদেরই করিতে হইত। এমনি ধারা নানা কাজে সারা দিন রাত্রি অমিয়র একটুও অবসর থাকিত না। স্টীমার ঘাটে ভিড়িলে অমিয় প্রত্যহ ঘাটের পাশের মাটির ঢিবির উপরে দাঁড়াইয়া তাকাইয়া থাকিতেন। কখনও স্বামী স্ত্রীর হাত ধরিয়া চলিয়াছে—কখনও মেয়েরা কাপড় দিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া ঘাটের দিকে চলিয়াছে। সঙ্গে হয়তো মাত্র দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁটুলী—দুই একটি মাদুর, দুই একটি মাটির পাত্র বা ক্যানাস্তারার খালি টীন। এমনি স্বল্প মাত্র সম্বল তাহাদের—ইহা লইয়াই তাহারা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সেদিন সমস্ত যাত্রী নামিয়া যাইবার পর, একটি স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া অমিয়কে সংবাদ দিল—একটি ছোট ছেলে স্টীমারের ভিতরে মরিয়া রহিয়াছে। অমিয় তাড়াতাড়ি স্টীমারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেটির বয়স তিন চার বৎসরের বেশী নয়। মৃত্যুর পূর্বে এ ছেলেটির কিন্তু দিব্যি ভাল স্বাস্থ্য ছিল—নিকষ কাল রঙএর পাথরের উপরে কে যেন তাহার মূর্তিখানি কুঁদাইয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। ছেলেটির সম্ভবত কলেরায় মৃত্যু হয় নাই—হয়তো স্টীমারের ভিতরেই হঠাৎ কোন খারাপ ধরণের জ্বর হইয়াছিল—হয়তো অজ্ঞ পিতামাতা ভয়ে মাথায় এক ফোঁটা জলও দেয় নাই—মাথায় রক্ত উঠিয়া তাহারই ফলে মৃত্যু হইয়াছে। ছেলেটির শরীরের কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই—সে যেন চুপ করিয়া খানকয়েক ছেঁড়া

ন্যাকড়ার বিছানা সম্বল করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া যাইতেছে। ছেলেটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অমিয়র চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। জন দুই স্বেচ্ছাসেবক ধীরে ধীরে একটা ঝুড়ির ভিতরে ছেলেটিকে তুলিয়া লইল। ছেলেটিকে ঝুড়ির ভিতরে তুলিবার সময় তাহার ছেঁড়া ন্যাকড়ার বিছানার ভিতর হইতে কি যেন একটা স্টীমারের মেঝের উপরে পড়িয়া ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। অমিয় সেদিকে তাকাইয়া দেখেন, একটি কাঠের রং-করা ঘোড়া। ঘোড়াটি ছেলেটির হয়তো কত না আদরের বস্তু ছিল—তাই তাহারই শেষ শয্যাপার্শ্বে ঘোড়াটিকে বাপ-মা রাখিয়া গিয়াছে। অমিয় ঘোড়াটিকে নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। ছেলেটিকে ঝুড়িতে করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যখন তাঁহারা পদ্মার তীর ধরিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন—তখন বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে। আজ যে সমস্ত কুলি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তখন তাহাদের আহার করাইয়া ট্রেনে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারই শেষ ট্রেণটি এইমাত্র গোয়ালন্দ ঘাট ছাড়িয়া গেল। চরের উপরে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই ট্রেণটির দিকে তাকাইয়া অমিয়র মনে হইল—এই গাড়িতেই হয়তো ছেলেটির হতভাগ্য পিতামাতা চলিয়াছে। যে সন্তানকে এতদিন তাহারা প্রাণাধিক জ্ঞান করিত—আজ অবস্থার ফেরে পড়িয়া সেই প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃতদেহকেও এমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে পলাইতে হইতেছে। মাইলখানেক আসিয়া যেখানে তাঁহারা পৌঁছিলেন—সেখানে আর বালির চড়া নয়—এখানে নদীর জল হইতে পাড় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত উচ্চ। গত বর্ষায় এখানে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছিল—তাই স্থানে স্থানে এক একটি একশ দেড়শ হাত লম্বা ও পঞ্চাশ ষাট হাত চওড়া মাটির চাপ নদীর দিকে খানিকটা হেলিয়া তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সম্ভবত আগামী বর্ষা না আসা পর্যন্ত আর এগুলি নদীর জলে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। মুল ভূমি ও চাপগুলির মধ্যে একহাত দেড়-হাত করিয়া এক একটি ফাটল একেবারে দশ বার হাত নিচের দিকে

নামিয়া গিয়াছে। এইসব ফাটলের দিকে তাকাইলে ভয় হয়—মনে হয় চাপগুলি এখনই বা হুড়মুড় করিয়া নদীর ভিতরে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এমনি একটি ফাটল বাছিয়া লইয়া তাহারই ভিতরে ধীরে ধীরে ছেলেটিকে আট দশ হাত নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল। অমিয় তখনও সেই কাঠের ঘোড়াটি হাতে করিয়া ধরিয়াছিলেন—ধীরে ধীরে সেটিকেও ছেলেটির কাছে নামাইয়া দিলেন। তারপর কোদালী দিয়া মাটি কাটিয়া ফাটলটি বন্ধ করিয়া দিয়া যখন তাঁহারা ফিরিয়া চলিলেন—তখন সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। নদীর জলে একটা কাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দূরের মাঠে একটা গাভী হাম্বা হাম্বা করিয়া অবিরত ডাকিয়া চলিয়াছিল—হয়তো বাছুরটি তাহার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। অমিয়র মন এই আবেষ্টনীতে এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। যে ছেলেটিকে এইমাত্র মাটি চাপা দিয়া আসিলেন—তাহার স্মৃতিই তাঁহার সারা অন্তর একেবারে চাপিয়া ধরিয়াছে। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া বারে বারে নানা চিন্তা তাঁহার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।—কেন এমন হয়?—কেন এমন হইল?—কে দায়ী? অমিয়র কোমল ও সংযত মনও আজ বারে বারে বিদ্রোহ করিতে লাগিল—ইহা অন্যায়, ইহা অবিচার—ইহা আর যাই হোক মানুষের কাজ নয়! পদ্মার শীতল জলে স্নান করিয়া যখন তিনি ক্যাম্পে পৌঁছিলেন—তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

আজ স্টীমারে করিয়া শেষ কুলির দল আসিয়া পৌঁছিল। ইহাদের আহার করাইয়া ট্রেনে তুলিয়া দিয়া অমিয় সন্ধ্যার পূর্বে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাল হইতে আর গোয়ালন্দে কোন কাজ নাই। আবার এখানকার কুলিরা কাজে

যোগ দিবে, কারণ ধর্মঘটের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি কাজের নির্দেশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে—আগামী পরশু যুবরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাই সর্বত্র হরতাল করিয়া, শোভাযাত্রা করিয়া অত্যাচারিত ভারত, নির্যাতিত ভারত তাহার প্রতিবাদ জানাইবে। ঠিক হইয়াছে, আগামীকল্য তাঁহারা এখানে বিশ্রাম করিয়া পরশু সকালে মহকুমা শহরটিতে পৌঁছিয়া সর্বত্র হরতাল করাইবেন। কেমন করিয়া কি করিবেন, তাহাই এতক্ষণ বালির চড়ার উপরে বসিয়া বসিয়া অমিয় ভাবিতে-ছিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে কুলির সর্দার যদুনন্দন মিশির আসিয়া ডাকিল—অমিয়বাবু!

অমিয় তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কি মিশিরজী!

যদুনন্দন তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—কালকের দিনটা পরে তো সব চলে যাচ্ছেন এখান থেকে—আর হয়তো দেখাসাক্ষাৎ হবে না—তাই এলাম একবার দুটো কথা বলতে।

অমিয় বলিলেন—যেতে তো হবেই মিশিরজী, কিন্তু এই একটা মাসের উপরে এখানে আপনাদের ভিতরে থেকে গোয়ালন্দের উপরে মায়া বসে গেছে আমার—যাবার কথা হলে সত্যি দুঃখ হয়।

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু কি দিয়ে ধরে রাখবো আমরা আপনাদের?

অমিয় বলিলেন—ধরে রাখবার জিনিসের অভাব নাইতো মিশিরজী! আজ একটা মাস এখানে বাস করে আমার চোখ খুলেছে—চা-বাগানের কুলিরা, গোয়ালন্দ ঘাটের কুলিরা আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। আমি সত্যি করে বুঝেছি, এরাই আমার দেশের লোক। আর এই নিজের চোখেই তো দেখতে পেলাম—কত বড় এরা অসহায়—কত বড় নিরাশ্রয়!

মিশিরজী কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবু হয়তো আপনি এদের বিশেষ কিছুই জানেন না—জানলে স্থির থাকতে পারতেন না। চা-বাগানের কুলিদের কথা

শুনবেন? আপনারা ওদের পেট পুরে খাবার দিয়ে গাড়িতে চড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন—বেচারারা এবার দেশে ফিরে বাঁচবে। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল, তা জানলে এতটুকুও শান্তি পেতেন না। কি দেশে, কি বিদেশে ওরা সত্যি নিরাশ্রয়। চা-বাগানের যারা কুলি, তারা আসে বেশির ভাগ ছোটনাগপুর জেলা থেকে। ছোটনাগপুরের জঙ্গলে কুঁড়ে বেঁধে সেখানেই দিনের পর দিন ওরা বাস করে। পাহাড় খুঁড়ে—পাথর বেছে জমি তৈরি করে। জমিতে এক বুক গর্ত করে জল জমিয়ে রাখে, তাতেই ধান চাষ করে। যা অল্পসল্প ফসল হয়, তাই দিয়ে বনের ফল মূল দিয়ে—মহুয়া সিদ্ধ খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে। অবস্থা তাদের কোনদিনই ভাল ছিল না। কিন্তু তবু ইংরেজ কোম্পানী এদেশে আসার আগে—এদের সকলেরই কিছু কিছু জমি ছিল। কোম্পানী এদেশে এসে রেল খুললো—কয়লার খাদ খুললো—চা-বাগান তৈরি করলো—প্রচুর তার কুলির দরকার। কিন্তু কি শকুনির মত নজর এদের দেখেছেন বাবু—খুঁজে খুঁজে বের করে ফেললে ছোটনাগপুরের এই পাহাড়িয়া জাতিটাকে। কুলি ভাগানোর কোম্পানী তৈরি হল। তার এজেন্টরা প্রথমে ওঁরাও মুণ্ডা, সাঁওতালদের পাড়ায় ঘুরে পাঁচ টাকা, দশ টাকা করে কর্জ দিতে লাগলো। টাকা তারা কোন কালে শোধ দিতে পারবে না—তা এজেন্টরা জানতো। কিছুদিন পর টাকার জন্য চলতে লাগলো পীড়ন। অবশেষে যারা টাকা দিতে পারলে না—তাদের আরও দুই-চার টাকা দিয়ে তাদের জমিগুলো কোম্পানীর নামে লিখিয়ে নিলে। কোম্পানী সে জমি আবার মাড়োয়ারী, বেহারী, বাঙালী জমিদারদের কাছে বিক্রী করতে লাগলো। এমনি করে জমি তাদের সব কেড়ে নেওয়া হলো। তারপর চললো আড়কাঠির আনাগোনা—তারা প্রলোভন দেখালে—আসামের চা-বাগানের—সেখানে গেলে মোটা মাহিনায় চাকুরী মিলবে—পরম সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। নিজের দেশে ভূমিহীন হয়ে, নিরাশ্রয় হয়ে, অনাহারে আর কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য

করবে তারা? এলো সব দলে দলে বেরিয়ে—গেল সব চা-বাগানে।* কিন্তু কয়দিনেই ভুল এদের ভেঙে গেল—চা-বাগানের হিসেব করা পয়সা—খেয়ে-পরে কোন প্রকারে যাতে বেঁচে থাকতে পারে—এর বেশি তাদের কপালে জুটল না। যদি-বা কেউ কোন ফাঁকে কিছু জমায়—সে জন্যেও ব্যবস্থা করা হলো—সস্তা দামে বাগানে বাগানে দেশি মদের দোকান খুলে দেওয়া হলো—জমান তো দূরের কথা, ভাতের পয়সা মদে উড়ে যেতে লাগলো। এই এদের অবস্থা বাবু।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু তাহলে দেশে এরা ফিরে যাচ্ছে কিসের আশায় মিশিরজী?

মিশিরজী বলিলেন—ঠিক করে বলতে পারবো না বাবু। হয়তো ভেবেছে, যদি এমনি শুকিয়েই মরি—বিদেশে মরবো কেন—নিজের দেশে গিয়েই মরবো। আমি সত্যিই জানি বাবুজী—দেশে ওদের জন্য এতটুকু আশ্রয় নাই—কিছুমাত্র ভরসা নাই। ওদের ভবিষ্যৎ ভাবলে গা শিউরে ওঠে। এতো গেল চা-বাগানের কুলিদের কথা। কিন্তু এই যেসব স্টীমারের কুলি, রেলের কুলি দেখছেন—এরা সব বিহার থেকে এসেছে। আমি নিজে ছাপড়া জেলার লোক—আমার তো জানতে বাকি নাই—এরা ওদেশে কি অবস্থায় থাকে! এরা বেশীর ভাগ কৃষক—কিন্তু জমি এদের নাই। বাঙলা দেশে আমি কুড়ি বৎসর আছি বাবু—কিন্তু বাঙলা দেশে আর আমাদের দেশে তফাৎ কি জানেন—বাঙলা দেশের জমির তিনগুণ বেশি খাজনা দিতে হয় বেহারে। অথচ চাষের খরচ সেখানে অনেক বেশি——সার চাই—জল চাই—তবু ফসল সেখানে তেমন ভাল ফলে না। জমির খাজনা দিয়ে, চাষ করে কারুরই প্রায় চলে না—তাই জমিদার নেয় জমি নীলাম করে। আবার যাদের জমি নাই—তারা জমিদারের জমি ভাগে চাষ করে। এক মণ ফসল হলে চব্বিশ সের পাবে জমিদার, আর ষোল সের পাবে—যে রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজে, গায়ের রক্ত জল করে সারা বছর খেটেছে সে। তার পর সারের খরচ আছে—বীজের খরচ আছে। এই সব খরচ বাদে কি

যে চাষার লাভ থাকে, সে তো বুঝতেই পারছেন। দেশে পেট ভরে না—তাই তো ছুটে আসে বিদেশে। বিদেশীরা দেশের সর্বনাশ করেছে, তা মানি—কিন্তু তাই বলে নিজের দেশের এই জমিদাররাও তো দিনের পর দিন কম সর্বনাশ আমাদের করছে না বাবু! এর প্রতিকার করবে কে?

অমিয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—প্রতিকার এর হবে মিশিরজী। যে শক্তিকে আশ্রয় করে এই পরগাছার দল পুষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই শক্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগাছা সব কোথায় মিলিয়ে যাবে দেখবেন।

মিশিরজী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—সত্যি হবে বাবুজী? গান্ধী মহারাজ বলেছেন এই কথা!

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—বলেছেন বই কি মিশিরজী। দীন দুঃখীর ব্যথা যদি তাঁর প্রাণে না বাজতো—তাহলে কি এমনি করে সর্বস্ব ত্যাগ করে—নির্ভয়ে এত বড় কাজে হাত দিতে পারতেন?

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন—আমি নিজেও যে এই কুলিদের শোষণ করে কিছু টাকা-পয়সা না করেছি এমন নয়। কিন্তু টাকার আমার প্রয়োজন নাই—সংসারে আপনার বলতে কেউ নাই—এই কুলিদের আমি ভালবাসি। স্বরাজ মানে তো বুঝি না, সত্যি যদি স্বরাজ এলে এদের সুখ-সুবিধা ফিরে আসে—টাকা আমার সব স্বরাজের জন্যে বিলিয়ে দিতে রাজী আছি বাবু।

অমিয় একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মিশিরজীর পিঠে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন—মিশিরজী এই তো চাই ভাই—এই তো মানুষের মত কথা।

পরের দিন পূর্বাহ্ণেই সমস্ত সংবাদ পুলিশের নিকট পৌঁছিয়াছিল—তাই পরের দিন ট্রেণ স্টেশনে পৌঁছিবার বহু পূর্ব হইতেই স্টেশনের চারি ধার একেবারে পুলিশে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। অমিয় এবং স্বেচ্ছাসেবক দল ট্রেন হইতে নামিবামাত্র—অমিয়, ডাঃ রায়

এবং আরও পনরজনকে গ্রেপ্তার করিয়া সাব-জেলে লইয়া যাওয়া হইল। সমস্ত মহকুমা শহরটি উঠিল একেবারে চঞ্চল হইয়া। গোয়ালন্দে গিয়া এ-সংবাদ পৌঁছিল। পরের ট্রেনে মিশিরজী সমস্ত কুলি লইয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকাল বেলা বারশ' কুলি, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য লোক মিলিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সারা শহরের পথে পথে ঘুরিয়া বিক্ষোভ-ধ্বনিতে শহরটি কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অমিয়কে ডিস্ট্রিক্ট জেল ঘুরাইয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া আসা হইয়াছে। আন্দোলনে ভারতবর্ষময় যেন একটা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, দলে দলে নরনারী যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইয়াছে—তাহা অমিয় জানিতেন। কিন্তু তাহার শক্তি যে এত প্রচণ্ড, তাহা তো অমিয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই। নিজেদের ডিস্ট্রিক্ট জেল একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—আর তিলধারণের স্থান নাই। এখানে এই সেণ্ট্রাল জেলেও তিন হাজারের উপরে রাজনৈতিক বন্দীকে আনিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। সারা ভারতবর্ষময়ই এই অবস্থা। সারা দেশের হিসাব লইলে এই সংখ্যা কত লক্ষে দাঁড়াইবে কে জানে? বর্ষার বারিধারা যেমনি করিয়া বাঙলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে অলিতে-গলিতে ছড়াইয়া পড়ে—তেমনি করিয়াই এই মুক্তির ঢেউ সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এতদিনের পরাধীন ভারত, সুপ্ত ভারত কোন্ সঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণচঞ্চল হইয়া এমনি করিয়া জাগিয়া উঠিল! ইহা কি কম বিস্ময়! অমিয় নিজের জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে চাহিয়াও তো নিজেই এমনি বিস্মিত হইয়া যান। একালের বাঙালীর চিরাচরিত প্রথামত তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন। লক্ষ্য ছিল চাকুরী—চাকুরীও তিনি পাইয়াছিলেন। অর্থ উপার্জন

করিয়া ঘর-সংসার লইয়া নিতান্ত ভাল মানুষটির মত দিন তাঁহার একপ্রকার যাইতেছিল। কোন প্রকার হৈ-চৈ, কোন প্রকার গণ্ডগোলের ধার দিয়াও ঘেঁসেন নাই। অফিসের সাহেবকে দুই বেলা হৃষ্টমনে সেলাম ঠুকিয়াছেন—দরকার হইলে তোয়াজ করিয়াছেন—এতটুকু গ্লানিও তো কোনদিন তাঁহার মনে আসে নাই। তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। কি এক মায়ার প্রভাবে এই গভীর অন্ধকারের ভিতরেও আলো ফুটিয়া উঠিল—চিত্ত ভরিয়া জাগিয়া উঠিল নিজের দেশের সত্যকারের রূপ। অত্যাচারীর অত্যাচার চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়া গেল—দেশ-মাতৃকার মূর্তিতে হৃদয় তাঁহার শক্তিমান হইয়া উঠিল—তেজ ও বীর্যে অন্তর ভরিয়া উঠিল—নিজকে অসঙ্কোচে সঁপিয়া দিলেন তাঁরই পায়। সেই দিনের অমিয় আর আজিকার অমিয়ে কত না পার্থক্য!

সেদিন সকাল বেলা বরিশাল জেল হইতে একদল স্বেচ্ছাসেবককে এখানে লইয়া আসা হইয়াছিল। বিকাল বেলা অমিয় এই নূতন দলের সহিত পরিচয় করিবার জন্য তাঁহাদের ওয়ার্ডে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই-চারিজনের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া হঠাৎ একজনের মুখের উপরে অমিয়র দুই চক্ষু কতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এ যেন তাঁহার পরিচিত মুখ, অথচ কিছুতেই স্মরণে আনিতে পারিতেছেন না। যাঁহার মুখের দিকে এমনি করিয়া তাকাইয়া ছিলেন—তিনি কিন্তু এতক্ষণ কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। কিছুক্ষণ পরে অমিয় নিজের মনের সুপ্ত তলা হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। অমিয় তাঁহার নিকটে আগাইয়া গিয়া একেবারে একখানি হাত পিঠের উপরে রাখিয়া বলিলেন—রমেশ না?

রমেশ হঠাৎ মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ অভিভূতের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে অমিয় যে!

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—হাঁ ভাই, আমিই। কিন্তু একি বিস্ময় বলতো? শেষকালে তুমিও? রমেশ মুচকি হাসিয়া বলিলেন—দোষ কি?

—আরে, এ যে এক পরম বিস্ময়! মিঃ আর সি ব্যানার্জি, জেলা স্কুলের হেডমাস্টার, একেবারে পুরো সাহেব! চারশো টাকা মাইনে পেলেও যাঁর চলে না—সেই আর সি ব্যানার্জি আর এই রমেশে কত তফাৎ বলতো? রমেশ লজ্জিত মুখে বলিলেন—থাক ভাই, আর পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? ওসব ভাবলেও যে আজ লজ্জায় মরে যাই—কি হয়েছিলাম বলতো? আর বিস্ময়ের কথা যদি বল তুমিই কি কম বিস্ময় অমিয়? নিজেও তো মোটা মাইনের সরকারী চাকুরে ছিলে। জীবনে কোনদিন যে এমনি হৈ-হল্লার ভিতরে আসবে, তা কি কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল? সেই যে কলেজে ক্লাশের একপ্রান্তে নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারীর মত চুপ করে দিনের পর দিন বসে থাকতে, সে মূর্তি তোমার আজও তো আমি ভুলিনি।

অমিয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—অমনি হয় ভাই—অমনি হয়। তারপর দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা চলিল। অবশেষে অমিয় প্রশ্ন করিলেন,—আজ ছয়টা মাস জেলে আছি—বাইরের কোন খবরই তো রাখি না—বাইরের খবর কিছু বল তো।

—বাইরের খবর? তা হয়ত কিছু কিছু সত্যি আমি বলতে পারি ভাই। মাস তিনেক আগে চাকরী তো দিলাম ছেড়ে, কিন্তু তখনও কি করবো না করবো কিছুই স্থির করিনি। রোজ তো কাগজে পড়তাম—কেমন করে সারা ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে মেতে উঠেছে। বড় ইচ্ছা হলো, একবার এই সময় দেশের প্রধান প্রধান স্থানগুলো ঘুরে দেখে আসি। বেরিয়ে পড়লাম। আগে বাঙলা দেশটি ঘুরে যে যে স্থানে বড় বড় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুনতে পেলাম—সেই সেই স্থানেই গেলাম। বরিশালের বানরী-পাড়ায় কেশব ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় দেখলাম। হরদয়াল নাগের চাঁদপুর বিদ্যালয়, ঢাকার জাতীয় মহাবিদ্যালয় দেখলাম। ঢাকার সতীশচন্দ্র সরকার ঢাকা কলেজের প্রফেসারী ছেড়ে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হলেন—প্রফেসর অতুল সেন এসে

যোগ দিলেন। কলকাতার গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তনের কথা তো জানই। কলকাতা থেকে গেলাম কাশীতে। কাশী বিদ্যাপীঠ এক অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি ভাই—শিবপ্রসাদ গুপ্ত অকাতরে অর্থ ঢেলেছেন, মহাপণ্ডিত ডাঃ ভগবান দাস বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, সম্পূর্ণানন্দ এঁদের মত ব্যক্তি সব হয়েছেন অধ্যাপক। সেখান থেকে গেলাম গুজরাটে, দেখলাম গুজরাট বিদ্যাপীঠ—ডাঃ গিধোয়ানী, কৃপালনী এঁরা নিয়েছেন এখানকার অধ্যাপনার ভার। তারপর বয়কট আন্দোলন—স্বদেশী সভা, শোভাযাত্রার কথা আর কি বলবো ভাই! সারা ভারতবর্ষের নর-নারী সত্যই যেন পাগল হয়ে উঠেছে, দলে দলে কত লোক যে প্রতিদিন জেলে যাচ্ছে—তার কি সীমা সংখ্যা আছে। যমুনালাল বাজাজ—'বাজাজ ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড খুলেছেন—নিজে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এই ফাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে যত দুঃস্থ আইন ব্যবসায়ী নেমেছেন, তাঁদের পরিবারবর্গকে মাসিক অর্থ সাহায্য করছেন। সেখান থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। মন আর ঘুরে বেড়াতে চাইল না। ভাবলাম নিজে তো কিছু করলাম না—এইবার দেশে গিয়ে কিছু করতে হবে। হাঁ, ইতিমধ্যে দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। আমি তখন পথে—দুইদিন পরে এসে কলকাতায় পৌঁছলাম। সেই দিনই হলেন বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার, সেদিনের কলকাতার অবস্থার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না ভাই। দলে দলে নরনারীতে রাস্তাঘাট ভরে যেতে লাগলো—পার্কে পার্কে প্রতিবাদ সভা চললো—পথে পথে শোভাযাত্রা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন হতে লাগলো। কাউন্সিলের সেসন চলছিল—খবর যখন সেখানে পৌঁছলো—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কাউন্সিলার প্রতিবাদ করে বাইরে চলে এলেন। খেলার মাঠে খেলা বন্ধ হলো—সারা সহরময় হরতাল চললো। এই সম্মিলিত প্রতিবাদ এই বিক্ষোভ দেখেই হয়তো কর্তাদের টনক নড়লো, তাই পরের দিন তাঁরা বাসন্তী দেবীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তারপর গেলাম দেশে। জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। দুই একটি বক্তৃতাও দিলাম—তারই ফলে এলাম এই ইংরেজের অতিথিশালায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

স্বরাজ কিন্তু আসিল না, এদিকে আশ্রম এক রকম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ে আর ছাত্র আসে না—পড়াইবারও শিক্ষক নাই —সকলেই প্রায় গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছেন। অজয়ের কিছুই ভালো লাগে না। সারাক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ভাবে, কেন স্বরাজ আসিল না? কেন আরও দলে দলে লোক জেলে গিয়া জেল একেবারে ভর্তি করিয়া দিন না? মহাত্মা গান্ধীর মত লোক, দেশবন্ধুর মত লোক জেলে যাইতে পারিলেন আর সাধারণ লোক যারা তাদেরই কি এমন জেলের ভয় হইল? কিন্তু জেলেই বা যাইবে কেমন করিয়া লোকে? মহাত্মা নিজেই তো আইন অমান্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। একি ভাল হইল? স্বরাজ বুঝি আর কোনদিনই আসিবে না। ভাবিতেই অজয়ের মন একেবারে বেদনায় মুষড়িয়া পড়ে। দেশে সে উৎসাহ আর নাই—পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশী নগর-কীর্তন আর হয় না—গ্রামে গ্রামে সভা বসে না—বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং হয় না। এখন আবার উকিলেরা ওকালতী করিতেছেন—চাকুরেরা চাকুরী করিতেছেন—ছাত্রেরা জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়িয়া আবার সরকারী স্কুলে ভর্তি হইয়াছে। কোথায় গেল ইহাদের সেই পণ—কোথায় গেল সেই উৎসাহ! যাঁহারা দেশের জন্য পুলিশের লাঠি খাইল—যাঁহারা জেলে গিয়া দিনরাত কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেছেন—তাঁহাদের কথা কি ইহাদের মনে একবারও পড়িল না! এদিকে আশ্রমে তখনও যে দুই চারিজন কর্মী মাঝে মাঝে তাঁত চালাইত—চরকায় সূতা কাটিত—তাহাদের মনও দমিয়া গিয়াছে। তাহারা তো জেলে যাইতে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল কিন্তু মহাত্মা যে সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এমনি নানা চিন্তায় অজয়ের দিন কাটিতে লাগিল।

রায়দের বাড়ির উল্লাস কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত।

পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিলে তাহার সহিত অজয়ের পরিচয় হইয়া গেল। উল্লাস নূতন নূতন ব্যায়ামের কৌশল জানে—ভালো লাঠি খেলিতে পারে—ছোরা খেলিতে পারে, তরোয়ালের ভাঁজ জানে। চমৎকার স্বাস্থ্য তাহার। অজয় কয়েকদিনের ভিতরে তাহার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিল। উল্লাস দাদার মত লাঠি খেলা, ছোরা খেলা তাহাকে শিখিতে হইবে—তাহার মত শরীরটা তাহার তৈরী করিয়া লইতে হইবে। এই প্রলোভন অজয়কে পাইয়া বসিল। সেদিন বিকাল বেলা নদীর তীরে গাছের ছায়ায় বসিয়াছিল—উল্লাস আর অজয়। কতক্ষণ নানা প্রশ্নের পর অজয় প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা উল্লাসদা, আপনি কেন আন্দোলনে যোগ দিলেন না—আপনি কেন জেলে গেলেন না? উল্লাস নিস্পৃহভাবে জবাব দিল—আমার মত দুই একজন নাই বা গেল জেলে—কিন্তু এত যে হাজার হাজার লোক জেলে গেল স্বরাজ তাতে এলো কই? অজয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, —আপনি কি দেশ ছাড়া? পরের উপর নিজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আজ এমন কথা আপনি কেমন করে বলেছেন দাদা? হাজার হাজার লোক জেলে যাওয়াই কি এমন একটা বেশী হলো? যে দেশে ত্রিশ কোটি লোক—সে দেশের কোটি কোটি লোকের তো এমনি করে জেলে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো তাহ'লে স্বরাজ এসে যেতো! উল্লাস হাসিয়া বলিল—তোমাদের ঐ স্বরাজের মানে বুঝতে পারিনে ভাই! ওটা সোনার পাথর বাটী। ইংরেজ থাকবে দেশের রাজা, তারই অধীনে খানিকটা অধিকার লাভ করে গড়ে তুলবে স্বরাজ! এই তো নেতাদের স্বরাজের মানে! অজয় আশ্চর্য হইয়া বলিল,—কিন্তু মহাত্মা যে বলেছেন এতেই দেশের মঙ্গল হবে। উল্লাস কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—মহাত্মার সব কথা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে ভাই। তবে সারা দেশ যে তাঁর কথায় মেতে উঠেছে, এটা কেউ অস্বীকার করবে না! তা ছাড়া আমাদের নিষেধ ছিল ভাই।

—কিসের নিষেধ!

উল্লাস বলিল—তোমার কাছে বলতে বাধা নাই, কিন্তু এসব কাউকে বলো না যেন। দেশে আরও স্বদেশী দল আছে অজয়—তারা সত্যি সত্যি স্বাধীনতা চায়—ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা দেশ শাসন করতে চায়। কিন্তু তাই বলে তারা কংগ্রেসের মত অহিংস নয়। দরকার যদি হয় গুলি গোলা বন্দুক পিস্তল দিয়ে যুদ্ধ করে তারা দেশকে স্বাধীন করতে চায়। অসি কাকার ছেলে তুমি অজয়—অসিকাকা ছিলেন এই দলের একজন নেতা। তাই বলে এঁরা গান্ধীজীর আন্দোলনে বাধা দেন নাই—অনেকে এই আন্দোলনেও যোগ দিয়েছেন। আমার উপর নিষেধ ছিল—কোন কথার অবাধ্য হওয়ার উপায় আমাদের নাই। অজয় পরম উৎসাহিত হইয়া বলিল—আমার বাবা ছিলেন এই দলে—আপনি ঠিক জানেন দাদা ?

উল্লাস হাসিয়া বলিল—হাঁ ঠিকই জানি ভাই !

—আমিও এই দলে যোগ দেব দাদা—আমিও বন্দুক ছুড়বো, পিস্তল ছুড়বো। নেবেন আমাকে ? আপনার পায়ে পড়ি দাদা !

উল্লাস বলিল—সময় এখনও হয় নাই ভাই—আরও একটু বড় হও নিশ্চয় তোমার ডাক পড়বে !

অজয় ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—করে আমার বয়স হবে দাদা ! স্বদেশী আন্দোলনের ভলেন্টিয়ার আমি হতে পারলাম না—আপনাদের দলেও আমি ঢুকতে পারবো না। এমনি করে কোন কাজেই যদি না লাগি কি হবে বেঁচে থেকে !

উল্লাস হাসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল—পাগল ! সময় এলে কত কাজ করতে পার দেখা যাবে। কয়েক দিন পরে উল্লাস একদিন অজয়কে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নানা কাগজপত্রের ভিতর হইতে খুঁজিয়া একখানা ফটো বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—দেখতো অজয় এর ভিতরে কাউকে চিনতে পার কিনা ? সারি বাঁধিয়া বারজন লোক দাঁড়াইয়া আছে—পরিধানে তাহাদের ছোট এক

টুকরা করিয়া কাপড়—হাতে হাত কড়া পায়ে শিকল। কে ইহারা—অজয় অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দিকে তাকাইয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। উল্লাস হাসিয়া বলিল—চিনতে পারলে না কাউকে অজয়? পরে সকলের প্রথম ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া বলিল—দেখতো এঁকে ভাল করে। সেই দিকে পুনরায় কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া অজয় চেঁচাইয়া উঠিল—চিনেছি উল্লাসদা—চিনেছি—এ যে আমার বাবা! অজয় দুই চোখের দৃষ্টি একেবারে ছবিখানার উপরে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া তাহার প্রতিটি রেখা প্রতিটি বর্ণ যেন নিজের অন্তরের ভিতরে গাঁথিয়া লইতেছিল। দেখা সারা হইলে ফটোখানা কপালে ঠেকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উল্লাস এতক্ষণ একটা কথাও কহে নাই—এখনও কিছু কহিল না—শুধু নির্নিমেষ নয়নে অজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে অজয় ডাকিল—দাদা!

উল্লাস বলিল—কি ভাই?

ফটোখানা কিন্তু দিতে হবে দাদা।

—বেশ—দিলাম তোমায় কিন্তু খুব সাবধানে রেখো ভাই। আমি অনেক চেস্টা করে সংগ্রহ করেছি। অসি কাকাদের যখন আন্দামানে নিয়ে যায়, তখন গঙ্গার ঘাটে তাদের জাহাজে তোলার আগে সার-বন্দী করে দাঁড় করিয়েছিল, তখন সমিতির কোন লোক দূরে থেকে চুরি ক'রে ফটোখানা তুলে নেয়।

—হাঁ আমার মনে পড়েছে দাদা—সেই যে বাবার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ক'রে এসেছিলাম—সে কথা আমি ভুলিনি। বাবার সে মূর্তি আমার মনে আছে। উল্লাসের ঘর হইতে বাহির হইয়া ফটো-খানা জামার নীচে করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অজয় যখন পথ চলিতেছিল, তখন এক অদ্ভুত আনন্দে বুক তাহার ভরিয়া উঠিতেছিল। তাহার বাবার ছবি! কত বড় বীর তাহার বাবা—কত বড় স্বদেশভক্ত তিনি!

বিকালবেলা অজয় মাকে ঘরের ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—তোমাকে একটা চমৎকার জিনিস দেখাবো মা।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—কি জিনিসরে? অজয় নিজের বুকের ভিতর হইতে ফটোখানা বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—দেখ তো মা কার ছবি! ফটোখানার উপরে একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া লইতেই কল্যাণীর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতে লাগিল। কতক্ষণ একটি কথাও কহিতে পারিল না—শুধু নির্নিমেষ নয়নে ছবিখানার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে নিজের বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—এ ছবি তুই কোথায় পেলি অজু! অজয় তাহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল—বাবাকে তুমি চিনতে পেরেছো তো মা? এই দেখ সকলের আগে দাঁড়িয়ে তিনি! আমি কিন্তু প্রথমে ঠিক পাইনি মা—কতক্ষণ তাকিয়ে তার পরে চিনতে পারলাম। কতদিন বাবাকে দেখিনি বলতো—হঠাৎ কি এমনি করে চিনতে পারা যায়?

—কিন্তু আমার কথার তো জবাব দিলি না বাবা—কার কাছে পেলি ছবি? অজয় কিছুটা দ্বিধা করিয়া পরে মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া বলিল—তোমার কাছে তো না বলে পারবো না মা। কিন্তু খুব গোপন কথা—কেউ যেন না শোনে—আমাকে কারুর কাছে বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। ও পাড়ার উল্লাসদাদাকে চেনো তো। তিনি কলকাতায় পড়েন। তিনি বাবা যে স্বদেশী দলে ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে এখানা সংগ্রহ করে এনেছেন। তাদের লোকেরা খুব গোপনে জাহাজ ঘাট থেকে বাবার ছবি তুলে এনেছিল। খুব ভাল করে তোমার জামা কাপড়ের বাক্সে তুলে রাখ মা। অজয় তাহার পাশে বসিয়া আরও কত কি বলিয়া যাইতেছিল — কতক তার কল্যাণীর কানে গেল—কতক গেল না। দুই চোখের দৃষ্টি তাহার ফটোখানার উপরে নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু মন চলিয়া গিয়াছিল দেহ ছাড়িয়া কোন অজানা দূরতম দেশে। এই দেশের দক্ষিণে সমুদ্র—সেই সমুদ্র পাড়ি দিলে তবে সেই আন্দামান দ্বীপ। কি ভয়ঙ্কর স্থানই না জানি সে দেশ। সেখানেই বন্দী হইয়া কত না দুঃখে, কত না কষ্টে দিন তাহার কাটিতেছে। দেহ তার শুকাইয়াছে

—মাথার চুল রুক্ষ হইয়াছে—উজ্জ্বল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। এত দিন দুঃখের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া চোখের জল কল্যাণীর বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল। তাই চোখের কোণ বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল না। কিন্তু বুক তাহার দ্রুততালে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। কল্যাণী বিছানার উপরে শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল। অজয় মায়ের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল —কি হলো মা—শরীর খারাপ লাগছে?

কল্যাণী তেমনি করিয়া জবাব দিল—হ্যাঁ, বাবা।

—একটু বাতাস করি মা।

—কর।

অজয় পাখা লইয়া মায়ের কোলের কাছে বসিয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

তবু ছয় সাতটি বৎসর এত দুঃখ কষ্টেও যে কেমন করিয়া অসিতের কাটিয়া গেল—তাহা কম বিস্ময়ের নহে। দিনের পর দিন তাহারা নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া হাত ফুলাইয়া ফেলিয়াছে—দড়ি পাকাইয়া হাতে ঘা করিয়াছে—ঘানি টানিয়াছে—একটা দিনও রেহাই পায় নাই—শরীর নিতান্ত অচল হইয়া পড়িলেও, কেহ এতটুকু দরদ দেখায় নাই—এতটুকু কাজের লাঘব করিয়া দেয় নাই। ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াকে যেমন আহারের সময়টুকু ছাড়া—সর্বদা তাহার মালিক খাটাইয়া লইতে চাহে—ঘোড়া তাহার কয়দিন বাঁচিবে না বাঁচিবে সে হিসাব করে না—এখানেও ঠিক তেমনি ব্যবহারই তাহারা পাইয়া থাকে! কিন্তু আজ মাস তিনেক হইল অবস্থা তাহাদের খানিকটা ভাল হইয়াছে—জেল কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের মাত্রা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার মূলে যে ব্যক্তিটি—সে আর বাঁচিয়া নাই। মাস পাঁচেক পূর্বের ঘটনা।

আগরা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মদনগোপাল সিং সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সম্মুখে সাফ জবাব দিয়েছে—আগামীকল্য হইতে সে অনশন আরম্ভ করিবে। যতদিন রাজনৈতিক বন্দীদের সম্মানজনক কাজ না দেওয়া হয়—তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হয়, ততদিন সে আহার গ্রহণ করিবে না। মদনগোপাল ঘানি ঘুরাইত। অসিতদের ওয়ার্ডের তেতালায় তাহার থাকিবার সেল। প্রত্যহ উপরে উঠিতে নীচে নামিতে অসিতের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইত। অল্প বয়স—উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু মাস তিনেক ধরিয়া ঘানি টানিতে টানিতে শরীর তাহার শুকাইয়া উঠিয়াছিল—মন তাহার অনেকখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অসিতেরা প্রথমে ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নাই। ভাবিল শুধু শুধু হয় তো বেচারা পাঁচ সাত দশ দিন অনাহারে নিজের দেহটাকে দুঃসহ দুঃখ দিবে—ফল কিছুই হইবে না। জেল কর্তৃপক্ষ ফিরিয়াও তাকাইবে না। তারপর আবার আহার তাহাকে করিতেই হইবে —আবার একদিন মুখ নীচু করিয়া ঘানি ঘরে গিয়া ঢুকিতে হইবে। সত্যই জেল কর্তৃপক্ষ প্রথমে গ্রাহ্যই করিল না। দিন তিনেক পরে একদিন দস্তুরমত শাসাইয়া গেল। যদি সে অনশন ভঙ্গ না করে তবে সারা দিনরাত্রি তাহাকে হাতকড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইবে—বেত মারা হইবে ইত্যাদি। কিন্তু মদনগোপালের সঙ্কল্প তাহাতে একটুও টলিল না। এমনি করিয়া সাত দিন গেল—দশ দিন গেল—অবশেষে বিশ দিন পর্যন্তও জেল কর্তৃপক্ষ আর কোন কথাই কহিল না। মদনগোপাল শুধু জলপান করিত আর সারা দিনরাত্রি নিজের বিছানায় পড়িয়া থাকিত। প্রত্যহ তাহার শিয়রের কাছে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখা হইত কিন্তু সে সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইত না। একদিন সকলের অলক্ষ্যে অসিত গিয়া কয়েক মিনিটের জন্য তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। শরীর তাহার একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছে—ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না। তাহার দিকে চাহিলে মনে হয়—কতদিন ধরিয়া কি

এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে যেন ভুগিতেছে সে। পঁচিশ দিনের দিন—তাহাকে জোর করিয়া আহার করান আরম্ভ হইল। হাত পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রবারের নল নাকের ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া সেই নলের সাহায্যে পেটের ভিতরে দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইত। দুই তিনদিন এমনি চলিল। মদনগোপাল তাহার শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত দিয়া বাধা দিত। ধস্তাধস্তির পরে যখন সে অবসন্ন হইয়া পড়িত—নল দিয়া দুধ ঢালিয়া দিত। দিন চারেক পরে সেদিন অসিতেরা যখন নীচের তলায় বারান্দায় বসিয়া কাজ করিতেছিল ডাক্তার তখন লোকজন লইয়া মদনগোপালের সেলের দিকে উঠিয়া গেল। তাহারা মনে করিল—অন্য দিনের মত আজও তাহাকে জোর করিয়া আহার করান হইবে। ইহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চারিদিকে ট্যাণ্ডেল সিপাহী জমাদারদের—যেন একটা চাপা কথার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল—টাওয়ারের সিঁড়ি দিয়া তাহারা দ্রুত ওঠা-নামা করিতে লাগিল। জেলারকে উপরে উঠিতে দেখা গেল—এবং কিছুটা পরেই ডাক্তার ও জেলার দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া হাসপাতালের দিকে চলিয়া গেল। অসিতেরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কয়েক মিনিট পরে "বি ক্লাশ" কয়েদীরা কাহার সারা দেহ কম্বলে ঢাকা দিয়া ট্রেচারে করিয়া নামাইয়া হাসপাতালের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। কি হইল? কাহাকে এমনি করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে। ওধার হইতে যতীন চীৎকার করিয়া বলিল—মদনগোপালকে ওরা মেরে ফেলেছে—ট্রেচারে করে মদনগোপালের দেহ নিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত মধ্যে সারা জেলময় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। যে স্বদেশী কয়েদীরা ঘানিতে কাজ করিত—অন্যান্য ওয়ার্ডে থাকিত—তাহারা সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিল—অসিতদের ওয়ার্ডের সম্মুখে। সর্বশুদ্ধ তাহারা ত্রিশজন উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিল হাসপাতালের দিকে। সিপাহী জমাদার ছুটিয়া আসিল—তাহারা গ্রাহ্য করিল না। সিপাহীরা নিরুপায় দেখিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল—

গেটে পাগ্‌লা ঘণ্টি ঢং ঢং করিয়া বাজিতে লাগিল। তবু তাহারা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিল না—যেখানে মদনগোপালের দেহ কম্বল চাপা দিয়া রাখা হইয়াছিল—সেখানে আসিয়া মৃতদেহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—কম্বল তুলিয়া সকলে নির্নিমেষ নয়নে মদনগোপালের দেহের দিকে রহিল চাহিয়া। হঠাৎ একেবারে রাগে দুঃখে পাগল হইয়া উঠিল তাহারা। কয়েকজন মিলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আজ আমরা সবাই একসঙ্গে মরবো—তার আগে চল কোথায় ডাক্তার তাকে চরম শাস্তি দিয়ে যাব। উন্মত্তের মতই ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল তাহারা। ইতিমধ্যে সিপাহী, ট্যাণ্ডেল, পেটি অফিসার প্রভৃতি মিলিয়া দেড় শ লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল—কাহারও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে লাঠি সোটা। কিন্তু কাহারও উপরে মারপিট হইল না—কেরী সাহেবের আদেশে পাঁচ সাত জন মিলিয়া অসিতদের এক একজনকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের যাহার যাহার সেলে আনিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অসিতেরা রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া ফুলিয়া মরিতে লাগিল। ইহার পরদিন হইতে এই ত্রিশজন রাজনৈতিক বন্দীই অনশন আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েক দিনের ভিতরেই অবশ্য কর্তৃপক্ষ এবার নরম হইয়া আসিল। জেলের ভিতরে যে ছাপাখানা ছিল—এই ত্রিশজনকে সেখানেই কাজ দেওয়া হইল। মদনগোপালের পণ এবার সত্যসত্যই খানিকটা পূরণ হইল। শ্যামবাজার বোমার মামলার আসামী বীরেন দাস হইলেন তাহাদের ছাপাখানার ট্যাণ্ডেল।

মাস ছয়েক পরের কথা। ছাপাখানার নানা কাজে মাঝে মাঝে বীরেনবাবুকে জেল অফিসে যাইতে হইত। সেদিন বিকাল বেলা জেল অফিস হইতে আসিয়া বীরেনবাবু নিজের জাঙ্গিয়ার ভিতর হইতে লুকান খানতিনেক খবরে কাগজ বাহির করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অসিতরা সব কয়জন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীরেনবাবু বলিলেন—গোপনে বন্দোবস্ত করেছি—এখন থেকে রোজ বিকাল বেলা এক ঘণ্টার জন্য কাগজ পাওয়া যাবে। চার পাঁচদিনের ভিতরে

এবারকার ডাকের সব কাগজগুলো পড়ে ফেল্‌তে হবে। কাগজ খুলিতেই সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল—"দি সার্ভেণ্ট"। অসিতরা একেবারে পুলকে আত্মহারা হইয়া উঠিল—বাঙলা দেশের কাগজ—কলিকাতার কাগজ! বীরেনবাবু বলিলেন—ভয়ানক সব খবর আছে—আমরা তো দেশের কোন খবর জানিনে—কি ভীষণ এক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—পড়ে যাচ্ছি সব চুপ করে শোন। বীরেনবাবু মাঝখানে বসিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—আর তাঁহাকে ঘিরিয়া পঁচিশ ত্রিশটি প্রাণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। পূর্বের কোন ঘটনা ইহারা জানে না। পাঞ্জাবে যে এত বড় একটা নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে—সারা দেশ নানা-ভাবে প্রতারিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহার কোন খবরই তাহাদের কর্ণে পৌঁছায় নাই। শুধু আজিকার এই কয়খানা কাগজ হইতে বীরেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন—বোম্বায়ে যুবরাজ আসিয়া নামিবেন এবং তাহারই ফলে ভারতবর্ষের প্রতি নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে যে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিয়াছে তাহার ইতিহাস। কংগ্রেসের এই নির্দেশ। মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী এই আন্দোলনের ভার লইয়াছেন এবং ইহার পর সারা দেশময় এই গভর্ণমেণ্টের সহিত এই মহাত্মারই নেতৃত্বে—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইবে—স্কুল কলেজ আইন আদালত ইতিমধ্যে বয়কট আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাগজ পাঠ শেষ হইল। কিন্তু কে এই মহাত্মা গান্ধী? তাঁহার সত্যকার পরিচয় কি? ইহাদের মধ্যে বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক ছিল—কিন্তু কেহই ভাল করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে চিনিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে জনৈক পাঞ্জাবী জানাইলেন—একজন গান্ধী নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিয়া খুব নাম করিয়াছিলেন—কয় বৎসর পূর্বে তিনি আন্দামানে আসার আগে দেশ হইতে এই খবর জানিয়া আসিয়াছিলেন। এই মহাত্মা গান্ধী সম্ভবতঃ সেই গান্ধী হইবেন। অবশিষ্ট বেলাটুকু, সারা রাত্রি অসিতের মনের ভিতর—মহাত্মা গান্ধী,

বয়কট, অহিংস অসহযোগ—নানা কথা একের পর এক জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

পরের দিন কোন্ সময় আবার কাগজ দেখিতে পাইবে সেই আশায় মন তাহার চঞ্চল হইয়া রহিল। কয়েকদিনের ভিতরে সেবারকার ডাকে যে পনর দিনের কাগজ আসিয়াছিল—তাহা পড়া হইয়া গেল। বাঙলা দেশের সেই বিখ্যাত বোমার মামলার ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, বিহারের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ইউ পি-র মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু—বোম্বাইয়ের নরীম্যান, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, দিল্লার হাকিম আজমল খাঁ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আবদুল গফুর খান্—তাছাড়া নামকরা মুসলমান নেতা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী ইঁহারা সকলেই এই অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। যে চিত্তরঞ্জন দাশের বিলাসিতা সর্বসাধারণের ভিতরে একটা গল্পের বিষয় ছিল—যিনি মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিতেন—তিনি সর্বস্ব ছাড়িয়া একেবারে সন্ন্যাসী সাজিয়া সর্ব-সাধারণের ভিতরে নামিয়া আসিয়াছেন। আজ হিন্দু-মুসলমান, ধনী, নির্ধন সকলে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া, হাতে হাত মিলাইয়া দেশের কাজে আসিয়া নামিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা অসিতের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সেবারকার আন্দোলনে তো মুসলমানেরা কোন সহানুভূতিই দেখায় নাই—মাত্র বাঙলা দেশে অল্প কয়েকশত লোক জেলে গিয়াছিল। আর আজ সারা ভারতবর্ষময় সকল সম্প্রদায় এমনি করিয়া ভেদাভেদ ভুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—দলে দলে জেলে যাইতেছে। অহিংসা অসহযোগ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই ধারণা নাই। তাহাদের মত ও পথ ভিন্ন। কিন্তু তবুও তো একথা আজ কোন প্রকারেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাহারা সর্বসাধারণের ভিতরে দেশপ্রেমের বিশেষ কোনই প্রেরণা আনিতে পারে নাই। নিজেরা নিজেরা গুপ্ত দল সৃষ্টি করিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে কাজ করিয়া গিয়াছে। তাহারা কি,

কি তাহাদের উদ্দেশ্য, কি তাহাদের আদর্শ, কোন দিনই তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই—সে চেষ্টাও করে নাই। তাই তাহাদের দেশের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া—কেহ তাহাদিগকে ভাবিয়াছে দস্যু—কেহ বলিয়াছে নিষ্ঠুর নরঘাতক—আরও কত কি! কিন্তু আজ সত্য করিয়াই দেশের লোক নিজের মাতৃভূমিকে চিনিতে পারিয়াছে। হোক্ এ অহিংসার পথ—তাহাদের সে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। আর কিছু না হোক্—না আসুক দেশে স্বরাজ—নিজের দেশকে যে দেশবাসী আপনার বলিয়া জানিতে পারিয়াছে ইহাই কি কম লাভ!

ইহার দিন কুড়ি পরে আবার একদিন বিকাল বেলা বীরেনবাবু কাগজ পড়িয়া যাইতেছিলেন—অসিতেরা তেমনি করিয়াই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া এক মনে শুনিয়া যাইতেছিল। এতদিনে গভর্ণমেণ্ট প্রতিদিন শত শত লোককে গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কে কোথায় গ্রেপ্তার হইল তাহার সংবাদ বীরেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সময়ে তিনি পড়িয়া গেলেন—গোয়ালন্দ মহকুমার গ্রেপ্তারের কথা—অমিয়র কথা—এই আন্দোলনে তাঁহার ত্যাগ ও দানের কথা। এবং তিনি যে আন্দামান-দ্বীপান্তরিত অসিত লাহিড়ীর ভ্রাতা সে পরিচয়ও লেখা ছিল। পাঠ শেষ করিয়া বীরেনবাবু অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এ কি অসিতবাবু, ইনি যে দেখছি আপনার দাদা! অসিতের যদিও কিছুমাত্র সংশয় ছিল না তবু—ইহা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? যিনি একান্ত নিরিবিলি দিন কাটাইতেন—কোনপ্রকার হৈ চৈ যাঁহার ধাতে পোষাইত না—দেশ কি, দেশপ্রেম কি এ সম্বন্ধে কোনদিন কোন কথা অসিত তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছে কিনা মনে করিতে পারিল না। আর আজ সেই নিরীহ মানুষ নিজের চাকুরী ছাড়িয়াছেন—এমন কি জেলে পর্যন্ত গিয়াছেন। এমনি করিয়াই তাহা হইলে—তাহার দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে—এমনি করিয়াই দেশের সর্বসাধারণের ভিতরে দেশপ্রেমের বান ডাকিয়া গিয়াছে। অসিতের সর্বশরীর

বিস্ময় ও আনন্দে বারে বারে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আরও দিন দশেক পরের কথা। সেদিন দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া অসিত নিজের সেলে বিশ্রাম করিতেছিল এমন সময় মেটু আসিয়া বলিল—অসিতবাবু আপনার চিঠি আছে। চিঠি? অসিত ছোঁ মারিয়া মেটের হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া তাহার উপরে দুই চোখের দৃষ্টি নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। চিঠি! তাহার দেশের খবর বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহার স্ত্রীপুত্রের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। এক বৎসর হইয়া গেল—সে তাহার দাদার একখানা চিঠি পাইয়াছিল আর এতদিন পরে আজ আবার এই চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। কে লিখিয়াছে চিঠি? খামের ভিতর হইতে কাগজখানা টানিয়া বাহির করিতেই কাঁচা হাতের লেখা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কে লিখিয়াছে—এতো তাহার দাদার লেখা নয়। তবে কি কল্যাণী লিখিয়াছে? অসিত তাড়াতাড়ি চিঠির নীচের দিকের নামটি পড়িয়া ফেলিল—"আপনার স্নেহের অঞ্জু"। অঞ্জু? তাহার অঞ্জুমণি লিখিয়াছে চিঠি! আনন্দের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। অসিত পড়িয়া যাইতে লাগিল—বাবা আজ এক বৎসরের উপরে আপনার কেনো সংবাদ জানি না। আপনার সংবাদ না পাইলে আমরা যে কি দুশ্চিন্তায় থাকি তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন না। আজ ছয় বৎসর আপনাকে দেখি না বাবা। যখনই আপনার কথা মনে হয়—তখনই দুই চোখ ভরিয়া জল আসে। মা আপনার কথা বলিতে বলিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলেন। শরীর তাঁহার একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। রাত দিন একা একা বসিয়া কত কি ভাবিতে থাকেন। জ্যাঠামণি ভাল আছেন। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা সকলে এই এক মাস হইল গ্রামে আসিয়াছি। গ্রাম আমার কাছে খুব ভাল লাগে বাবা—নদী, গাছপালা, মাঠ এই সব কত যে সুন্দর মনে হয় তাহা আর কি বলিব। জ্যাঠামণি বাড়িতে আশ্রম করিয়াছেন। আশ্রমে চরকায় সূতা কাটা হয়—তাঁত বোনা হয়। তাছাড়া কলিকাতা হইতে দুইজন

খুব বিদ্বান লোক আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের বাইরের ঘরে যে জাতীয়-বিদ্যালয় হইয়াছে—তাহাতে পড়ান। আমি তাঁহাদের কাছেই পড়ি। আমি এখন খুব বড় হইয়াছি বাবা—অন্ধকার রাত্রেও একা একা পথ চলিতে পারি—একটুও ভয় করে না। জ্যাঠামণি আমাকে খুব ভালবাসেন। আপনি কতদিন পরে ফিরিয়া আসিবেন বাবা! আপনার জন্য সদা সর্বদা আমার মন কেমন করে! আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি সেবক—আপনার স্নেহের অঞ্জু।

তারপর দুই তিনবার চিঠিখানা অসিত পড়িয়া গেল! তাহার অঞ্জুমণি এমনি করিয়া চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সহসা দুই চোখ তাহার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়া—তাহাই অজস্র ধারায় দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার স্ত্রী—তাহার পুত্র—আজ কোথায় তাহারা—কত দূরে তাহারা! তিন মাস পূর্বে লেখা চিঠি—না জানি কোথায়—কর্তাদের কোন অফিসে নিতান্ত অনাদরে এতদিন পড়িয়াছিল—আজ এতদিন পরে তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল। চিঠির ভিতরে দুই এক স্থানে জল পড়িয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে।—চিঠি লিখিতে লিখিতে কি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল অঞ্জু? তাহারই চোখের জল কি গড়াইয়া পড়িয়াছিল এখানে? কল্যাণী হয় তো পাশে বসিয়া—এক একটা কথা বলিয়া দিতেছিল আর আঁচলে চোখ মুছিতেছিল—অঞ্জু কোনরকমে দুই চোখের জল চাপিয়া লিখিয়া চলিয়াছিল। চিঠিখানা হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া এমনি কত কি ভাবিয়া চলিয়াছিল অসিত। উত্তরের জানালা দিয়া দূরে "হিল স্টেশনের" পাহাড়টি দেখা যাইতেছিল। সূর্যের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে সেই পাহাড়ের উপরে নানা বর্ণের লুকোচুরি খেলা চলিতেছিল—নীচে উত্তাল তরঙ্গমালা বারে বারে তটপ্রান্তে ঘা খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছিল—আর সেই তরঙ্গের মাথায় মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি নৃত্য করিতেছিল—মনে হইতেছিল কে যেন অজস্র সাদা

ফুল সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অসিত শুধু এই দিকে নিরর্থক দৃষ্টি মেলিয়াই তাকাইয়াছিল—ইহার কোন কিছুই তাহার মনে রেখাপাত করিতে পারিতেছিল না। তাহার মন পাহাড় সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া কোন এক দূরতম প্রদেশের ক্ষুদ্র কয়েকখানি কুটীরের চারিপাশে বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সহসা ঢং ঢং করিয়া তাহাদের কাজের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—পাশের সেল হইতে যতীন বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল—অসিদা, চলুন যাই। অজিত দুই হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চল যাচ্ছি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

এক বৎসর পরে অমিয় জেল হইতে মুক্তি পাইলেন। দেশ তখন নিঃসাড়ে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—সে উত্তেজনা নাই—সে উৎসাহ নাই—অবসাদ ও হতাশ্বাসে সারা ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা আজ কারা প্রাচীরের অন্তরালে তাহারা একান্ত নির্বিকারভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের দিন গণিয়া চলিয়াছে। যে কর্মিদল এখনও বাহিরে অথচ যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তাহারা প্রস্তুত ছিল আজ তাহারাও একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে—সেনাপতির আদেশে সমগ্র বাহিনীকে পিছু হটিয়া আসিতে হইয়াছে—যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আজও নীরবে প্রতি সৈনিকের শিরায় শিরায় রক্ত নিষ্ফল আবেগে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তবু এতটুকু বাহ্যিক প্রকাশ তাহার নাই। এ কি ভাল হইয়াছে? এ কি সেনাপতির ভুল হইল? বারে বারে নিজের মনে এ প্রশ্ন অমিয় করিয়াছেন। কিন্তু কোন উত্তর খুঁজিয়া পান নাই। মনে করিয়াছেন হয়তো ভুল হয় নাই, যিনি দেশের সত্যকার নাড়ীর খবর রাখেন—এ তাঁহারই আদেশ। যখনই গতিবেগ তাহার নির্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে চালিত হইতে যাইতেছিল—তখনই তিনি রাস টানিয়া ধরিয়াছেন—হয়তো এ ভালই হইয়াছে। পরিশ্রান্ত

ঘোড়া থামাইয়া লইয়া বিশ্রাম দিতে হয়—আহার করাইতে হয়—তাহার পর আবার পূর্ণ বেগে ছুটাইতে পারা যায়। এ হয়তো বা তাহাই। এমনি নানা জবাব ইহার অমিয় মনকে দিয়াছেন। তাই জেল হইতে বাহিরে আসিয়াও এতটুকু নিষ্ঠা তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইল না—আদর্শের প্রতি, নেতার প্রতি, এতটুকু বীতরাগ হইলেন না। বাড়ি আসিয়া দেখিলেন—আশ্রম বন্ধ হইয়া গিয়াছে—অজয়ের লেখাপড়া এই একটা বৎসর ধরিয়া কিছুই হয় নাই। অজয়কে লইয়া তিনি পড়িলেন মহাসমস্যায়। দেশের ন্যাশনাল স্কুল অধিকাংশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই একটা যাহা এখনও টিকিয়া আছে—তাহাও ভবিষ্যতে কি হইবে বলা যায় না। অনেক চিন্তা ও দ্বিধার পরে তাহাকে নিকটবর্তী ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। অজয় তাহার মনের সকল সংশয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার উৎসাহে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া দিল। চরকা লইয়া ধর্মগ্রন্থ লইয়া, অমিয়র দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

মাস ছয় পরের কথা। দিন দশেক অবিরাম জ্বরে ভোগার পর আজ অমিয়র জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা অজয় তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতেছিল—মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। কিছুদিন ধরিয়া অমিয়র মন ভাল ছিল না। এ সংসারের কোন বন্ধনই তাঁহাকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করিতেছিল না। এক অজয় খানিকটা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনার যাহারা তাহারা যে একেবারে দূরে সরিয়া গিয়াছে! স্ত্রী তাঁহার উপরে চরম অবিচার করিয়াছে—নিজে মরিয়াছে, তাঁহাকেও চিরকালের জন্য কলঙ্কের ভাগী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পুত্র দূরে সরিয়া গিয়া আজ একেবারে পর হইয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্ক এবার আই এ পাশ করিয়াছে—হয়তো বি এ ক্লাশে ভর্তি হইবে, কিন্তু ইহার কোন খবরই তিনি জানিবার অধিকারী নন। নিজের পুত্রের ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে—লেখাপড়ার ব্যয় ভার বহন করিতে—কর্তব্য-অকর্তব্য

নির্ধারণ করিতে কিছুতেই তাঁহার এতটুকু অধিকার নাই। স্ত্রী তাঁহার প্রতি এমন শত্রুতাই সাধন করিয়া গিয়াছে যে, নিজের পুত্রকে পর্যন্ত চিরতরে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। বিত্তশালী নিঃসন্তান মাতুল শশাঙ্ককে নিজের করিয়া লইয়াছেন। অসুখের ভিতরে এই সমস্ত চিন্তাই অমিয়কে একান্ত করিয়া পাইয়া বসিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলাও অমিয় এই সবই ভাবিতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার বুক ভাঙিয়া সশব্দে এমনি করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, অজয় পর্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। অজয় তাঁহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে জ্যাঠামণি—অমন করছো কেন ? অমিয় প্রশ্নের জবাব না দিয়া অজয়ের একখানি হাত নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল—কি ভাবছো জ্যাঠামণি ? অমিয় অজয়ের হাতখানি নিজের দুই শীর্ণ হাতের ভিতরে ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—কয়েক দিন ধরে মন আমার সত্যি ভাল নাই, জ্যাঠামণি, কয়েক দিন ধরে শুধু শশাঙ্কের কথাই মনে হচ্ছে—হাজার হোক নিজের সন্তান তো ? অজয় উৎসাহিত হইয়া বলিল—দাদার কথা ভাবছো জ্যাঠামণি—দাদার কাছে যে আমরা পরশু চিঠি দিয়েছি—এক খামের ভিতরে মা লিখেছে—আমি লিখেছি !

—চিঠি লিখেছিস ?

—হ্যাঁ জ্যাঠামণি।

—কি লিখেছিস ?

—আমি লিখেছি—দাদা কতদিন আপনাকে দেখি না। একবার আসবেন। আর মা তোমার অসুখের কথা বলে একবার আসতে লিখেছে। সহসা অমিয়র সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—কই আমাকে তো একথা জানাস্ নি জ্যাঠামণি—বউমাও তো বলেনি। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া বলিলেন—কিন্তু সে কি আসবে রে অজু ?

—কেন আসবে না,—মা বলেছে নিশ্চয়ই আসবে। কতদিন দাদাকে দেখিনি বলতো জ্যাঠামণি। সেই যে গতবারের আগের বার বিজয়ার দিন আমাদের বাসায় এসেছিলেন—আর তো দেখা হয় নাই। দাদা খুব ভাল হয়ে আই-এ পাশ করেছেন—এবার বি-এ পড়বেন, না জ্যাঠামণি ?

অমিয় ধীরে ধীরে বলিলেন—হয়তো তাই পড়বে রে। অমিয় নিজের মনে কি যেন হিসাব করিয়া বলিলেন—কাল তোদের চিঠি সে পেয়েছে—আজ যদি লেখে কালই তো জবাব আসতে পারে—না রে ?

অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল—তা আর পারে না—মোটে তো ছয় সাত ঘণ্টার পথ এখান থেকে কলকাতা।

কিন্তু একের পর এক দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—শশাঙ্কর কোন পত্র আসিল না। অমিয়র শরীর ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিদিন তিনি ডাকের সময় পিয়নের আশায় পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন—কলিকাতার ট্রেনটি স্টেশন হইতে ছাড়িয়া যাইবার পর অন্ততঃ ঘণ্টা দুই বাহিরের ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দুই চোখের দৃষ্টি দূর মাঠের উপরে মেলিয়া ধরিতেন হয়তো হঠাৎ কোনদিন শশাঙ্ক তাঁহাদের কোন খবর না জানাইয়া আসিয়া পড়িবে। কিন্তু অমিয়র কোন আশাই সফল হইল না।

সেদিন অজয়কে বলিলেন—হাঁ রে অজু, তোর দাদার চিঠির ঠিকানাটা লিখতে ভুল করিস নি তো ?

অজয় বলিল—না জ্যাঠামণি—আমার ঠিক মনে আছে—২৬।২ দ্বারকানাথ লেন লিখেছি।

—কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, ২৬।২ লিখতে শুধু ২৬ নম্বর লিখে দিয়েছিস—হয়তো ভুল করে ২ অংকটি বাদ পড়ে গেছে ?

এতটুকু যে অজয় তাহারও অমিয়র মুখের দিকে তাকাইয়া মনটি বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল—হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া মিথ্যা কথাটি বাহির হইয়া গেল—তাই হয়তো হবে জ্যাঠামণি, হয়তো

আমার ভুল হয়েছে—নইলে এতদিন কি দাদা চিঠি না দিয়ে থাকতে পারেন! আবার লিখবো জ্যাঠামণি?

অমিয় বলিলেন—বেশ তাই লেখ অঞ্জু, খুব ভাল করে একখানা চিঠি লেখ দিকি? লেখ যে, আমার খুব অসুখ, তাকে দেখতে চাচ্ছি—একবার যেন ছুটে আসে।

অজয় কাগজ কলম লইয়া আসিলে পুনরায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা অঞ্জু, চিঠি না লিখে তার চেয়ে চল না একবার আমরা কলকাতা থেকে ঘুরে আসি? আমার তো শরীর বেশ সেরে উঠেছে—আর পাঁচ সাতটা দিন পরেই আমি যেতে পারবো—তুই যাবি আমার সঙ্গে?

অজয় এবার পরম উৎসাহিত হইয়া বলিল—সেই ভাল জ্যাঠামণি—সেই ভাল—তোমাতে আমাতে গিয়ে দাদাকে এবার ধরে আনবো।

অমিয় অজয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—পারবি তো অঞ্জু, তোর দাদাকে ধরে আনতে পারবি তো?

—খুব পারবো জ্যাঠামণি। দাদা ছুটিটা এখানে কাটিয়ে আবার কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হবেন।

অমিয় পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—কি যে আনন্দ হবে আমার তাহলে অঞ্জু! তোরা দুটি ভাই যদি আমার চোখের সামনে থাকিস আমি হাসতে হাসতে মরতে পারি রে!

দিন পনরো পরে অজয়কে সঙ্গে করিয়া অমিয় ২৬৷২ দ্বারকানাথ লেনের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরে বসিতেই বাড়ির ঝি আসিয়া তাঁহাদের ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল। শশাঙ্কর দিদিমা কাছে বসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। কয়েক মিনিট পরে শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। প্রায় দুই বৎসর পরে দেখা। শশাঙ্ক এই দুই বৎসরে আরও অনেকখানি বড় হইয়াছে—আরও সুন্দর হইয়াছে। অমিয় নির্ণিমেষ নয়নে পুত্রের দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ এক সময় শশাঙ্কর দিদিমা তাঁহার মৃত কন্যার নাম করিয়া একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার যে কপাল মন্দ—

সামান্ত দুঃখে যে সে এমনি করিয়া মরে নাই, ইহাই বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া তিনি চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। অমিয়র মন একেবারে দুঃখে ও সংকোচে এতটুকু হইয়া গেল—তিনি অধোমুখে চুপ করিয়া বসিয়া সমস্ত অনুযোগ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। রাত্রে আহারান্তে শয়ন করিয়া অমিয় অজয়কে প্রশ্ন করিলেন—তোর দাদার সঙ্গে কথা হলো অজু?

অজয় বলিল, কথা হয়েছে জ্যাঠামণি। কিন্তু দাদা যেতে পারবেন না আমাদের সঙ্গে।

—কেন রে?

—তিনি যে কাল তাঁর মামার সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছেন!

—দিল্লী কেন?

—তাঁর মামার কি কাজ আছে—দাদাকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন সব পুরানো কীর্তি দেখাতে।

—কিন্তু তুই বল্লি না আমাদের সঙ্গে যাবার কথা?

—বলেছি তো।

—কি বল্লে সে?

—দাদার ইচ্ছা নেই জ্যাঠামণি—তিনি বলেন গ্রামে যে জল কাদা, জঙ্গল, ম্যালেরিয়া তার মধ্যে কি মানুষ থাকতে পারে?

—কালই তাহলে ওরা দিল্লী যাবে?

—তাই তো কথা।

অমিয় আর একটা কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—ব্যথায় সারা বুক তাঁহার টন টন করিতে লাগিল। পরের দিন সকালবেলা অজয় খবর লইয়া আসিয়া বলিল—দাদা চলে গেছেন জ্যাঠামণি।

—কোথায় রে?

—দিল্লী। কাল যে বল্লাম তাঁরা দিল্লী যাচ্ছেন?

—চলে গেছে?

অমিয় একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে চলিয়া গেল —অথচ একটি বারও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না—যাইবার পূর্বে

দেখাটি পর্যন্ত করিল না? অথচ সে তাহারই সন্তান। বেদনায় অপমানে সারা অন্তর অমিয়র রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পরে সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন—চল অঞ্জু, আমরা বাড়ি ফিরে যাই। অজয়েরও এ বাড়ির আবহাওয়া কিছুমাত্র ভাল লাগিতেছিল না—সে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল। কাপড় জামা লইয়া অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইতেই অজয় বলিল—একবার দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে না জ্যাঠামণি?

অমিয় বলিয়া উঠিলেন—না না অঞ্জু, কারু সঙ্গেই আর আমি দেখা করতে চাইনে রে—এ বাড়িতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শিগগির চল বেরিয়ে পড়ি।

দুইজনে যখন শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন—তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোয়ালন্দগামী কোন গাড়ি নাই। স্টেশন হইতে অজয়কে কিছু খাবার কিনিয়া খাওয়াইয়া সারাটা দিন নিজে অভুক্ত থাকিয়া চুপ করিয়া স্টেশনের বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিলেন।

অমিয় বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। দিন তাঁহার পুনরায় কাটিতে লাগিল। এখন হইতে বেশী করিয়া ধর্মগ্রন্থে মন দিতে লাগিলেন, বেশী করিয়া চরকা কাটিতে লাগিলেন। তবু মাঝে মাঝে মন তাঁহার হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে থাকে। নিজের পুত্র একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। এতটুকু সম্মান তাঁহার দিল না—এ সংসারে তবে তাঁহার কিসের বন্ধন? কিসের মায়া? সেদিন সন্ধ্যাবেলা এক মনে এই সবই ভাবিতেছেন। অজয় ছিল তাঁহার পাশে বসিয়া—সহসা অজয়কে নিজের বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—অঞ্জু! জ্যাঠামণি! অমিয়র কণ্ঠ যেন বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

অজয় বিস্মিত হইয়া জবাব দিল—কেন জ্যাঠামণি?

—তুই তো তোর দাদার মত কখনও আমাকে ছেড়ে যাবিনে অঞ্জু? তা হলে কি নিয়ে বাঁচবো আমি? আমার মন যে দিনরাত

হু হু করে কেঁদে ওঠেরে! বলিয়া তিনি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অজয় তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া দুই হাত দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি চিরদিন তোমায় ভালবাসবো—চিরদিন তোমার কাছে কাছে থাকবো জ্যাঠামণি।

অমিয় তাহার গায়ে মাথায় বারে বারে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—তাই থাকিস জ্যাঠামণি, তাই থাকিস।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অজয় এবার ম্যাট্রিক দিবে। মন দিয়া লেখাপড়া করিয়া সে ইতিমধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া ইস্কুলে নাম করিয়া ফেলিয়াছে। সেদিন কল্যাণী অজয়ের জামার পকেট হইতে টুকিটাকি কাগজপত্র বাহির করিয়া রাখিয়া জামাটি পরিষ্কার করিবার জন্য যাইতেছিল। এক পাশের পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। কল্যাণী কাগজখানি খুলিয়া দেখিতে গেল। কাগজখানির নাম "শঙ্খ"। হঠাৎ এমন সময় অজয় ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল—ওকি দেখ্‌ছো মা।

কল্যাণী অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—এ কি কাগজ রে? তোর পকেটে ছিল।

অজয় কল্যাণীর আরও কাছে আগাইয়া আসিয়া গলা খাট করিয়া বলিল—ওখানা বিপ্লবীদের কাগজ মা! এই সংখ্যাটি গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেছে—আমি একজনের কাছ থেকে গোপনে সংগ্রহ করে এনেছি, আবার পড়ে তাকে ফেরত দিতে হ'বে। কাউকে বলো না যেন মা? ধরা পড়লে দুবছরের জেল হ'তে পারে!

কল্যাণী কোন কথার জবাব না দিয়া নির্বাক হইয়া অজয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অজয় কল্যাণীর হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া চলিল—এই দেখ মা, বর্ধমান ম্যাজিস্ট্রেট্

খুনের মামলার আসামী জগৎমোহনের ছবি! ফাঁসির পরে ছবি তোলা। গলায় দেখ মা ফাঁসির দড়ির দাগ দেখা যাচ্ছে। কাগজ-খানির এ সংখ্যাটির নাম জগৎমোহন সংখ্যা।

কল্যাণী এতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথারই জবাব দেয় নাই। অজয় মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, তাহার মার দুই চোখ অশ্রুতে টলমল করিতেছে।

—ও কি মা, কি হয়েছে তোমার? এতক্ষণে সেই অশ্রু ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অজয় অবাক হইয়া কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কেন মা, কি করেছি আমি যে, তুমি এমনি করে কাঁদবে?

কল্যাণী চোখ মুছিয়া বলিল—কিন্তু এ সর্বনেশে বুদ্ধি তোকে কে দিল অঞ্জু—কেন তুই এই সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস্—কে তোকে এই সব বুদ্ধি দেয় বল্‌তো?

অজয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল—তার নাম আমি তোমার কাছে বল্‌তে পারবো না মা! কিন্তু অন্যায় এতে কি শুনি?—

—অন্যায় নয়? একশোবার অন্যায়।

—হোক্ অন্যায়, দাও তুমি আমার কাগজ। অজয় কাগজখানি লইবার জন্য হাত বাড়াইল কিন্তু কল্যাণী নিজের হাতের মুঠোয় কাগজখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া বলিল—না এখন পাবি না। কাল ইস্কুলে যাবার সময় নিয়ে যাস্—যার কাগজ তাকে দিয়ে আস্‌বি।

অজয় ক্ষুণ্ণমনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী হাতের মুঠোর কাগজখানি তেমনি করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ বারে বারে তাহার সারা অন্তর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—অঞ্জুও শেষে এই সর্বনাশের নেশায় মাতিয়া উঠিল? এই ছেলের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা কে জানে? তাহার পিতৃ পিতামহের রক্তের ধারা কি সে পাইবে না? তাহার সকল স্নেহ মমতা এক নিমিষে কাটিয়া কবে কোন বিপদ সাগরে

ঝাঁপাইয়া পড়িবে কে জানে? দুষ্মন্ততনয় ভরত, আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার গর্ভে জন্মিলে কি হইবে—শৈশবেই সে সিংহশিশু ধরিয়া তাহার দাঁত গণিয়া দেখিত। কল্যাণীর স্নেহাঞ্চলের ভিতর হইতে যে অজয়ের পূর্বপুরুষের রক্ত পাগল হইয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে! সকল কথা কল্যাণী অমিয়কে জানাইলেন। শুনিয়া অমিয় নিজেও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সর্বনাশা হিংসার পথ শেষটায় অঞ্জু আশ্রয় করিবে না কি? সন্ধ্যার পর তিনি অজয়ের পাশে বসিয়া তাহাকে সত্যাগ্রহের শক্তি, অহিংসার শক্তি বুঝাইতে লাগিলেন। তুলনা দিলেন শ্রীচৈতন্য আর চাঁদ কাজীর কথা—মার খাইয়া জগাই মাধাইকে প্রেম দেওয়ার কথা, হরিদাসের বেত্রাঘাতে শরীর জর জর হইয়াও হরিনাম না ভুলিবার কথা। বলিলেন, এই আত্মিকশক্তিই মহাত্মাজী আজ জাতিকে শিক্ষা দিতেছেন। এমনি করিয়াই ভারতবাসী শক্তি সঞ্চয় করিবে এবং এই পথেই স্বরাজ আসিবে। এই নিরস্ত্র জাতির—যুক্তি ও নীতি কোনদিক দিয়াই যে হিংসার পথে যাওয়া উচিত নয় তাহা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া চলিলেন। এমনি করিয়া নানা যুক্তিতর্ক টানিয়া আনিয়া অজয়কে বুঝাইয়া অমিয় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আজ আমার কাছে কিন্তু তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে অঞ্জু—আর কখনও এই সব কাগজপত্র পড়বিনে—এই সব দলের লোকের সঙ্গে মিশবিনে। কিন্তু অজয় সেই যে প্রথম হইতে একেবারে নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল, অমিয়র বারে বারে পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও একটা কথাও কহিল না। অবশেষে অমিয় রাগ করিয়া তাহার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। পরের দিন ইস্কুলে যাইবার সময় সে একমনে এই সবই ভাবিতেছিল —কেন সে বিপ্লবীদের বই কাগজ পড়িবে না—কেন তাহাদের সহিত মিশিবে না? উল্লাসদার কলেজ বন্ধ হইলে যতদিন তিনি বাড়ি থাকেন অজয় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে—কই তাঁহার চরিত্রে তো এতটুকু অন্যায় বা পাপ তো সে দেখিতে পায় নাই। উল্লাসদা বলেন সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কোনদিনই তো কোন দেশ স্বাধীন হয়

নাই! যাহা পৃথিবীর কোথাও কোনদিন সম্ভব হয় নাই—আমাদের দেশে কি সেই অসম্ভব জিনিসই সম্ভব হইবে? তবে তাহার বাবা কেন এই পথের পথিক হইয়া—সেই সাত সমুদ্রের ভিতরের দ্বীপে বন্দী হইয়া আছেন? না, জ্যাঠামণি ভুল করিয়াছেন—ভয় পাইয়াছেন। আর অহিংসা অসহযোগে যদি দেশ স্বাধীনই হইবে মহাত্মা কেন আন্দোলন থামাইয়া দিলেন? এমনি করিয়া চুপ করিয়া তাহারা বসিয়া থাকিবে কেন? দেশের কথা যখন সে উল্লাসদার কাছে শোনে—তখন তাহার শরীরের রক্ত যে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে। কিন্তু আজিও তো তাহার বয়স হয় নাই—এখনও সে এই দলে মিশিতে পারে নাই। কবে তাহার সময় হইবে—কবে সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ঢুকিবে কবে এই দলে মিশিবার সৌভাগ্য তাহার হইবে। বাবার কথা মনে করিয়া অজয়ের চোখের সম্মুখে যেন তাহার বাবার মূর্তি স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিল। তিনি সেই আন্দামানে কত না দুঃখে কত না কষ্টে দিন কাটাইতেছেন! ভুল তিনি করেন নাই, অন্যায় তিনি করেন নাই। অজয় দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া তাহার বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—যারা বলে তুমি ভুল পথে গিয়েছো—তারা তোমায় চিন্‌তে পারেনি বাবা—আমি তোমায় বুঝেছি। তুমি এই আশীর্বাদ কর বাবা—তোমার অঞ্জুও শক্তিমান হোক্‌, তোমার অঞ্জু দেশের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিক্‌। মায়ের অশ্রু, জ্যাঠামণির অভিমান—তাহার মন হইতে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

কয়েক বৎসর পরের কথা। অজয় বি, এ পড়ে। কলিকাতার কোন নামকরা কলেজে সে ভর্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু কলেজ হোষ্টেল বা কোন মেসে সে থাকে না। কলিকাতার বাহিরে টালার একটি বড় রাস্তার ধারে আজ এক বৎসর ধরিয়া সে বাস করিতেছে। এখান

হইতে এতটা পথ কোন দিন বা হাঁটিয়া কোন দিন বা ট্রামে বাসে গিয়া কলেজ করে। বড় রাস্তা হইতে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটি দোতলা বাড়ী। নীচের তলায় ঠাসাঠাসি করিয়া সারা বৎসর পাটের গাঁইট কিংবা ধনে মশুরী বোঝাই করা থাকে—তাহারই এক অন্ধকার কোণ দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে পাঁচ ছয়খানা ঘর—দুইখানা ঘর ভাড়া লইয়া এক উড়ে-ঠাকুর হোটেল করিয়াছে—বাকী তিন চারিখানি ঘরে কয়েকজন পাটের অফিসের কেরাণী ও কয়েকজন ছোটখাট দালাল বাস করে। ইহারা সকাল সকাল আহার করিয়া বাহির হইয়া যায়, আর অন্তত রত্রি দশটার পূর্বে কেহ বাসায় ফিরিয়া আসে না। অজয় রাস্তার দিকের ঘরটি লইয়াছে। ঘরে সে একা থাকে। দরজা জানালা কম বলিয়া দোতলাটিও প্রায় নীচের তলার মতই অন্ধকার। অজয়ের ঘরের পাশে যে সরু একখানি বারান্দা আছে—তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইলে তবে নীল আকাশ চোখে পড়ে—বাহিরের তাজা বাতাস আসিয়াও চোখে মুখে লাগে। ১৯২৮ সালের একদিন শীতের একেবারে শেষ বেলায় অজয় নিজের ঘরে বন্ধ হইয়া একমনে কি লিখিয়া চলিয়াছিল—কিছুক্ষণ ধরিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া সে সমস্ত লেখাটি পড়িয়া যাইতে লাগিল :—

কোন্ পথে ?

হে ভারতের জাগ্রত যুবশক্তি, আজ তোমাদের সম্মুখে এই প্রশ্ন সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে—কোথায় পথ ? কোন্ পথ ? ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাঙ্‌লার যুবশক্তি একবার ইহার মীমাংসা করিয়াছিল। শত সহস্র নির্ভীক প্রাণ সেদিন, জীবন-মরণের প্রশ্ন ভুলিয়া—কর্ত্তব্যের পায়ে অবহেলায় প্রাণ বিলাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের বক্ষ লক্ষ্য করিয়াই একদিন অত্যাচারীর বজ্র তাহার সমস্ত দাহিকাশক্তি লইয়া নামিয়া আসিয়াছিল। জাগ্রত যুবশক্তি—অকাতরে নিজেদের বুক পাতিয়া সেই বজ্র গ্রহণ করিতে সেদিন এতটুকু দ্বিধা করে নাই। ফাঁসির মঞ্চ,

দ্বীপান্তর, দীর্ঘ কারাবাস, কিছুই তাহাদিগকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই। তারপর ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন যাঁহারা—সোনার পাথরের বাটীর মত তাঁহাদের স্বরাজের অদ্ভুত ব্যাখ্যা তাঁহারা সেদিন দেশকে শুনাইলেন। বৃটিশ প্রভুদের মাথার উপরে রাখিয়া তাহারই অধীনে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে! তবু ভারত ভুলিল। দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক সেই আন্দোলনেও আলেয়ার পিছনে অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইল! কিন্তু অনিবার্য ফল তাহার ফলিতে বিলম্ব হইল না। সেই ব্যর্থতায় কেহ হইলেন—সন্ন্যাসী—আজানুলম্বিত খদ্দরের কটিবাসে দেহ আবৃত করিয়া ধর্মগ্রন্থ সম্বল করিয়া সংসারবিমুক্ত হইয়া রহিলেন। আর একদল আবার গৃহবাসী হইয়া সংসারধর্মে মন দিয়া নিশ্চিন্ত আরামের কোলে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু এমনি করিয়াই কি দেশের সকল আশা-ভরসা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে? না তা কখনই হইবে না। যে অগ্নি ১৯০৫ সালের পর প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাই আজ আবার দাবানলের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হে ভারতের জাগ্রত যুবশক্তি—হে বাঙ্‌লার তরুণের দল, তোমরা আজ বিভ্রান্ত হইও না। অহিংসা অসহযোগের মায়ামরীচিকায় আর ঘুরিয়া বেড়াইও না। দেশের রক্ত, যে রক্ত, রক্তচোষার দল নিঃশেষে পান করিয়া চলিতেছে, শিশুর মুখের মাতৃস্তন্য, রুগ্নের পথ্য—বুভুক্ষুর অন্ন, যাহারা কাড়িয়া লইয়াছে—দিনের পর দিন অত্যাচারে সারা দেশকে যাহারা জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে—আজ সেই শত্রুর সহিতই তোমাদের যুদ্ধ। হিংসা, অহিংসার কথা এখানে শুধু অবান্তর নয়—চরম মূর্খতা। হে বিপ্লবীদল—আজ যাহারা কংগ্রেসের অধিবেশনে আসিয়াছ—তাহারা দেশের স্বাধীনতার আদর্শ যেন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিও না। যে প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা নাই—এমন কোন প্রস্তাবই তোমরা মানিয়া লইও না। স্মরণ রাখিও তোমাদিগকেই কংগ্রেসকে প্রকৃত বিপ্লবী দলে পরিণত করিতে হইবে—মিথ্যা অহিংসার মোহ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তোমরাই ডাক দিয়া যুবশক্তিকে বলিবে:—

"হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান ঝনন ঝনন
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক কম্পিত সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর তুলে লও, তোমার উদার জয়-ভেরী, করহ আহ্বান
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব, অর্পিব পরাণ॥"

বাহিরের দিকে চাহিতেই কাহার অস্পষ্ট মূর্তি অজয়ের চোখে পড়িল। অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে বিমলদা? বাহিরের ব্যক্তিটি ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিতে লাগিলেন—হাঁরে আমিই। পরে অজয়ের তক্তপোশের একপাশে চাপিয়া বসিয়া বলিলেন—তুই অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন অজয়, বোস্। অজয় বসিলে তাহার কাগজপত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এই সন্ধ্যাবেলা চুপ করে বসে কি লিখছিস রে?

অজয় বলিল—সেই যে বিজ্ঞাপনখানা লিখ্‌তে বলে পাঠিয়েছিলেন সেইখানা শেষ করলাম। শুনবেন—শুনুন, বলিয়া অজয় লেখাটি আগাগোড়া পড়িয়া গেল। পড়া শেষ হইলে বিমলদা বলিলেন—বেশ হয়েছে। কাল সকালে প্রেসে দিয়ে আসিস—বলিস, দশ হাজার যেন ছাপে।

অজয় কাগজ কলম সব গোছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছিল। বিমলদা বাতির আলোয় তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, তোর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন অজয়? মুখ চোখ যে শুকিয়ে উঠেছে। ভাল করে খাস্‌নে—উড়ে-ঠাকুরটা মোটেই ভাল পাক করে না বুঝি, নারে?

অজয় হাসিয়া বলিল—কে বলেছে এসব বাজে কথা আপনাকে? কেন মিছে চিন্তা করেন?

বিমলদা ধীরে ধীরে অজয়ের মাথাটি নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের ভিতরে হাতের আঙুল ডুবাইয়া চুলগুলিকে বারে বারে এলোমেলো করিয়া দিতে দিতে বলিলেন—আমি সব ঠিক পাইরে—সব ঠিক পাই। তুই কত বড় ঘরের ছেলে—কত আদরের ছেলে। এই খারাপ জায়গায় থাকা—এই কদর্য

আহার এ তো অনাহারেরই সামিল রে! পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু কি করবি ভাই, এ দুঃখ যে সইতেই হ'বে—এছাড়া যে আর পথ নাই। আর তুই তো শুধু একা নয়, অজয়—কত ছেলেকেই তো আমি এপথে টেনে এনেছি—সব্বাই তো এমনি কষ্টই সহ্য করছে—সবার দুঃখই যে আমার প্রাণে সদাসর্বদা বাজে রে। বিমলদা পুনরায় চুপ করিয়া আগের মতোই অজয়ের মাথার ভিতরে আঙ্গুল ডুবাইয়া তাহার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজয় ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা বিমলদা, একটা কথা বল্‌বো? বিমলদা বলিলেন—কিন্তু তোর অত সংকোচ কিসের অজয়?

—সংকোচ নয়, আমার ভারী হাসি পায় আপনার এই সব ব্যবহার দেখে। ঠিক মেয়েদের মত খাওয়াপরা নিয়ে বকেন—কোলে টেনে নিয়ে এমনি করে আদর করতে থাকেন—মনে হয় মা যেন পাঁচ বছরের ছেলেকে আদর করছে। ভাবি এত কোমল মন আপনার হ'লো কেমন করে? এত স্নেহ ভালবাসা এলো কোত্থেকে। কিন্তু আবার যখন অন্যরূপ আপনার চোখের সামনে ফুটে ওঠে, আপনার কীর্তিকলাপ যখন শুনি, তখন মনে হয় সারা ভারতবর্ষে বুঝি আপনার মত শক্ত লোক আর একটাও নাই।

বিমলদা হাসিয়া বলিলেন—আদর করবো না—কতটুকু বয়স তোর শুনি? স্নেহ ভালবাসা নিয়েই তো সংসার রে!—নইলে এপথে আমরাই বা নামতে যাব কেন? আমরা দুঃখভোগ করি এইজন্যই তো যে, পৃথিবী থেকে দুঃখ দৈন্য দূর হয়ে যাক—শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়—সমস্ত মানুষই মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ পাক্। এই তো প্রেম, এই তো ভালবাসা।

অজয় পুনরায় হাসিয়া বলিল—আর অন্য যে সব রোমাঞ্চকর কথা শোনা যায়—সে সব?

—সে সব তো সত্যিকারের জিনিস নয় রে। মানুষ খুন করবার জন্য তো মানুষের সৃষ্টি নয়। এই যে দেশে দেশে আজ, নিপীড়িত

মানব কণ্ঠের উপরে পা দিয়ে—মানবরূপী অত্যাচারী দানব দাঁড়িয়ে আছে, গণ-কণ্ঠ আজ নীরব—মানুষ আজ শাসনে শোষণে পশুতে পরিণত—এতো তারই জন্য প্রয়োজন হয়েছে অজয়! নইলে যে মানুষকে, মানুষ এত ভালবাসে—তারই রক্তপাত করতে চাইবে কেন? পৃথিবীব্যাপী আজ এই বিদ্রোহ ও অসন্তোষ জ্বলে উঠেছে—আমাদের দেশ তো এ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—যে আহ্বান আজ এসেছে তাকে উপেক্ষা করলে যে পাপ হ'বে। বহুক্ষণ নীরব থাকিবার পর অজয় পুনরায় বলিল—আচ্ছা বিমলদা, এত ভালবাসতে আপনি শিখলেন কোথা থেকে? বিমলদা হাসিয়া জবাব করিলেন—এও আমার সেই গুরুরই দান অজয়!

—কার? মিঃ মুখার্জির?

—হাঁ অজয়, সঙ্গ আমি তাঁর বেশীদিন পাই নাই। এদেশ থেকে পালিয়ে যাবার বৎসর দুই আগে তাঁর সঙ্গে হয় আমার দেখা। সেই থেকে আমার মাস্টারী ঘুচলো—সংসারে যেটুকু বন্ধন ছিল, তাও গেল—বেরিয়ে পড়লাম আমি এই পথে।

অজয় বাধা দিয়া বলিল—মিঃ মুখার্জির কি এদেশ ছেড়ে না গিয়ে কোন উপায়ই ছিল না?

—না, কোন উপায়ই ছিল না ভাই। যাঁরা তাঁর সহকর্মী, একান্ত বিশ্বাসী—কেউ গেল তারা ফাঁসিতে, কেউ গেল দ্বীপান্তরে—কেউ দীর্ঘকালের কারাবাসে। এদিকে তাঁর নিজের মাথাটির জন্যও গভর্নমেণ্ট হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে দিয়েছে। তবু তিনি এতটুকু ভীত হননি। এমনি করে সাত আটটি বৎসর ধরে আত্মগোপন করে, সারা ভারতবর্ষের নগরে নগরে সমিতির কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু এদিকে গোয়েন্দা-পুলিসে দেশ ছেয়ে গেল—গভর্নমেণ্ট তাঁকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। বার দুই তো অতি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। অবশেষে অনেক ভেবে—এদেশ ছেড়ে যাওয়াই স্থির করলেন। বিদায়ের দিন—আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—বিমল, বাঙলা দেশের সমস্ত ভার আমি তোমার

উপরেই দিয়ে গেলাম। আমি একান্ত অভিভূতের মত তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্লাম—আমাকে ?

তিনি হেসে বল্লেন—হাঁ তোমাকেই।

আমি পুনরায় একান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বল্লাম—এত বড় গুরুভার কি আমি বইতে পারবো ?

তিনি গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন—বিমল, দায়িত্ব এড়ানও একপ্রকার অপরাধ। এ ভার বইবার শক্তি যে তোমার আছে—সে আমি জানি। কিন্তু এ ভার গ্রহণ করতে হলে যতখানি আত্মত্যাগের প্রয়োজন—ততখানি দিতে কার্পণ্য করলে তো চলবে না। জোর করে নিজেকে ছোট ভেবে দায়িত্ব অস্বীকার যে ভীরুতারই নামান্তর। আর একটি কথাও না বলে—তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলাম —তিনি আমার মাথায় ডান হাতখানি রেখে মনে মনে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

—তিনি এখন কোথায় আছেন বিমলদা ?

—রাশিয়ায়। কিন্তু যেখানেই থাকুন, অজয়, স্থির জেনো—তিনি সেখানে বসেও দেশের কাজই করছেন। তাঁর মাতৃভূমিকে তিনি একটা দিনের জন্যও ভোলেননি।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল।

কিছুক্ষণ পরে বিমলদা বলিলেন—এবার উঠি অজয়। অজয় তাঁহার কোল হইতে মাথা তুলিয়া লইয়া বলিল—আবার কবে আসবেন বিমলদা ?

—তা কি ঠিক করে বলতে পারি রে! যখনই সময় পাই —আসবো।

অজয় মুখ ভার করিয়া বলিল—ইস্ সময় পেলেই আসবেন কি না ? মনে করে দেখুন তো কতদিন পরে আজ এলেন ?

—এতো মিথ্যে অনুযোগ ভাই। তুই কার সন্তান অজয়, তাকি আমরা জানি নে ? কত বড় ভরসা আমাদের তোর উপরে ? বট-গাছের বীজ ভাল জমিতে পড়লে—তা থেকে তো বটগাছই হয় রে!

একদিন সেও বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে—কত জীব জন্তুর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তোর উপরেও যে আমাদের সেই ভরসা ভাই। তাই তো যেখানেই থাকি, আমার মনের ভিতরে দুটি চোখ সদাসর্বদা সজাগ দৃষ্টি মেলে—তোর উপরেই চেয়ে থাকে। একথা সব সময় মনে রাখি অজয় যে, একদিন তুইও বড় হবি—বড় হয়ে নিজের পিতৃমুখ উজ্জ্বল করে তুলবি। লোকে বলবে উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান! কথা শেষ করিয়া বিমলদা পরম গর্বে আর একবার অজয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। অজয় নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

চত্বারিংশ অধ্যায়

কয়েকদিন পরে—একদিন সকালবেলা অজয় ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, রাস্তার উপরে একখানা রিক্সায় বিছানাপত্র চাপাইয়া তাহার জ্যাঠামণি সম্ভবত তাহারই বাসার ঠিকানাটি খুঁজিতেছেন, অজয় এক নিমিষে লাফাইয়া নীচে নামিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। অমিয় কিন্তু কল্পনাও করেন নাই যে, এমন বাড়িতে অবশেষে অজয় বাস করিবার স্থান নির্বাচন করিয়াছে।

তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—এই বাড়িতে তুই থাকিস অঞ্জু! এই অন্ধকার ঘর—এই কদর্য জায়গা!

অজয় হাসিয়া বলিল—কেন, বেশতো নিরিবিলি, জ্যাঠামণি। অমিয় বাধা দিয়া বলিলেন—না, না, এমন জায়গায় তুই কিছুতেই থাকতে পারবিনে অঞ্জু!

অজয় হাসিয়া বলিল—হাত মুখ ধুয়ে, তুমি একটু বিশ্রাম কর জ্যাঠামণি—তারপর না হয় ওসব শোনা যাবে। স্নানাহার সারিয়া

অমিয় অজয়কে কাছে ডাকিয়া বলিলেন একটা—কাজ আছে বলছি শোন অঞ্জু!

অজয় বলিল—কংগ্রেসে এসেছেন তো?

অমিয় বলিলেন—নারে শুধু কংগ্রেসেই আসিনি। আরও যে একটা কাজ আছে অঞ্জু। পরে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তুই শুনেছিস অঞ্জু—তোর দাদা আই, বি,-তে চাকরি নিয়েছে?

অজয় জবাব দিল—শুনেছি জ্যাঠামণি।

—কিন্তু তাকে যে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে রে? শেষে আমাদেরই বংশে আই, বি, হ'বে? খবরটি শুনে পর্যন্ত আমি যে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি।

—কিন্তু আপনি কেমন করে তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন জ্যাঠামণি। তাঁর মামা যে মস্ত বড় আই, বি, অফিসার। তিনি তো তাঁর কথা ঠেলতে পারবেন না?—

—তা হোক তবু আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে হ'বে—আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে হ'বে। আমি তার বাবা, আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো—অনুনয় করে বলবো—কেঁদে কেটে ধরবো, তবু কি সে শুনবে না? বলিতে বলিতে অমিয়র দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। জ্যাঠামণির দুঃখে অজয়ের বুক টন টন করিতে লাগিল। যে লোক অতি নিষ্ঠার সহিত দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন তাঁহার কাছে নিজের একমাত্র পুত্রের এই বিরুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ যে কত বড় বেদনাদায়ক তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

—আপনি ভাববেন না জ্যাঠামণি।—আমি আজ সব খোঁজ খবর নিয়ে আসবো—কাল দাদার সঙ্গে দেখা করা যাবে। আমি খবর নিয়েছি—তিনি কলকাতায় আছেন।

কিন্তু কোনও ফল হইল না। অমিয় পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন—অনুনয় করিলেন—এমন কি চোখের জল পর্যন্ত ফেলিলেন। তবু শশাঙ্কর মন ভিজিল না। অগত্যা আর একবার অপমানিত হইয়া

অমিয় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিজের পুত্র গভর্নমেন্টের গুপ্তচর হইল! তিনি নিজের কাছে ইহার কি জবাব দিবেন—বন্ধুবান্ধবকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন? কংগ্রেস অধিবেশনের আরও দুই তিন দিন বিলম্ব আছে—কাজেই এই কয়টা দিন তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইবে। কিন্তু মন তাঁহার কলিকাতায় টিকিতেছিল না। পুত্রের এই পতন তাঁহার মনে বারে বারে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল।

অজয়ের বাসার খানিকটা দূরে দেশবন্ধু পার্ক। সেদিন বিকাল বেলা অমিয় এই পার্কটির ভিতরে ঘুরিতেছিলেন—আর এক-মনে এই সবই চিন্তা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটি লোকের উপরে তাঁহার নজর পড়িতেই তিনি ডাকিয়া বলিলেন—আরে রমেশ যে! রমেশ আগাইয়া আসিয়া তাঁহার একখানি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, আমি ভাই। কতদিন পরে দেখা। সেই যে তুমি সেবার জেল থেকে বেরুলে—তারপর আর দেখা নাই।

—না আর দেখা হয়নি।

—কিন্তু তোমার চেহারা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছে কেন রমেশ? কোন অসুখ বিসুখ হ'য়েছিল কি?

রমেশ ম্লান হাসিয়া বলিলেন—অসুখ? কই তেমন কিছু হয়নি তো। কথা বলিতে বলিতে দুই বন্ধু পুকুরের ধারে এক নিরালা কোণে ঘাসের উপরে বসিয়া পড়িলেন।

অমিয় বলিলেন—তুমি সত্যি একেবারে বুড়ো হয়ে উঠেছো রমেশ। তারপর আজকাল কি করছো—তোমাদের আশ্রমের খবর কি? এ কয় বছরের ইতিহাস আমায় বল শুনি।

রমেশের দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল—অমিয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমার কি হ'য়েছে বল তো রমেশ।

রমেশ সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—কিছু হয়নি ভাই। আমার ইতিহাস শুনবে?—জেল থেকে বেরিয়ে আশ্রমের চরকা ও তাঁত

নিয়ে লেগে গেলাম। কিন্তু তুমি তো সবই জানো ভাই—টাকা-পয়সা আমার বিশেষ কিছুই ছিল না। এদিকে কংগ্রেস থেকেও কোন সাহায্য পাইনি। কংগ্রেসে তো স্বরাজিস্টদের এতদিন ছিল রাজত্ব—আমাদের দিকে কে তাকাবে বল! এমনি করে আর কতদিন চলে? সংসারে তখন আমার দুটি ছেলে—একটি মেয়ে, আমি আর স্ত্রী—এই পাঁচটি প্রাণী। নিদারুণ অনটনে দিন কাটতে লাগলো। চরকার সূতো গ্রাম থেকে কিনে এনে তাঁতে বুনে যা লাভ হ'তো—তাই দিয়ে চলতো আশ্রম—তাই দিয়ে চলতো সংসার। গত বৎসর ছোট ছেলেটির টাইফয়েড হ'লো—গ্রামের ডাক্তাররা দয়া করে বিনা ভিজিটে দেখাশুনা করলেন—কিছু ঔষধপত্রও দিলেন—কিন্তু তাঁদেরও টাকার ঔষধ—কত আর বিনা পয়সায় দেবেন তাঁরা। ছেলেটি মরে গেল অমিয়! বার বছরের ছেলে। তা এক প্রকার বিনা চিকিৎসায়ই মরলো বলতে হ'বে বৈকি? তা ছাড়া কি জান, এতদিন অত্যন্ত বিলাসিতার ভিতরে মানুষ হ'য়ে—তারা তো আমার মত কষ্ট করতে পারতো না। ভাল করে খেতে না পেয়ে শরীর তাদের শুকিয়ে উঠেছিল।

রমেশের সকল শাসন অমান্য করিয়া এবার দুই চোখের জল টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অমিয় তাহার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—তুমি চুপ কর ভাই আর শুনতে চাইনে। আমি তো জানতাম না ভাই কি দুঃখ তুমি পেয়েছো। আমি ভুল করেছি—আমি অন্যায় করেছি।

চোখের জল মুছিয়া রমেশ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—তোমাকে আমি চিনি অমিয়। তুমি কত মহৎ, তুমি কত উদার—ব্যথা তুমি কাউকে দিতে পার না। কিন্তু একদিন যে সত্যই বন্ধু বলে তোমাকে ভাল বাসতাম—আজও বুঝি সে ভালবাসা একেবারে মরে যায়নি। তাই তো আমার দুঃখের অংশ তোমাকেও গ্রহণ করতে হ'বে। আমাকে বল্‌তে দাও।—ছেলের শোকে স্ত্রী একেবারে যেন পাগল হয়ে

গেল। কিন্তু দিনে দিনে সে শোকও সইলো, একদিন সে বল্লে—"এপথ এবার ছাড়—আর তো সহ্য হয় না! এ দুটি ছেলে মেয়েকেও কি বাঁচতে দেবে না"? কিন্তু দেশসেবার যে ব্রত একদিন প্রতিজ্ঞা করে গ্রহণ করেছি—তাকে কেমন করে ছাড়ি বল? স্ত্রীকে বুঝাতে আমার বেশী বেগ পেতে হ'লো না, এমনি করে আরও কিছুদিন গেল। তোমাকে বলতে তো লজ্জা নাই অমিয়—কতদিন আমরা শুধু নুন ভাত খেয়ে কাটিয়েছি। তবু টিকে ছিলাম কিন্তু আর পারলাম না ভাই—আজ আর নুন ভাতও সবদিন জোটাতে পারি না। এবার আমি পরাজিত হয়ে গেলাম ভাই—আর দেশে থাক্‌তে পারলাম না। তাই আজ দিন পনর ধরে কলকাতায় এসেছি—যদি কোন একটা চাকরী কোনক্রমে জোটাতে পারি। সত্যাই পতন আমার হ'য়েছে অমিয়—কিন্তু ভাই, আমার মনটা যদি তুমি দেখ্‌তে পেতে—সেখানে এই পতনের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত অহরহ চলছে। অমিয় একটা কথাও কহিলেন না—শুধু রমেশের হাতখানি তেমনি করিয়া ধরিয়াই বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দুই বন্ধু তেমনি করিয়াই পাশাপাশি বসিয়া একের অন্তর দিয়া অন্যের অন্তরকে যেন অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে অমিয় ধীরে ধীরে ডাকিলেন রমেশ!

রমেশ জবাব দিলেন—কেন ভাই।

—একটা কথা তোমাকে আমার রাখতে হবে—না বলতে পারবে না। না করলে আমি ব্যথা পাব। বলিয়া নিজের পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া খান চারেক দশ টাকার নোট রমেশের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—আমার কাছে এই ছিল ভাই। আর চাকুরী তুমি গ্রহণ করো রমেশ—মনের কোণে এতটুকু দ্বিধা রেখো না। তুমি যতখানি ত্যাগ করেছো কয়জন লোক তা পারে ভাই? তুমি এরপর যে অবস্থায়ই থাক—যেখানেই থাক—দেশ তোমাকে ভুলে যাবে না—এ বিশ্বাস রেখো। রমেশ ধীরে ধীরে নোট চারিখানি নিজের পকেটে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমার দানকে

অস্বীকার করে, তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনে ভাই—এ টাকা আমি নিলাম।

ধীরে ধীরে রমেশের দেহ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। অমিয়র বুকের অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এই সেই রমেশ—যে, জিলা ইস্কুলের হেড্ মাস্টার ছিল—মাসে পাঁচশো টাকা বেতন পাইত—বেশভূষায় ছিল খাঁটি সাহেব।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ইহারই এক বৎসর পরে আবার একদিন সন্ধ্যাবেলা বিমলদা আর অজয়ের ভিতরে কথা হইতেছিল। এবার লাহোর কংগ্রেসে বৃটিশ সম্পর্কশূন্য পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। এবং মহাত্মা গান্ধীকে আসন্ন আন্দোলন পরিচালনা করিবার সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারীকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করিয়া এবং এইদিনে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য পাঠ জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি কার্যতালিকা প্রতিপালন করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। দেশ অপূর্ব উৎসাহে এই অনুষ্ঠান পালন করিয়াছে—কলিকাতার প্রতি গৃহে ও পার্কে প্রাতঃকালে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। বিকালে প্রত্যেকটি পার্কে অসংখ্য নর-নারী মিলিত হইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল—শুধু কলিকাতাই নহে—সমস্ত ভারতবর্ষময় নর-নারী বিপুল আগ্রহে এই দিনটির সমস্ত কর্মসূচী প্রতিপালন করিয়াছে। ইতিমধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গের জন্য ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্বে বিপ্লবী কর্মিগণের সহিত কংগ্রেসের যেটুকু আদর্শগত প্রভেদ ছিল —পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হওয়ায় এবং তাহারই উদ্দেশ্যে আন্দোলন ঘোষণা করায় সে প্রভেদ দূর হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবী কর্মিগণও এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অবশ্য ইতিপূর্বেই ভবিষ্যতে কংগ্রেসের এমনি একটি

রূপ কল্পনা করিয়াই তাঁহারা প্রায় প্রতি জেলায় কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিলেন। অজয় এই আন্দোলনে যোগ দিবে স্থির হইয়াছে। উত্তর কলিকাতার একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সে তমলুকে লবণ আইন ভঙ্গ করিতে যাইবে। এই সব বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়া বিমলদা আজ বিদায় লইলেন। ইহার কয়েকদিন পরে অজয়, মা ও জ্যাঠামণির সহিত দেখা করিয়া যাইবার জন্য বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাবেলা অজয় মায়ের কাছে বসিয়া বলিল—তোমাকে কিন্তু মা অনুমতি দিতে হবে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—না চাইতেই অনুমতি দিয়েছি অঞ্জু! অজয় আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—না চাইতেই দিয়েছ কি রকম?

—তোর কথা কি আমি জানিনে বাবা! নইলে মা হয়েছি কেন বল্‌তো? আর যদি নিষেধ করি তা হ'লেই কি তুই শুনবি —এযে তোদের রক্তের ধারা! তখন প্রসন্ন মনে কেন তোকে বিদায় দেব না বাবা! আমি অনেক ভেবেছি রে—অনেক ভেবেই তোকে অনুমতি দিচ্ছি! অজয় মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল—সত্যি মা, তুমি এমনি করে চিনতে পার বলেই তো মা! কল্যাণী তাহাকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন—হয়েছে আর পাগলামো করিস্‌নে। অদূরে বারান্দায় মাদুরের উপরে অমিয় বসিয়াছিলেন। অজয় তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—মার অনুমতি পেয়েছি জ্যাঠামণি—এবার কিন্তু তোমার অনুমতি দিতে হবে। অমিয় হাসিয়া বলিলেন—নিজের মনের ভিতর থেকে যদি অনুমতি মেলে অঞ্জু, তার কাছে বাইরের আর সব মতামত যে মিছে! সেই অনুমতিই যদি তুই পেয়ে থাকিস্‌—আমি না বল্‌বো কেমন করে?

—আপনি নিজে কি করবেন?

অমিয় বলিলেন—আমি তো কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি অঞ্জু!

—কিন্তু আপনি যদি জেলে যান, মা একা একা কেমন করে থাকবেন?

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—মার কথা এতক্ষণে মনে পড়লো অঞ্জু!

অজয় বলিল—মনে অনেকক্ষণই পড়েছে মা, কিন্তু কিছুই তো ভেবে পাইনি!

অমিয় বলিলেন—আমিও তো আজ কয়দিন ধরে এই কথাটাই ভাবছি অঞ্জু—কি ব্যবস্থা করবো বুঝতে পারিনি। তোর দিদিমা বেঁচে থাকলে হয়তো ভাবতে হতো না। একা একা তো এই বাড়িতে থাকা সম্ভব হবে না। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর কল্যাণী পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—তোর অনুমতি চাওয়ার পালা তো শেষ হলো অঞ্জু! এবার আমি অনুমতি চাচ্ছি—তোর জ্যাঠামণিকে জিজ্ঞাসা কর মেয়েরাও তো আজ দেশের কাজে নেমে পড়েছে। সেদিন বিভাবতী দেবী এসেছিলেন বেড়াতে—তিনি একুশসালে জেল খেটেছেন—এবারও আন্দোলনে নামবেন। আমি কি তাঁরই সঙ্গে মিশে কিছু করতে পারিনে অঞ্জু! আমি তো তাঁকে কথা দিয়েছি—এখন তোদের সম্মতি পেলেই হয় বাবা। কেন মিথ্যে তোদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকবো? অজয় মহা উৎসাহে খাড়া হইয়া বলিল—তুমি নামবে আন্দোলনে মা! খুব ভাল হয়—বেশ হয় মা। উঃ আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো—আমার বাবা—আমার মা—আমার জ্যাঠামণি কেউ কম নয়—কেউ ছোট নয়।

কল্যাণী লজ্জিত হইয়া বলিলেন—তুই থাম্ অঞ্জু, ভারী বাজে বকিস।

অমিয় ধীরে ধীরে বলিলেন—এ কি তুমি সত্য বলছো বউমা? এ তোমার অভিমানের কথা নয় তো?

কল্যাণী জবাব দিল—না এ অভিমান নয়। দুঃখ অনেক পেয়েছি—কিন্তু তাই বলে অগৌরব তো কখনও অনুভব করিনি।

—তা হলে অনুমতি আমি দিচ্ছি বৌমা—আমি আশীর্বাদ করছি।

অজয় মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বেশ হলো জ্যাঠামণি—খুব ভাল হলো। হয়তো আর দুটি মাস পরে সবাই হবো জেলখানার

অতিথি। আমার বাবা জ্যাঠামণি—মা কেউ বাদ থাকবে না। যে কোন লোকের কাছে আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো—আমরা কেউ চুপ করে বসে থাকিনি—আমাদের যতটুকু ছিল—তার সবটুকুই দেশের জন্য নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি।

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—আবার! আত্মপ্রশংসায় পাপ হয় জানিস্?

অজয় লজ্জায় মায়ের কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া—নিতান্ত কচি ছেলের মতো তাহার দুই হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

একুশজন সঙ্গী লইয়া সেদিন রাত্রি দশটার ট্রেণে অজয় হাওড়া স্টেশন হইতে তমলুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সঙ্গীদের সকলেই তাহারই মত যুবক—সকলের চোখেই নূতন আশার আলোক—নূতন উৎসাহে পরিপূর্ণ। সারা রাত্রি জাগিয়া গাড়ীর ভিতরে সর্বক্ষণ স্বদেশী গান গাহিয়া, প্রতি স্টেসনে বন্দে মাতরম্, গান্ধীজী কি জয় ধ্বনি দিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল। পাঁশকুড়া স্টেসন হইতে বার চৌদ্দ মাইল পথ বাসে করিয়া গেলে তবে তমলুক শহরটি পাওয়া যাইবে। বাসের ভিতরেই বাইশটি প্রাণী অধীর আগ্রহে মাতিয়া উঠিল—কখন তাহারা তমলুকে পৌঁছিবে! বাস যেখানে আসিয়া থামিল সেখান হইতে আধ মাইলখানেক হাঁটিয়া তবে তাহারা সত্যাগ্রহ শিবিরে গিয়া পৌঁছিল। এই তমলুকই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত শহর—পৌরাণিক যুগের কত প্রাচীন কাহিনী এই শহরের সহিত যুক্ত—তাহার ইতিহাস হয়তো কোন্ অন্ধকার তলে হারাইয়া গিয়াছে—কে আর আজ তাহার খবর রাখে! সত্যাগ্রহ শিবিরটি একটি ভাঙ্গা দোতালা অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রকাণ্ড বাড়ি—চারিপাশে প্রাচীর। কতকাল ধরিয়া এমনি

করিয়া পরিত্যক্ত হইয়া আছে কে জানে? ইহাই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজবংশের প্রাসাদ। রাজবংশ আজ এই পুরাতন প্রাসাদের মতোই একটু দূরে একটা বাড়িতে এখনও কোনপ্রকারে টিকিয়া আছেন। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সহরটির ভিতরেও—অসংখ্য পুষ্করিণী। সত্যাগ্রহ শিবিরটির দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা মাঠ—এবং তাহারই শেষ সীমা দিয়া পাঁশকুড়া-তমলুকের চওড়া পথটি চলিয়া গিয়াছে। পূর্বদিকেও ফাঁকা মাঠ—এবং মাঠে অনেক গুলি পুষ্করিণী—প্রত্যেকটি পুষ্করিণীর চারিপাশ ঘিরিয়া শুধু তালগাছের শ্রেণী। মাঠের চারিপাশ দিয়া বাবলা গাছ। গ্রামের ভিতরে অসংখ্য নারিকেল ও তাল গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্থানটির মাটি প্রায় সর্বত্রই কিছুটা নোনা। লোকে একটু চেষ্টা করিলেই এখানে তাহাদের দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরী করিয়া লইতে পারে। তাই এইরূপ কতকগুলি স্থান বিশেষ করিয়া বাছিয়া লইয়া লবণ আইন অমান্যের জন্য নির্দিস্ট করা হইয়াছে। অজয়দের আসিবার পুর্বেই প্রায় দেড়শ জন স্বেচ্ছাসেবক এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহারই অধীনে মফঃস্বলে দূরে দূরে আরও চার পাঁচটি কেন্দ্র ঠিক করা হইয়াছে। অজয়রা ক্যাম্পে পৌঁছিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর মাঠের ভিতরের একটি পুকুরে গিয়া স্নান করিয়া আসিল। পুকুরটির জল পানের অনুপযুক্ত—নোনা—মুখে দিলে মুখ জ্বলিয়া যাইতে চায়। পরের দিন বিকাল পাঁচটায় এখান হইতে মাইলখানেক দূরে কোন গ্রামে লবণ আইন ভঙ্গ করা হইবে স্থির করা হইয়াছে এবং ঢোল দিয়া সর্বত্র ইহা ঘোষণা করিয়া সর্বসাধারণকে লবণ আইন অমান্যে যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে সহরের পাঁচ সাতজন বিশিষ্ট মহিলা কর্মী লবণ তৈরী করিবেন এবং অজয় লবণ আইন ভঙ্গের সময় সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিবে। দুইটি রাস্তার বাঁকে একটি পুষ্করিণী—সেই পুষ্করিণীর পাশেই উনুন কাটিয়া হাঁড়িতে লবণ-জল চড়াইয়া সিদ্ধ করা হইতে লাগিল। বহু পূর্ব হইতেই জন সমাগম

আরম্ভ হইয়া ইতিমধ্যেই স্থানটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে অজয় বক্তৃতা দিতে উঠিল। লবণ তৈরী হইল, কিছু বিক্রয় হইল এবং বিপুল উত্তেজনার মধ্যে নির্বিঘ্নে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইল। অজয় এবং অন্যান্য কর্মীরা যখন সত্যাগ্রহ শিবিরে ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ইহার একদিন পরে পুনরায় ঐস্থানে লবণ আইন ভঙ্গ হইবে—সেদিনের সভায়ই তাহা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরের দিনও আবার ঢোল দিয়া জানানো হইল। সেদিন সকাল বেলা অজয়রা জনকয়েক বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুইজন লোক আসিয়া ঢুকিল। একজনের মাথায় মস্তবড় একটা চাঙ্গারী এবং অন্যটির মাথায় মস্ত একটা পিতলের কলসী। তিনি লোক দুইটিকে পাশের একটি স্থান নির্দেশ করিয়া বলিলেন—রাখ্ সব ঐখানে নামিয়ে রাখ্। অজয় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—এসব কি?

লোকটি হাসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে এই সামান্য কিছু আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম।

চাঙ্গারী ও কলসী নামাইলে দেখা গেল এক চাঙ্গারী মুড়ি ও অন্তত সের পাঁচ সাত তালের গুড় এবং কলসীটি ভরা এক কলসী দুধ।

অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল—এত মুড়ি দুধ কি হবে?

—আজ্ঞে, আপনাদের সেবার জন্য আনা। দয়া করে তুলে রাখুন। ঘরের টাট্‌কা ভাজা মুড়ি নিজের গাছের তালের গুড়—দুধটাও নিজের বাড়িতেই ছিল—তাই ভাবনু যাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের জন্যে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে এসেছেন দিয়ে আসি তাঁদের সেবার জন্য কিছু—জিনিসগুলো তবু একটা দিন সৎলোকের সেবায় লাগুক। বলিতে বলিতে ভদ্রলোক অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া পুনরায় বলিতে বলিতে লাগিলেন—কাল আপনার বক্তৃতা শুনে একেবারে মেতে উঠেছিনু মশায়—বয়স যদি

থাক্‌তো আপনাদের মতোই স্বদেশসেবায় লেগে যেতাম। ভদ্রলোকের সত্যই বয়স হইয়াছে—মাথার চুলগুলো অধিকাংশই উঠিয়াছে পাকিয়া। গায়ে একটা বুক কাটা ফতুয়া পরনে একখানি একটু খাট কাপড়—হাতে একখানি তেল পাকানো বাঁকা বাঁশের লাঠি। আকারে প্রকারে এই দেশীয় ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হয়।

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নাম ?

ভদ্রলোকটি বলিলেন—শ্রীগদাধর সেনাপতি।

একে গদাধর, তাহাতে সেনাপতি—নামটি শুনিয়াই দুই একটি ছেলের মৃদুহাসির রেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু ভদ্রলোকের দৃষ্টি সেটুকু এড়াইল না। তিনিও হাসিয়া জবাব দিলেন—আজ্ঞে হাসবেন না আপনারা—সত্যিই এককালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেনাপতিই ছিলেন—খুব মস্ত যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা—সেকাল তো আর নাই—এমন আমাদের ঐ উপাধিটুকুই সার। ওটুকু এখনো ছাড়িনি। তারপর অজয়ের দিকে পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন—কাল আবার আইনভঙ্গ হ'বে তো—যাব আমিও। আমি মশায় ও পুলিশ ফুলিশের একটুও তোয়াক্কা করিনে। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা এখন উঠি—একদিন যদি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যান্‌—খুব খুশি হ'বো তাহ'লে। পরে পূর্ব'দিকের মাঠের প্রান্তসীমানায় অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐযে তালগাছ ঘেরা পুকুর—ঐ আমাদের বাড়ি—কতটুকু আর পথ! ভদ্রলোক আর এক প্রস্থ নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

পরের দিনও পূর্বাহ্নেই সমস্ত মাঠ অসংখ্য জনসমাগমে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অজয়রা যখন বড় রাস্তাটি হইতে মাঠের ভিতরে নামিতেছিল—তখন দেখিতে পাইল—উত্তর দিকের রাস্তা দিয়া মার্চ করিয়া বহুসংখ্যক পুলিশ এইদিকেই আসিতেছে। পুলিশ-বাহিনীর পিছনে ছিল একখানা মোটর গাড়ি। শুনিতে পাওয়া গেল আজ স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়াছেন। সুতরাং আজ যে ব্যাপার অতি সহজে নিষ্পন্ন হইবে না তাহা কাহারো

অনুমান করিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। নির্ধারিত সময়ে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে মহিলারা লবণ তৈরী আরম্ভ করিলেন। ধ্বনি থামিলে অজয় বক্তৃতা আরম্ভ করিল। কিন্তু মিনিট দশেক বক্তৃতা চলিতেই হঠাৎ জনতা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অজয় তাকাইয়া দেখে কাতারে কাতারে পুলিশ আসিয়া মাঠে ঢুকিতেছে এবং তাহাদেরই পিছনে অন্যান্য অফিসারসহ একজন ইউরোপীয়ান, সম্ভবত ইনিই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইবেন। অজয়ের বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। হঠাৎ পুলিশবাহিনী জনতার উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমগ্র জনতা একেবারে ভীত চঞ্চল হইয়া সমস্ত মাঠময় একটা দারুন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। পুলিশ আগাইয়া আসিতেছে দেখিয়া অজয় বক্তৃতা থামাইয়া সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে মহিলাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইতে বলিল এবং নিজে তাহাদেরই একপাশে দাঁড়াইয়া বারে বারে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে একটা প্রচণ্ড লাঠির আঘাত আসিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িল। তারপর আর একটি আর একটি এমনি অসংখ্য। তারপর কি হইল না হইল তাহার কোন ঘটনাই আর কিছুক্ষণ অজয়ের চোখে পড়িল না। পুলিশের দল এমনি করিয়া লাঠি কিল ঘুষি নির্বিচারে তাহার উপরে চালাইতে চালাইতে তাহাকে টানিয়া একেবারে পুষ্করিণীর ধারে লইয়া গিয়া তাহারই ঢালু পাড়ের উপর হইতে ভিতরের দিকে গড়াইয়া দিল। অজয় গড়াইতে গড়াইতে একেবারে জলের ধারে গিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক-গণকে রীতিমত প্রহার করিয়া কয়েকজনকে আশেপাশের রাস্তার ধারের নালার মধ্যে ও চষা ক্ষেতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ জনকে হাতকড়া পরাইয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রাস্তার উপরে লইয়া দাঁড় করাইয়াছে। মহিলারা লবণের হাঁড়ির উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া হাঁড়িগুলি রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগকে জোর করিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—কাহাকে কাহাকেও অল্প-বিস্তর আঘাতও করা হইয়াছে—সেই জ্বলন্ত উনুনের হাঁড়িগুলি

ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে গরম জল ছিট্‌কাইয়া আসিয়া অনেকের হাত পা অনেকখানি করিয়া পুড়িয়া ফোস্কা উঠিয়া গিয়াছে। একপাশে একটি স্বেচ্ছাসেবক তখনও জাতীয় পতাকাটি ধরিয়া ছিল—জনকয়েক পুলিশ তাহার উপরে কিল ঘুষি চালাইয়া পতাকাটি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ একটি বৃদ্ধ দৌড়াইয়া আসিয়া নিজে বিপুল বিক্রমে পতাকাটি ছিনাইয়া লইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। অজয় ইতিমধ্যে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কোনক্রমে পুকুরের পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়াছে। সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—বৃদ্ধ লোকটি আর কেহ নহে—সেই সকাল বেলার গদাধর সেনাপতি! সত্যই তো গদাধর তখন মিথ্যা আস্ফালন করিয়া যান নাই—সত্যই তো এমনি করিয়াই বিপদের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেনাপতি মহাশয়কেও অবিলম্বে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার পতাকা লইল ছিনাইয়া কিন্তু তবুও তাঁহার চীৎকার থামিল না। পুলিশ মারিতে মারিতে তাঁহাকে রাস্তার দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু রাস্তার উপরে লইয়া গিয়াও গদাধরকে রেহাই দেওয়া হইল না—তেমনি নিদারুণ প্রহার চলিতেই লাগিল। এদিকে সমস্ত জনতা মাঠ ছাড়িয়া গেলেও রাস্তার আশেপাশে জনগণ চষা মাঠের ভিতরে ভিড় করিয়া কখনও আগাইয়া আসিতেছিল কখনও পিছাইয়া যাইতেছিল, জনতা পূর্বেই খানিকটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। গদাধর সেনাপতির উপরে এই অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের ভিতরে কিছু লোক একেবারে মরিয়া হইয়া চষা মাঠ হইতে ঢিল কুড়াইয়া লইয়া পুলিশের উদ্দেশ্যে ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে সেনাপতি মহাশয়ের উপর প্রহার আপাতত স্থগিত হইল বটে, কিন্তু পুলিশ কয়েকবার ফাঁকা গুলী চালাইল এবং দলে দলে লাঠি লইয়া মাঠে নামিয়া নির্বিচারে যাহাকে পাইল তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিল। এমনি করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন সমস্ত জনতা ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। এদিকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশদল ও বন্দিগণসহ থানার

দিকে রওনা হইলেন। অজয়দের ভিতরে যাহারা অধিক আহত হইয়াছিল তাহাদের খানদুই গরুর গাড়িতে চাপাইয়া অনেক রাত্রে তাহারা মহিলাকর্মিগণসহ ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রিতে খবর পাওয়া গেল—বন্দী স্বেচ্ছাসেবকগণকে বাসে উঠাইয়া পাঁশকুড়ার দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কিন্তু অজয় ভাবিয়া পাইল না যে, যদি গ্রেপ্তার করিবারই পুলিশের ইচ্ছা ছিল—তবে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে কেন গ্রেপ্তার করিল? সেই তো ছিল সেচ্ছাসেবকদলের পরিচালক। বৃদ্ধ সেনাপতি মহাশয়কে যে, বাসে করিয়া লইয়া যাওয়া হয় নাই—সে খবর অজয় জানিয়াছিল—অথচ তাঁহাকে মুক্তিও দেওয়া হয় নাই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাত্রিতেই মেদিনীপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছেন—সে খবরও আসিয়াছে। কিন্তু গদাধর সেনাপতিকে এতক্ষণ অবধি থানায় আটকাইয়া রাখিবার কি কারণ থাকিতে পারে অজয় বুঝিতে পারিল না—তাঁহার কথা ভাবিয়া সারারাত্রি অজয়ের দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। অন্ধকার থাকিতেই সে শয্যাত্যাগ করিয়া অন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি মহাশয়ের খোঁজে বাহির হইল। থানায় যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার খোঁজ লইবে অজয় পথ চলিতে চলিতে সেই চিন্তাই করিতেছিল। থানার কাছাকাছি পৌঁছিতেই তাহার সঙ্গীটি বলিয়া উঠিল—দেখুন তো অজয়দা ঐ মাঠের ভিতরে পড়ে কে? অজয় চাহিয়া দেখিল সত্যই একটু দূরে চষা মাঠের ভিতরে কে একজন পড়িয়া আছে। অজয় ও তাহার সঙ্গীটি দ্রুতপদে সেদিক আগাইয়া যাইতেই বুঝিতে পারিল লোকটি আর কেহ নহে স্বয়ং সেনাপতি মহাশয়। অজয়কে দেখিয়াই তিনি দুই চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন—তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিতে পাওয়া গেল তাহার মর্ম এইরূপ—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ থানা হইতে বিদায় লইবার পর সেনাপতি মহাশয়ের উপরে আর একপ্রস্থ অমানুষিক প্রহার করা হয়। তাঁহার উপর এত বিরাগের কারণ এই যে, বিদেশী লোক এখানে আসিয়া যে এখানে গোলযোগের

সৃষ্টি করিতেছে তাহা দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না কিন্তু তিনি স্থানীয় লোক হইয়া কেন ইহাদের সহিত যোগ দিতে গেলেন। প্রহার করিয়া গভীর রাত্রে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া এই মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সত্যই তাঁহার পায়েও সর্ব-শরীরে স্থানে স্থানে এমন ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার পক্ষে হাঁটিয়া বাড়ি যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অজয় ও তাঁহার সঙ্গীটি কোনপ্রকারে তাঁহাকে বহন করিয়া বাড়িতে লইয়া গেল। বাড়ির মেয়েরা দারুন উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া একেবারে সকলে মিলিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। অজয় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া গরম জল করিয়া সেনাপতি মহাশয়ের হাতে পায়ে সেক্ দিয়া খানিকটা সুস্থ করিয়া তুলিয়া তবে ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর হইতে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য তমলুকের লবণ আইন ভঙ্গ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া অহিংসার মর্যাদা পুরাপুরি রক্ষা করিতে পারে না—ফলে তাহা-দিগকেই আবার বেপরোয়াভাবে পুলিশের প্রহার সহ্য করিতে হয়। সুতরাং স্থির হইল অজয়কে পনেরজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া দিন দুই বিশ্রাম করিয়া বিলাসপুর কেন্দ্রে গিয়া কাজ করিতে হইবে। অজয় এই ব্যবস্থাই মানিয়া লইল।.........

ত্রয়োচত্বারিংশ অধ্যায়

যে স্বেচ্ছাসেবকগণকে পুলিশ বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা আবার ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রে তাহাদিগকে পাঁশকুড়া হইতে হাওড়ার টিকেট করিয়া জোর করিয়া ট্রেণে তুলিয়া দেওয়া হয় এবং দুই একটি স্টেশনে তাহাদিগের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় কিন্তু ইহারই মধ্যে কোন

এক ফাঁকে ছোট একটি স্টেশনে রাত্রির অন্ধকারে তাহারা ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িয়া সারা রাত্রি ও সারাদিন ধরিয়া হাঁটিয়া পুনরায় ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইহারই পরের দিন অজয় পনের জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া বিলাসপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কুড়ি বাইশ মাইল বাসে করিয়া যাইয়া পরে সেখান হইতে আট নয় মাইল হাঁটিয়া তবে বিলাসপুর পৌঁছিতে হইবে। অজয়রা বিলাসপুর ক্যাম্পে যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি অনুমান আট নয়টা হইয়া গিয়াছে। একখানি খড়ের ঘরে এখানে ক্যাম্প করা হইয়াছে। এ ঘরটিতে পূর্বে প্রাইমারী ইস্কুল হইত। সম্প্রতি গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ ইস্কুলটি অন্যত্র তুলিয়া লইয়াছে।

পরের দিন সকালে উঠিয়া অজয়রা কয়েকজন গ্রামখানা ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইল। গ্রামখানি সম্পন্ন গৃহস্থে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক-খানি বাড়ী দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দুইতিনটি করিয়া বড় বড় ধানের গোলা, লাল মাটির দেওয়াল দেওয়া একতালা দোতালা টিনের ঘর, পুষ্করিণী—এখানেও পুষ্করিণীর ধারে অজস্র তাল ও নারিকেল গাছ। গ্রামের সকলেই কৃষক। তাই বলিয়া নিরক্ষর চাষাও নয়—লিভার প্লীহাযুক্ত ম্যালেরিয়া জীর্ণ চেহারাও নয়। গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল। উচ্চ শিক্ষিত খুব কম হইলেও লোকগুলির প্রায় সকলেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। যাঁহারা একটু সম্পন্ন গৃহস্থ তাঁহারা লোক দিয়া কৃষিকার্য করান—যাঁহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়—তাঁহারা নিজে করিতেও দ্বিধা করেন না। ইহারা অধিকাংশই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের। লোকগুলি সরল ও উদার—গ্রামে ঢুকিয়া দুই একজনের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া অজয় বিশেষ আনন্দ পাইল। মেদিনীপুর জেলার এই সম্প্রদায়টির জাতীয় আন্দোলনে যে দান কম নহে—অজয় তাহা জানিত এবং এখানকারও অনেকে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়া তুলিত। সত্যই গ্রামটি দেখিয়া একটা অনির্বচনীয় আনন্দ লইয়া

অজয় ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল। ইহাই তো বাংলা দেশের সত্যি-কারের শস্যশ্যামলা পল্লীগ্রাম। ধান এখানকার জমিতে প্রচুর ফলে—প্রতি বাড়ীতেই পাঁচ সাতটি করিয়া গাই—দুধের কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রচুর নারিকেল, তালগুড়। আর চাই কি—এই তো যথেষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা মাটি-মাকে ফেলিয়া রাখিয়া—বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইটি ডিগ্রী লইয়া ত্রিশ চল্লিশ টাকার আশায় কলিকাতা মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া যায় নাই। লেখাপড়া অল্প শিখিয়াছে বটে—কিন্তু নিজের দেশকে নিজের জমিকে—নিজের মাকে তারা ঠিক চিনিয়া লইয়াছে। নানাপ্রকারে জমিতে খাটিয়া, খাটাইয়া দিব্যি ধনে লক্ষ্মীতে পরিপূর্ণ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছে। অজয় মুগ্ধ হইল, এই না সত্যিকার বাংলা দেশ!

সত্যাগ্রহ শিবিরের কিছুটা দূরেই কিছুদিন হইতে একটি পুলিশ ক্যাম্প হইয়াছে। ইতিপূর্বে এখানকার স্বেচ্ছাসেবকগণ লবণ আইন ভঙ্গ করিয়াছে, পুলিশ কোনপ্রকার বাধা দেয় নাই। কিন্তু অজয়রা এখানে আসায় পুলিশ ক্যাম্পে যেন একটা নূতন সাড়া জাগিয়াছে। তাহারা এখানে নূতন পন্থা লইল—পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বে অতর্কিতে কুড়ি পঁচিশজন লাঠিধারী পুলিশ সত্যাগ্রহ শিবিরে হানা দিয়া জোর করিয়া সমস্ত সত্যাগ্রহীদের ক্যাম্পের বাহির করিয়া দিয়া ক্যাম্পটি নিজেরা দখল করিয়া বসিল। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। অগত্যা নিজেদের নিশ্চিত আবাসস্থানটি পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া সে রাত্রে তাহারা একটু দূরে চষা মাঠের ভিতর শুইয়া কাটাইয়া দিল। পরের দিন নিকটবর্তী পাড়া হইতে একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীর কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় মজুর লাগাইয়া একদিনের ভিতরেই হোগলার বড় একটি চালাঘর তৈয়ারী করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল আপাততঃ কয়েক দিন লবণ আইন ভঙ্গ বন্ধ রাখিয়া অজয়রা তাহাদের ক্যাম্পটি পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিবে। দলে তাহারা এখন

মোটে পঁচিশজন। তাহারা ঠিক করিল প্রত্যহ দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক-গণ ক্যাম্পটি দখল করিতে যাইবে। তাহারা সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া জোর করিয়া ক্যাম্পে ঢুকিবে—পুলিশের প্রহার সহ্য করিবে কিন্তু ফিরাইয়া দিবে না। দিনের পর দিন এমনি করিলে পুলিশকে হয় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে না হয় ক্যাম্পটি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এমনি করিয়া কয়েকদিন চলিবার পর একদিন সকালবেলা কয়জন পুলিশ আসিয়া যে ভদ্রলোক তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাঁহাকে থানায় লইয়া গেল। সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যাবেলা তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার প্রায় নড়িবার শক্তি পর্যন্ত নাই। তিনি অজয়ের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন। পুলিশ কয়েকবার তাঁহার উপরে অসহ্য প্রহার করিয়াছে। সারাদিন বৈশাখের খর রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে—স্নান হয় নাই—আহার হয় নাই। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের স্থান দিয়াছেন—এই তাঁহার অপরাধ। তাঁহার উপরে আদেশ হইয়াছে—আজই স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে—না হইলে আগামীকল্য পুনরায় তাঁহাকে থানায় লইয়া গিয়া অদ্যকার ঘটনার পুনরভিনয় হইবে। ভদ্রলোক কাঁদিয়া ফেলিয়া জানাইলেন—এতগুলি ভদ্রসন্তানকে—স্বেচ্ছা-সেবককে তিনি যে চলিয়া যাইতে বলিবেন—তাহা তাঁহার অসাধ্য। তবে পুনরায় যদি তাঁহাকে থানায় লইয়া গিয়া এমনি করিয়া মারপিট করে তাহা হইলে তিনি বাঁচিবেন না। অজয় ভদ্রলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিল। সুতরাং পুনরায় আবার সেই সন্ধ্যায়ই তাহাদিগকে টোল-টোপ্‌লা ঘাড়ে ফেলিয়া দূরে একটি মাঠের ভিতর গিয়া রাত্রি যাপনের স্থান ঠিক করিতে হইল। কিন্তু ইহার পর হইতে এমনি অবস্থা হইল যে, যে রাত্রি তাহারা যাহার জমির উপর বাস করিত তাহাকেই থানায় লইয়া গিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিল। আধ মাইল খানেক দূরে একটি শ্মশান ঘাট ছিল—অবস্থা দেখিয়া অবশেষে ঠিক করিল তাহারা আর কাহারও জায়গায় থাকিবে না—শ্মশান তো কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়—তাহারা এখান হইতে গিয়া শ্মশান

ঘাটে গিয়াই রাত্রি যাপন করিবে। যে কথা সে কাজ। পরের দিন বিকাল বেলা তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া একেবারে শ্মশান ঘাটে আসিয়াই জুটিল। অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত একটি জলার ধারে এই শ্মশানটি অবস্থিত। ইহারই উত্তর পাশ দিয়া একটি চওড়া রাস্তা আড়াআড়িভাবে বিলাসপুরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া এই জলাটির একেবারে ধার ঘেঁসিয়া সোজা পূর্বদিগের গ্রামগুলির পানে চলিয়া গিয়াছে। শ্মশান ঘাটের পাশে রাস্তার সংলগ্ন খানিকটা বাঁধান জায়গা সম্ভবত এখানে শবদাহকারীদের বিশ্রামের জন্য কোন দিন বিশ্রামাগার থাকিয়া থাকিবে। কিন্তু আজ আর সে ঘর নাই। তাহারই মাটির পোতার খানিকা অংশ আজিও অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই স্থানটিতে অজয়রা আশ্রয় লইল। ইহার দক্ষিণে পাঁচ ছয়টি বাবলা গাছ স্থানটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং ঠিক তাহার পরেই দুইটি তাল গাছ মুখোমুখী হইয়া অনেকদূর পর্যন্ত আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া এই জনমানবহীন প্রান্তরের ভিতর নিজেদের মহিমা ঘোষণা করিয়া সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে। গাছ দুইটির ডেগোর শীষে শীষে অসংখ্য বাবুই বাসা বাঁধিয়া বহুদিন হইতে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তালগাছের সম্মুখ ভাগ হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে জলার ধার ঘেঁসিয়া চার পাঁচ শত হাত লম্বা স্থানটিতে আশে পাশের অনেকগুলি গ্রামের মৃতদেহ সৎকার করা হইয়া থাকে। এই বৈশাখ মাসেও জলাটি একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কচুরী ও কাদায় মেশামেশি হইয়া তলার দিকে খানিকটা জল এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। দিনের বেলায় রাখাল ছেলেরা এখানটায় গরু মহিষদের জল পান করাইয়া লয়—সুযোগমত দুই চারটি মাছও ধরে—কিন্তু রাত্রি বেলা বিশেষ দায় না ঠেকিলে ভূতের ভয়ে এদিকটায় কেহ মাড়াইতে চাহে না। সেদিন সন্ধ্যার পরে এই স্থানটিতেই একটি উনুন খুঁড়িয়া কড়াইতে দুধ গরম করিয়া দুধ মুড়ি ও তালের গুড় আহার করিয়া মহোৎসাহে যে যাহার কম্বল পাতিয়া শ্মশানঘাটের উন্মুক্ত আকাশ-তলে শুইয়া পড়িল। রাত্রি গভীর না হইতেই সঙ্গীরা সকলে একে

একে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু অজয়ের চোখে ঘুম ছিল না। জ্যোৎস্না রাত্রি কিন্তু মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড সাদা তরল মেঘ বারে বারে উড়িয়া আসিয়া জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া দিতেছে। তাল গাছ দুইটির ঝুলিয়া পড়া শুকনা ডেগোয় বাতাস লাগিয়া সর সর করিয়া শব্দ হইতেছে—নাড়া পাইয়া মাঝে মাঝে বাসায় বাবুইগুলি কিচির মিচির করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। জলের ভিতরে কি একটি জলচর পাখী অদ্ভুত গম্ভীরভাবে কুম্‌কুম্‌ শব্দ করিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে। পূর্বে, উত্তরে, পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে দূরের গাছ-পালাগুলি কাল রেখার মত জাগিয়া উঠিতেছে। শুইয়া শুইয়াই অজয় দুই চোখ মেলিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত এই দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমনি করিয়া চাহিয়া চাহিয়াই এক সময়ে তাহার দুই চোখ ভরিয়া ঘুম নামিয়া আসিল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল ঠিক নাই, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ঘুম তাহার ভাঙ্গিয়া গেল। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে নামিয়া পড়িয়াছে—জ্যোৎস্নালোক পূর্বাপেক্ষা খানিকটা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। জলের ভিতর সেই পাখীটি তখনও থাকিয়া থাকিয়া তেমনি অদ্ভুতভাবেই ডাকিয়া উঠিতেছিল। পাখীটিকে ভারী বিশ্রী লাগিতেছিল অজয়ের। হঠাৎ শ্মশানের দিক হইতে যেন অস্ফুটস্বরে কাহারা কথা কহিয়া উঠিল। অজয় শিহরিয়া উঠিয়া সেই দিকে ফিরিয়া দেখে, বাবলা গাছের ফাঁক দিয়া ও-পাশে যেন একটা আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভয় ভয় করিতে লাগিল অজয়ের। সঙ্গীরা তখনও সকলেই অঘোরে ঘুমাইয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে আপনার শয্যার উপরে চুপ করিয়া উঠিয়া বসিল সে। অস্পষ্ট কথার শব্দ তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল। খানিকক্ষণ এমনি কাটিবার পর আলোটি যেন আগাইয়া আসিতে লাগিল। অজয় ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে, জনকয়েক লোক একটি হ্যারিকেনের আলো লইয়া এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোক কয়েকটি তাহাদের প্রায় কাছাকাছি আগাইয়া আসিল। অজয় প্রশ্ন করিল—কে? লোক কয়েকটি হঠাৎ যেন একেবারে

চমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত পরে সেখান হইতে প্রশ্ন আসিল—তোমরা কে?

—আমরা সত্যাগ্রহ-ক্যাম্পের ভলান্টিয়ার। লোক কয়েকটি ভরসা পাইয়া ইতিমধ্যে আগাইয়া আসিয়াছে। অজয়ের হাত-কয়েক দূর আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের একজন প্রশ্ন করিল—আপনারা সারারাত্রি এই শ্মশানে শুয়ে আছেন নাকি?

—হাঁ তাই তো আছি!

—কেন আপনাদের ক্যাম্প কি হল?

—পুলিশে দখল করে নিয়েছে।

—গ্রামে আর কি কেউ একটু স্থান দেয় নি?

—দিয়েছিল। কিন্তু যে স্থান দেয়, পুলিশ তার উপরেই অত্যাচার করে—তাই শেষে সর্বসাধারণের সম্পত্তি এই শ্মশানে এসে আশ্রয় নিয়েছি।

কথা বলিতে বলিতে লোক কয়টি তাহাদের পাশে বসিয়া পড়িল। অজয় প্রশ্ন করিল—আপনারা এত রাত্রে কোথেকে এলেন?

—ছোট একটা ছেলে মারা গিয়েছিল, তাকে শ্মশানে রেখে এলাম। কিন্তু এটা তো ভাল কথা নয়?

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—এই এমনি করে শ্মশানে শুয়ে থাকা। ভয় করেনা আপনাদের?

অজয় হাসিয়া জবাব দিল—দেখ্‌ছেন তো আমরা পঁচিশটি প্রাণী—এত লোক একসঙ্গে আছি—ভয় করবে কেন।

যে লোকটি কথা বলিতেছিলেন—তাঁহার বয়স হইয়াছে—তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—উঁঃ হুঁ, সে একটা কথা নয়—ভয় পাবার সময় হলে একহাট লোকের ভিতরও ভয় পাওয়া যায়। আপনি ছেলেমানুষ বুঝবেন না—আমার এই বয়েসে আমি অনেক দেখেছি। এটা একে শ্মশান, তায় এদিক দিয়ে স্থানটির আবার একটি সুনামও আছে।

অজয় বলিল—এছাড়া যে আমাদের অন্য উপায় নাই। লোকটি তাঁহার পাশের লোকটির সহিত কি যেন খানিকক্ষণ আলোচনা করিলেন। সকল কথা অজয় ভাল শুনিতে পাইল না। পরে তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন—যাবেন আপনারা আমাদের গ্রামে। আমাদের বাড়ি চিংড়িপোতায়। এখন থেকে সোজা এই রাস্তা ধরে দুই মাইল যেতে হয়। আহার বাসস্থানের বন্দোবস্ত আমরাই করে দেব।

—কিন্তু পুলিশের ভয় আছে যে—আপনাদের থানায় ধরে নিয়ে যাবে—অত্যাচার করবে।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—আমাদের ভিন্ন থানা—তাছাড়া আমাদের গ্রামে বেশী কিছু করতে পুলিশ হয়ত সাহস না-ও পেতে পারে। যদি কিছু করে, সেটুকু সহ্য করতে হবে।

অজয় আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি করিয়া অযাচিতভাবে—কয়জন এত বড় সাহায্য করিতে পারে?

ভদ্রলোকটি কহিলেন—সকালেই যাবেন তাহলে। আমার নাম আদিত্যকুমার সামন্ত—নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে। অজয় স্বীকৃত হইল।

রাত্রি আর নাই—আজ এখন আমরা উঠি, বলিয়া ভদ্রলোকেরা বিদায় লইলেন। অজয়ের মনে মনে হাসি পাইল। ইতিপূর্ব্বে একজন ছিলেন—সেনাপতি—তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার শেষ ছিল না—আর ইনি হইতেছেন সামন্ত—ইঁহার কপালেই বা কি আছে—কে জানে।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়

পরের দিন সকালে স্বেচ্ছাসেবকদল চিংড়ীপোতায় সামন্ত মহাশয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সামন্ত মহাশয় সাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তিনি নিজে এবং পাশের বাড়ির তাঁহারই

বন্ধু যোগেশ নিয়োগী মহাশয় এই দুইজনে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের আহার ও বাসস্থানের ভার গ্রহণ করিলেন। গ্রামের ভিতর ইঁহারা দুইজনেই বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থ। এখানে আসিয়া অজয়রা সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—বাসস্থানের ভাবনা নাই—অনাহারের দুশ্চিন্তাও নাই—নিজেদের কাজ সারিয়া আসিয়া অর্থাৎ প্রত্যহই পুলিশের হাতে কিছু কিছু উত্তম মধ্যম খাইয়া নিশ্চিন্ত মনে আহারে বসিতেছে। এ-বাড়িতে সামন্তগৃহিণী ও-বাড়িতে নিয়োগীগৃহিণী আহারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অজয় নিজে সামন্ত মহাশয়ের ভাগে পড়িয়াছে। এমনি করিয়া কয়েকদিন চলিল। প্রত্যহই তাহারা দলে দলে সকালবেলা বিলাসপুর ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেস্টা করিত। পুলিশও যদৃচ্ছা প্রহার করিতে কোনদিনই কার্পণ্য করিত না। অজয়রা প্রত্যহ মার খাইয়া ফিরিয়া আসিত বটে কিন্তু উহার একটি ফল হইল এই যে, তাহাদের এই সংবাদ আশেপাশে পনের কুড়ি খানি গ্রামের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়া বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। প্রত্যহ তাঁহারা ক্যাম্পের সম্মুখে গিয়া পৌছিবার বহুপূর্বেই হাজার হাজার লোক আসিয়া ক্যাম্পের আশেপাশে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত। স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন পড়িয়া পড়িয়া মার খাইত, তখন হাজার হাজার জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিত—বন্দে মাতরম্। স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই ধ্বনিতে যেন আরো অনেকখানি করিয়া নিজেদের ভিতর শক্তি অনুভব করিত। প্রত্যেকদিন বেলা বারটার সময় সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিত। আজ অজয় সত্যাগ্রহ করিতে যায় নাই। গতকল্য তাহার উপর প্রহারের মাত্রাটা একটু অধিক পরিমাণে বর্ষিত হওয়ায় আজ বিশ্রাম লইতেছিল। বেলা গোটা দশেক বাজিয়া গিয়াছে, অজয় তখনও নিজের বিছানায় শুইয়া শুইয়া সত্যাগ্রহের নূতন নূতন পদ্ধতির কথা চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় সামন্তগৃহিণী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সামন্তগৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন —এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছ যে বাবা—শরীর ভাল আছে তো?

বলিতে বলিতে তিনি অজয়ের কপালে হাত দিয়া তাহার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। অজয় বলিল—আজ্ঞে না বিশেষ কিছু নয়—শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছিল না—বলে আজ আর বেরুইনি। সামন্তগৃহিণী তাহারই অদূরে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—কেমন করে ভাল বোধ হবে বলতো, রোজ রোজ পুলিশের হাতে এমনি করে মার খেলে শরীর কয়দিন টিকতে পারে। অজয় কোন কথার জবাব না দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সামন্তগৃহিণী বলিলেন—না, না হাসির কথা নয়। রোজ রোজ তোমরা এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের হাতে এমনি করে মার খাবে—এ ভাবলেও যে আমার কান্না পায় বাবা!

অজয় বলিল—এছাড়া যে অন্যপথ নাই—অত্যাচার যে সহ্য করতেই হবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন—কি জানি বাপু—তোমাদের সবকথা আমি ভাল করে জানি না—বুঝতেও পারি না। কিন্তু এই পোড়া দেশে যে, কোনদিন কোন ভাল কাজ করবার উপায় নাই—তা আমি জানি। একটা ঘটনা শোন—আমার এক ভাইপো কলকাতার ডাক্তারী ইস্কুল থেকে পাশ করে এসে—আরও পাঁচ সাতটি ছেলে নিয়ে গ্রামের ভিতরে একটি সেবাদল গড়ে তুললো। সে আজ তিন বৎসরের কথা। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগে শোকে মানুষের সেবা করতো। বড়লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে গরীব দুঃখীকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো—এই ছিল তাদের কাজ। এছাড়া অন্য কিছু যে কোনদিন করে নাই তা আমি বেশ জানি। কিন্তু তবু কিছুদিন পরে পুলিশের সুদৃষ্টি তাদের উপরে পড়লো। ধরে নিয়ে গেল আমার সেই ভাইপোটিকে। 'ছয়মাস বিনাবিচারে আটকে রেখে—তবে মুক্তি দিল। কি অপরাধ তার—সেও জানলো না—অন্য কেউ তো নয়ই। অজয় ইহারই উপরে দাঁড় করাইয়া পুলিশ ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি জোরাল বক্তৃতা দিবে বলিয়া

সোজা হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছিল কিন্তু ভিতর হইতে ডাক আসিল—গিন্নিমা—ভাত নামাবে না—ধরে যাবে যে!

—এই যাই। তুমি একটু বোস বাবা—আমি ভাতটা নামিয়ে আসি। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—একা মানুষ—সব সময় সব দিকের তাল রেখে উঠতে পারিনে।

অজয় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—মাঝে মাঝে ভারী সঙ্কোচবোধ হয় আমাদের—এতগুলো প্রাণী রোজ রোজ আপনাদের উপরে কি অত্যাচারটাই না করছি।

সামন্তগৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন—ওকথা বলো না বাবা—কিসের কষ্ট? তোমরা এই কটা দিন আছ, কি সুখেই না আছি। নইলে সংসার তো আমাদের কাছে অরণ্য—বলিয়া তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—দুই চোখ যেন তাঁহার ছলছল করিয়া উঠিল। অজয় বুঝিল হয়তো হৃদয়ের কোন দুঃখের স্থানে তাঁহার ঘা পড়িয়াছে—তাই কি বলিয়া কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবে ভাবিতেছিল। কিন্তু তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—তোমাদের মত কয়েকটি ছেলেকে যে দু'দশ দিন খেতে দিতে না পারি এমন নয় বাবা! তাছাড়া যদি দু'একটা মাস ধরেও তোমরা থাক—আমরা খুশিই হবো। কি হবে আমাদের সংসার দিয়ে—দুটি প্রাণীর কতটুকুই বা প্রয়োজন বলতো? যার জন্য সঞ্চয়—যার জন্যে এতদিন ধরে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে সংসার গড়ে তুললাম, সেই যদি এমনি করে ফাঁকি দিয়ে গেল? কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া আসিল—দুই ফোঁটা চোখের জল দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। অজয় খানিকটা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—বলিল, বলতে যদি এত কষ্ট হয় মা—কি কাজ সে কথা বলে।

—আমাকে মা বলে ডাকলে বাবা—সত্যি আজ থেকে তুমি আমার ছেলে। বামুনের ছেলে তুমি, কি বলে তোমায় আশীর্বাদ করতে হয় তাতো জানি নে বাবা!

—মা যেমনি করে ছেলেকে আশীর্বাদ করে—তেমনি করেই করবেন।

পরের দিন ভোরবেলা বিলাসপুর হইতে একজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া খবর দিল: গত রাত্রিতে পুলিশ সত্যাগ্রহ শিবিরের ঘরখানি নিঃশেষে পোড়াইয়া দিয়াছে। পুলিশ যে একান্ত ঠেকিয়া পড়িয়াই এই কর্মটি করিয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। কারণ এই কয়েকদিনের সত্যাগ্রহে তাহারা অনেকখানি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। নির্দয়ভাবে প্রহার করিলেও যখন সত্যাগ্রহীরা নিরস্ত হয় না তখন অন্য কি পন্থা লইবে তাহা বোধ হয় তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এদিকে সত্যাগ্রহের সময় শত শত লোক আসিয়া জুটিত—তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইত এমনি করিয়াই স্থানীয় অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে পুলিশের ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। যাহা হউক একটি কাজ এমনি করিয়া শেষ হইয়া গেল। আজ সারাটা দিন ধরিয়া এখন কোথায় কেমন করিয়া লবণ আইন ভঙ্গ করা যাইবে তাহারই পরামর্শ চলিতেছিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মহকুমা শহর হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে একজন স্বেচ্ছাসেবক সামন্ত মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তাহার নিকটে খবর পাওয়া গেল—মহকুমা শহরের ক্যাম্পের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। অজয়দের সবাইকেই আগামীকল্যের ভিতরে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সেই ক্যাম্পের ভার লইতে হইবে। সুতরাং বিদায়ের সাড়া পড়িয়া গেল। এখান হইতে দশ বার মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া বাস ধরিতে হইবে। রাত্রে আহারাদির পর এখান হইতে যাত্রা করিবার সময় স্থির হইল। সংবাদ শুনিয়া সামন্তগৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি দুধ চিনি প্রভৃতি যোগাড় করিয়া কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন তৈরী করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিজে বসিয়া আহার করাইলেন। বিদায়ের পূর্বে—তাঁহার দুই চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল। অজয় বিদায় লইতে আসিলে—একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—মা

বলে ডেকেছো—দু'দিনেই ভুলে যেও না বাবা। যেখানে থাক—মাঝে মাঝে খবর দিও—আর যদি কোন দিন সময় পাও দেখা করো।

সত্যই তো এই কয়টা দিনে এ বাড়ীতে একটা মায়া বসিয়া গিয়াছে। তাই তো বিদায়ের সময় অজয়ের মনটাও কেমন একপ্রকার ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। সে জবাব দিল—কিন্তু সে কথা তো আজ বলতে পারবো না মা। খবরও হয়তো দিতে পারবো না দেখাও হয়তো আর হবে না—তবু যেখানেই যখন থাকি—সব সময় মনে রাখবো যে—বাংলা দেশের এক কোণে আমার আর এক মা রয়েছেন—যিনি সত্যসত্যই আমাকে নিজের সন্তান বলে ভাবেন—আপনার মার মত মঙ্গল কামনা করেন।

সামন্তগৃহিণী অজয়ের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অজয়রা যখন পথে বাহির হইল—তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঘণ্টা দুই পরে তাহারা লোকালয় ছাড়াইয়া একেবারে রূপনারায়ণের তীরে আসিয়া পড়িল। নদীর ধারে ধারে তাহারা চলিতেছিল। দক্ষিণে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। দুই একবার দূরে সমুদ্রের ভিতর দিয়া কয়েকখানা জাহাজ চলিয়া গেল। তাহারই আলো এতদূর হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেশ একটানা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল—আকাশে ছিল চাঁদ, পূর্বে রূপনারায়ণ—দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের পরে সমুদ্র—এই চমৎকার আবেস্টনীর মাঝে এক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারই মাঝে চলিতে চলিতে পঁচিশটি প্রাণী গাহিয়া উঠিল ঃ

"ভোরের বাতাসে বাজে মাদল—
জাতির শোণিতে রণ-বাদল
আমরা চলেছি সেনানীদল
চল্‌রে সমুখে চল্।
চল্‌রে চল্‌রে চল্॥"

পুলিশের লোক প্রস্তুত হইয়াছিল। পর দিন তাহারা ক্যাম্পে পৌঁছিবামাত্র তাহাদের পঁচিশজনকেই গ্রেপ্তার করিয়া সাব্‌জেলে লইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

ইতিপূর্বে অমিয় তাঁহাদের নিজের মহকুমা শহরটিতে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কল্যাণীও মহকুমা সহরটিতেই সেখানকার নাম-করা মহিলাকর্মী বিভাবতী দেবীর সহিত গিয়া যোগ দিলেন। শহরটির ভদ্রমহিলাদের ভিতর একটি সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে মহিলাকর্মী আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। মহিলাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিদেশীদ্রব্য বর্জন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা মাঝে মাঝে লবণ তৈরী করিয়া আইন ভঙ্গ ও নিয়মিতভাবে মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন এই মহকুমা সহরটিতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে অমানুষিক প্রহার ও গ্রেপ্তার চলা সত্ত্বেও দিন দিন মফঃস্বল হইতে দলে দলে নূতন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা দল বাঁধিয়া মদ-গাঁজার দোকানের চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইত—পুলিশের প্রহারে রক্তাক্ত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িত—তবুও স্থানত্যাগ করিত না। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইলে সেই মুহূর্তেই অন্য লোক আসিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিত। গোয়ালন্দের অবস্থা হইয়াছিল আরও ভয়াবহ। অমিয় এবং আরও কয়েকজন স্থানীয় নেতা মিলিয়া দুই স্থানেরই আন্দোলন পরিচালনা করিতেন। মাঝে মাঝে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকগণকে জোর করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইয়া পদ্মার স্রোতের ভিতরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। কখনও কখনও দূরে পদ্মার চরের উপরে ছাড়িয়া দিয়া আসিত। ইহা ভিন্ন মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্পে চড়াও করিত—প্রহার করিয়া আহার্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া যাইত। এমনি করিয়া মাস দুই চলিয়া যাইবার পর একদিন অমিয় গ্রেপ্তার হইলেন এবং কয়েকদিন

পরে তাঁহার বিচার করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট জেলে প্রেরণ করা হইল। কল্যাণীও রেহাই পাইলেন না, কিছুদিন পরে তিনিও বিভাবতী দেবীর সহিত গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসরের কারাভোগের দণ্ড গ্রহণ করিয়া জেলে গিয়া ঢুকিলেন। আরও মাস দুই পরে অমিয়কে ডিষ্ট্রিক্ট জেল হইতে দমদমের একটি স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। অমিয় যখন দমদম জেলে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন দমদম জেলে পাঁচ-ছয় শতের বেশী স্বদেশী কয়েদী ছিল না, কিন্তু প্রতিদিনই গড়ে পঞ্চাশ ষাট জন করিয়া বিভিন্ন জেল হইতে এখানে চালান হইয়া আসিয়া জেলটি পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। জেলের দক্ষিণ দিকটা ঘন করিয়া কাঁটাতার দিয়া ঘেরা সুতরাং এই দিকটায় চাহিলে বাহিরের সকল দৃশ্যই চোখে পড়ে। জেলের দক্ষিণ পাশের কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষিয়া একটি পথ আসিয়া জেলের গেটে মিশিয়াছে। প্রত্যহ সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইত এই পথটি দিয়া রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া জেলটিতে ঢুকিতেছে। নবাগত কোন কোন দল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া সমস্ত জেলটি কাঁপাইয়া তুলিত—কোন দল বা গাহিতে গাহিতে আসিত :—

—"চাই স্বাধীনতা সাম্য চাই—
গাহ দিকে দিকে চারণ দল।
পীড়িত দলিত বন্দী নর,—
সবলে দুহাতে ভাঙ্গ শিকল।"

কয়েকদিন পরে একটি নবাগত দলের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি অমিয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—অমিয়, আমি এসেছি ভাই! অমিয় ফিরিয়া দেখিলেন—বরিশালের তাঁহার সেই পুরাতন বন্ধু রমেশ।

অমিয় আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—রমেশ, তুমি?

রমেশ হাসিয়া বলিলেন—হাঁ ভাই—আমিই।

—কিন্তু তুমি যে চাকরী নিয়েছিলে?

—চাকরী ছেড়ে দিলাম।

—ছেড়ে দিলে? তোমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে এঁদের কি উপায় হবে শুনি?

—সে একরকম হয়ে যাবে ভাই।

—রকমটা কি প্রকারের শুনতে পাই না? কিছু টাকা পয়সা রেখে এসেছো?

—টাকা পয়সা? তা' গোটা পঞ্চাশেক দিয়ে আসতে পেরেছি।

—জেল তোমার কত দিনের?

—দু' বছর। তা হোক না ভাই, অত ভাবলে কি আর চলে! দেশের সব লোকই যদি খেয়ে-পরে বাঁচে—আমার ছেলেমেয়েরাই কি বাঁচবে না? গ্রামে আছে তো সব—বিপদে-আপদে অনেকেই কিছু কিছু সাহায্য করবে বই কি?

অমিয় আশ্চর্য হইয়া বলিল—এ তুমি বল্‌ছো কি রমেশ? হয়তো অনেকেই কিছু কিছু সাহায্য করবে! নিজের একটা দায়িত্ব নাই নাকি?

রমেশ হাসিয়া অমিয়র পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে থাম ভাই—তুমি যে দেখছি ভারি সিরিয়াস্ হ'য়ে উঠলে হে! অত ভাবতে গেলে কি এ-পথে আসা চলে? নাও এখন চল দেখি কোথায় একটু আস্তানা দেবে। হাতে মুখে জল দিয়ে একটু বিশ্রাম করি। বলিয়া তিনি অমিয়কে ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন।

জেলের উত্তর দিকে একটি ছোট মাঠ, তারই শেষে টিন ও কাঁটাতারের ঘন বেড়া—বেড়ার ওপাশে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়ানিমের গাছ—তাহারই কতকগুলি ডালপালা জেলের সীমার ভিতরে আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া এই স্থানটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিকাল বেলা অমিয় ও রমেশ আসিয়া স্থানটিতে বসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর অমিয় বলিলেন—তোমার কাছে একটা অনুমতি চাচ্ছি ভাই।

রমেশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—অনুমতি? সে আবার কি?

—এক প্রতিবেশীর কাছে আমার শ' দুই টাকা জমা আছে, তাঁকে একখানা চিঠি দিয়ে জানাতে চাই যে—টাকাটা যেন তোমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমার কাছে হাত পাততে তো আমি কোন দিনই সঙ্কোচ করি নি ভাই। টাকা যদি তুমি দিতে চাও—আমি অহঙ্কার করে না বলতে পারব না। লেখ পাঠিয়ে দিতে। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—টাকা সত্যি তাদের খুব দরকার ভাই। ছোট মেয়েটা কিছুদিন ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে—হয়তো বা কালাজ্বরই হবে। চিকিৎসার বন্দোবস্ত তো কিছুই করে আসতে পারিনি! তাছাড়া একটা কথা বারেবারে আমার মনের ভিতরে কাঁটা দিয়ে উঠছে—আমাদের পৈতৃককালের দোতালা টিনের ঘর—তার খুঁটিগুলো সব ক্ষয়ে গেছে—বেড়া দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢোকে—চালের কাঠগুলো সব ঘুণে খেয়ে ফেলেছে। তারই মাঝে সব ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে। কবে হুড়মুড় করে মাথার উপরে ভেঙে পড়বে কে জানে। আবার খানিকক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন—আর তাও বলি ভাই—এই সব এত করে ভাবলেই কি পারা যায়? দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি কয়জন লোক সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। কয়জন লোক দু'বেলা খেতে পাচ্ছে? সব্বাই যদি এই সবই ভাবতো—তাহ'লে কয়টা লোক আজ জেলে আসতে পারতো? এই জেলের ভিতরেই যদি তুমি অনুসন্ধান কর—দেখবে আমার মতই অধিকাংশ। আমি আর ভাববো না ভাই—বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সবাইকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে এসেছি—মনে মনে বলেছি—ভগবান যাদের কেউ দেখবার নাই—তাদের তো তুমিই দেখবে—এই আমার একমাত্র ভরসা।

অমিয় বলিলেন—তোমার মনের জোরের কাছে আমি মাথা নত করছি ভাই। ভগবানের উপরে এই যে তোমার বিশ্বাস—এই বিশ্বাস যেন স্থির থাকে।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

আট মাস পরে "গান্ধী-আরউইন" চুক্তির ফলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিগণ জেল হইতে মুক্তি পাইলেন। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে কল্যাণী দেবী, দমদম্ হইতে অমিয় এবং আলিপুর জেল হইতে অজয় মুক্তি পাইল। কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া অমিয় কল্যাণীকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। অজয় কলিকাতায়ই রহিয়া গেল।

সেদিন বিকাল বেলা উত্তর কলিকাতার একটি অল্পপরিসর গৃহে বিমলদা আর অজয় বসিয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইবার পর আজ এই প্রথম উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

অজয় প্রশ্ন করিল—এই একটা বৎসর কি করলেন বিমলদা? বিমলদা হাসিয়া বলিলেন—তোরা সব কত কষ্ট করে জেল খেটে এলি আর আমি এই একটা বৎসর ধরে পালিয়ে পালিয়ে ফাঁকি দিয়ে বেড়ালাম।

অজয় হাসিয়া বলিল—পালিয়ে বেড়াতে পারেন কিন্তু তাই বলে ফাঁকি তো কেউ বলতে পারবে না। পালিয়ে বেড়ানোর যে কি দুঃখ তাতো আমরা জানি।

বিমলদা বলিলেন—আমি কি করেছি জানিস অজু—এই একটা বৎসর ধরে শুধু স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করেছি। জনসাধারণের ভিতরে আন্দোলনের প্রভাব কি হলো—কতটুকু তারা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়ে এলো এইটাই তো শুধু দেখলাম। এ আন্দোলনই তো শেষ আন্দোলন নয় রে—তা বোধ হয় মহাত্মাজীও জানতেন—আমরাও তাই অনুমান করেছি। একুশ সালের আন্দোলন—এবারকার আন্দোলন সবই হচ্ছে ভবিষ্যতে যে বিপ্লব একদিন প্রলয়ঙ্কর রূপ ধরে নেমে আসবে তারই মহড়া—তারই ক্ষেত্র প্রস্তুতি।

অজয় প্রশ্ন করিল—কি দেখলেন?

—সত্যি কথা বলতে কি অজয়, বাঙলাদেশে অনেক জায়গায়ই তেমন কোন আশার আলোক দেখতে পাইনি। কিন্তু সবচেয়ে আমাকে আকৃষ্ট করেছে—মেদিনীপুর জেলা। তাছাড়া আরামবাগ, মহিষবাথান এখানেও লোকের অপূর্ব দৃঢ়তা দেখেছি। মেদিনীপুরের প্রায় সর্বত্রই লোকে ট্যাক্স দেয় নাই—লাঠির আঘাত সহ্য করেছে—তাদের আসাবাবপত্র নীলাম করে নিয়েছে—বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবু তারা ভেঙে পড়েনি। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে—তবু তারা দুই এক টাকা ট্যাক্স দিয়ে নির্বিবাদে সংসার পেতে বসেনি। অন্যান্য স্থানেও যে কিছু কিছু এমনি দৃঢ়তা দেখা না গিয়াছে এমন নয়—কিন্তু সে এদের তুলনায় অতি নগণ্য। এর একটা কারণ আমি নিজের মনে খুঁজে পেয়েছি অজয়—মেদিনীপুর, আরামবাগ, মহিষবাথান প্রভৃতি স্থানে যারা এমনি করে ট্যাক্স বন্ধ করে নিজেদের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিল—তারা সাধারণত কৃষক শ্রেণীর লোক—এঁরাই এই জেলায় আন্দোলনে অগ্রণী—কিন্তু বাঙলাদেশের অন্যান্য বহু স্থানেই আন্দোলন ছিল—মধ্যবিত্তের মধ্যে—জোতদার শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদের বাড়িঘর সম্পত্তির উপরে মায়া তাঁরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। জেলে—দ্বীপান্তরে—এমন কি ফাঁসি যেতেও তাঁরা পিছপা হননি। কিন্তু এই যে স্বল্প আয়ের পৈতৃক সম্পত্তি—বাড়ি ঘর—এই দিয়েই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবার বর্গ কোনপ্রকারে বেঁচে থাকে—বাস্তুভিটার এই মোহ—সম্পত্তির এই মোহ—তাঁরা কাটাতে পারেন নি। তাই যখনই নীলাম আরম্ভ হয়েছে—সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আরম্ভ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের গতিও গিয়েছে অনেকখানি থেমে।

—গান্ধী-আরউইন চুক্তি—রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স—এসব সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন, বিমলদা?

—ভেবেছি ভাই। ভেবে আমার মন বারে বারে আশঙ্কায় শিউরে উঠছে। হয়তো এই চুক্তি—এই রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স

দেশের চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে। গভর্নমেণ্ট পূর্ব থেকেই এজন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই যে কংগ্রেসী আর বিপ্লবীগণের মেশামিশি—সরকার সব সময়ই একে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখেছে। দিন দিন যে কংগ্রেসী আর বিপ্লবিগণের মেশামিশিতে কংগ্রেসের ভাবধারা এক অদ্ভুত বৈপ্লবিক ধারার দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে—যে বিপ্লব মুষ্টিমেয় লোকের নয়—যে বিপ্লব একদিন সারা ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীর ভিতরে ছড়িয়ে পড়বে—তারই সূচনা আজ দেখা দিয়েছে—বৃটিশ সরকার এ বুঝতে পেরেছে বলেই আজ বিপ্লবী আর কংগ্রেসিগণকে সর্বপ্রযত্নে তফাৎ রাখতে চাইছে। কংগ্রেসের জনগণের উপরে অপূর্ব প্রভাব—আত্মত্যাগ—সেবাবৃত্তি আর বৈপ্লবিকগণের সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতা যদি একত্র সম্পূর্ণ মিশে যেতে পারে তবে সে আন্দোলন গভর্নমেণ্টের পক্ষে দমন করা অসম্ভব হবে। তাই আজ এই প্রচেষ্টা! তারই জন্য আজ প্রায় এক বাঙলাদেশ থেকে তিন হাজারের উপর যুবককে বিনাবিচারে আটকে রাখা হয়েছে। কংগ্রেস আন্দোলনে যাতে তারা না মিশতে পারে—কংগ্রেসের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিশে যাতে তারা দেশের জনগণের সঙ্গে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপন না করতে পারে। আর এই উদ্দেশ্যে আজ এই চুক্তি—এই উদ্দেশ্যেই হবে রাউণ্ড টেবিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের—পার্লামেণ্টের সভ্যগণের আজ কংগ্রেসের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার আগ্রহের অন্ত নাই। তারা চায় কোন প্রকারের ভুয়া খানিকটা ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে তুলে দিয়ে—কংগ্রেসকে মডারেট করে ফেলতে—কংগ্রেস আর বিপ্লবিগণের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ আনতে। একবার যদি খানিকটা ক্ষমতা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়, তবে কংগ্রেসের ভিতরে যারা প্রগ্রেসিভ দল তারা কখনও তা মেনে নেবে না—ফলে আসবে বিরোধ—তারা করবে কংগ্রেস ত্যাগ—এতদিনের এত শক্তিশালী জাতীয় দল এমনি করে পঙ্গু হয়ে পড়বে। তাই তো আমার আশঙ্কা অজয়। আজই হবে সত্যকার নেতৃত্বের পরীক্ষা। যিনি আজ জাতির কর্ণধার হয়ে আছেন—কি করবেন

তিনি এই সঙ্কটে? ভুলে যাবেন এই ভুয়া ক্ষমতা লাভের মোহে—না সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে অটল অচল হয়ে রইবেন দাঁড়িয়ে—আমি সশঙ্কচিত্তে আজ শুধু তাই ভাবছি।

অজয় বলিল—কিন্তু যদি সত্য সত্যই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের খানিকটা ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা থাকে—তবে তা গ্রহণ করা উচিত হবে না দাদা?

—সত্যকার ক্ষমতা পেলে সব সময় গ্রহণ করা উচিত অজয়। কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে বুঝে ফেলেছি ভাই—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সে ইচ্ছা আদৌ নাই। এ যাঁরা বৃটিশ জাতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই বলবেন। কিন্তু তবু যে ভাই কেন গান্ধীজী বুঝলেন না—এ আমি ভেবে পাই নে। হয়তো তিনি মানুষের ভাল দিকটাই শুধু দেখেন—মন্দ দিকটা ইচ্ছে করেই দেখতে চান না—জোর করে দূরে সরিয়ে রাখেন—এ হয়তো তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।—তাছাড়া এই একটা বৎসর ধরে আর কি দেখলাম জান? দেখলাম অত্যাচারের নগ্নমূর্তি! চট্টগ্রামের ঘটনার পর—কি যে নির্মম অত্যাচার চলেছে শহরটির উপর দিয়ে—তা ভাষায় প্রকাশ করবার সাধ্য নাই। আর শুধু তো চট্টগ্রামেই এই অত্যাচার সীমাবদ্ধ ছিল না—সারা বাঙলাদেশের উপরেই এ অত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন বাড়িতে কোন নূতন যুবক এলে—বার ঘণ্টার মধ্যে থানায় খবর না দিলে, শাস্তিভোগ করতে হয়। কোন লোককে গৃহ-শিক্ষক রাখতে হলে পুলিশের অনুমতি চাইতে হতো। দলে দলে শহরে শহরে সৈন্য মার্চ করে যেতো—স্কুলের ছেলেদের, শিক্ষকদের সার বেঁধে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম জানাতে হতো। স্কুল কলেজের ছাত্রদের সর্বপ্রযত্নে জাতীয় ভাবধারার সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হলো—এরই ফলে সৃষ্টি হলো—"হাউস-সিস্টেম্—ইণ্টার ইস্কুল সিস্টেম্"। ব্রতচারী আন্দোলনকেও আমি এইজন্যই ভালো চোখে দেখি না ভাই। এ হচ্ছে কেমন করে একটা জাতির ভিতরে ক্রমে ক্রমে দাসসুলভ মনোবৃত্তি গড়ে তোলা যায় তারই প্রচেষ্টা।

তাছাড়া অন্য অত্যাচারের কথা তো তুলিই নি। চট্টগ্রামের ঘটনা যত অবিবেচনাপ্রসূতই হোক—তবু তারই ফলে একটা জাতির উপরে এমনি অত্যাচার কোন সভ্য মানুষ কোন দিনই সমর্থন করতে পারে না অজয়। উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিমলদার হাতে খবরের কাগজে মোড়া কি খানদুই বই ছিল; অজয় সেদিকে দেখাইয়া বলিল,—কি বই বিমলদা?

"কার্লমার্ক্সের ক্যাপিটাল" আর "ষ্ট্যালিনের লেনিনিজম্"।

অজয় দেখি বলিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইল। বই দুইখানি তাহার হাতে দিয়া বিমলদা বলিলেন,—তোমার জন্যেই এনেছি অজয়—বইগুলো ভাল করে পড়ে দেখো। এই মতবাদ আজ সারা জগতময় একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে—এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সারা দেশের শোষিত—নিপীড়িত জনগণ গভীর আগ্রহে চেয়ে আছে। আমাদের দেশের কর্মীদের ভিতরেও এই নিয়ে একটু আলোচনা সবে শুরু হয়ে গেছে। আজ আমাদেরও যাচাই করে দেখতে হবে—কতখানি আমরা এদের থেকে গ্রহণ করতে পারি—কতখানি ছাড়তে পারি। অজয় একখানা বই হাতে করিয়া লইয়া গভীর আগ্রহে তাহার পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল। এখন মুখ তুলিয়া বলিল,—এই বই আপনি কোথায় পেলেন বিমলদা, পাওয়া তো খুব সহজ নয়।

—বছরখানেক আগে রাশিয়া থেকে এসেছিল—মিঃ মুখার্জি পাঠিয়েছিলেন গোপনে। তারপর এদেশে আরও অনেক বই এমনি গোপনে গোপনে এসেছে। আমরা অনেকে ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি—তুমি মন দিয়ে পড়ো। পরে পুনরায় খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—গত মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর নানা দেশের অবস্থা আমাদের খুব ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখবার সময় এসেছে অজয়। যুদ্ধের পরে নানা দেশের যন্ত্র শিল্পের অসম্ভব উন্নতি সাধিত হয়েছে—ফলে প্রচুর পণ্যসম্ভার তৈরি হচ্ছে—এই পণ্য বিক্রয় করেই আজ সমস্ত ধনিকশ্রেণী পৃথিবীর ধনভাণ্ডার

নিঃশেষে নিজেদের ভাণ্ডারে এনে জমা করে ফেলেছে। শ্রমিক যারা—এই যে রাশি রাশি পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের মালিক যারা, তারা আজ ভিক্ষুকের মত এই সব ধনীর দুয়ারে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আছে দাঁড়িয়ে। অন্নহীন বস্ত্রহীন হয়ে রোগে শোকে ভুগে এরাই পৃথিবীর সর্বহারা দলকে বৃদ্ধি করছে। প্রকৃত সর্বহারা বলতে আজ জগতে এদেরই বোঝায়। এদের শ্রমশক্তিকে, কৌশলে করায়ত্ত করে, যন্ত্রশিল্প অধিকার করে আজ ধনিকশ্রেণী দিন দিন অর্থগৌরবে স্ফীত হয়ে উঠেছে। আর নিজেদের দেহের রক্ত জল করে—গড়ে তুললে যারা এই শিল্পসম্ভার, পৃথিবীর সমস্ত পণ্যদ্রব্যের, বিলাস দ্রব্যের জন্ম দিয়ে—যারা মানুষকে সভ্যতার উচ্চস্তরে তুলে দিলে—তাদের ভাগ্যে জুটল না অন্ন, জুটল না বস্ত্র—এই সভ্যতার বাইরে দাঁড়িয়ে তারা—সমাজচ্যুত হয়ে নিগৃহীত হয়ে পড়ে আছে। এ শুধু কোন বিশেষ এক দেশেই নয় অজয়—পৃথিবীর সবখানেই ঠিক একই ব্যবস্থা। তাই আজ এমনি দ্রুতবেগে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের ভিতরে এই বাণী সঞ্চারিত হয়ে পড়েছে—সমস্ত পৃথিবীর সর্বহারাদের দলে পড়েছে এক অদ্ভুত সাড়া। আমাদের দেশও হয়তো আজ এ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাকেও তো একদিন খানিকটা পৃথিবীর ভাগ্যের সঙ্গে আপনার ভাগ্যও মিলিয়ে দিতে হবে। এইটাই আজ আমাদের বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয় অজয়। এই বইতে এরই সন্ধান হয়তো তুমি খুঁজে পাবে। ১৯১৬ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে—তার পরেও আমরা তাকে নানা ভাবে জিইয়ে রেখেছি সত্য কিন্তু আজ তো এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না অজয় যে, আজ মেসিনগানের যুগ—ট্যাঙ্কের যুগ, এ্যারোপ্লেনের যুগ—এ যুগে অতি সন্তর্পণে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে গোপনে গোপনে দুই চারিটি বন্দুক, পিস্তল সংগ্রহ করে এত বড় একটা শক্তিকে তো উড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর হবে না। এসত্যকে যিনি অস্বীকার করবেন আজ তাঁর রাজনৈতিক

বুদ্ধির আমরা কোন রকমেই প্রশংসা করতে পারবো না। একদিন এর প্রয়োজন ছিল—সেদিন যতখানি এর দেবার দিয়েছিলও—সে দান কেউ কোন দিন অস্বীকার করবে না। কিন্তু আজ যদি তার দেবার সব কিছু শেষ হয়ে থাকে, তবে আর কাজ কি বল এমনি লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে লুকিয়ে লালন করবার? যারা বিপ্লবী, পার্টির মায়া তাদের কাটাতে হবে বৈকি? আজ সমগ্র জাতি হিসেবে যদি না জেগে ওঠে—তাহলে এমনি সকলের অজ্ঞাতে যত শক্তিই আমরা অর্জন করি না কেন, তার এতটুকু মূল্য থাকবে না। আজ কংগ্রেসের কোন্ দিকটা আমাকে সব চাইতে বেশী করে আকৃষ্ট করে জান? তার এই সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিত গণ-সংযোগের দিকটা। সে যতটুকু অগ্রসর হবে—জাতিকে সঙ্গে নেবে—সমস্ত জাতিকে পিছনে ফেলে সে একলা অগ্রসর হয়ে যাবে না। এমনি করেই একদিন হয়তো কংগ্রেসের এই হিংসা-অহিংসার কূটতর্ক অনেকখানি থেমে যাবে। হিংসায়-অহিংসায় মেশামিশি হয়ে—একদিন হয়তো জেগে উঠবে—এক ভীষণ গণ-বিপ্লব—যার কাছে বিদেশী শক্তি স্তব্ধ হয়ে যাবে। গতি তার কেউ রুখতে পারবে না। এ যেন আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি অজয়। আর তাই যদি হয়—যাক না আমাদের পার্টি—যাক না মুছে সব দলাদলি—যে কংগ্রেস আজ জনগণের প্রতিনিধি—যে কংগ্রেস একদিন সারা ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবে বিপ্লবের বহ্নি—তাকেই সবাই মিলে মাথায় তুলে নিই না কেন?

অজয় হাসিয়া বলিল,—এ তো আপনার অনুমান বিমলদা? রাউণ্ড টেবিলের মোহে কংগ্রেস যদি ভুলে যায়?

—শুধুই তো অনুমান নয় অজয়—আমি যেন এর আগমনী শুনতে পাচ্ছি ভাই। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, মহাত্মাজী রাজনীতিতে কাঁচা ছেলে নন্—ভুল তিনি করবেন না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

ইহার মাসখানেক পরে—একদিন রাত্রি আট নয়টার সময় বিমলদা ঝড়ের মত অজয়ের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—তোমাকে আজই এ বাসা ছাড়তে হবে অজয়।

অজয় বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন ?

—পুলিশ তোমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছে—খুব সম্ভব তোমাকে অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করবে, এই ইচ্ছে। আমি গোপনে খবর সংগ্রহ করেছি। ধরা দেওয়া হবে না।

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যেতে হবে ?

বাগবাজারের দিকে একটা ঘর ঠিক করেছি, আপাতত সেখানেই সাবধানে থাকবে।

অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল,—আর আপনি ?

আমিও স্থান পরিবর্তন করছি ভাই। এখন থেকে চিৎপুরের খালের ওপারে একটি বাসায় থাকবো। কয়েক মিনিটের মধ্যে অজয় তাহার স্বল্প মাত্র বিছানা ও খানকয়েক বই গোছাইয়া লইয়া—বিমলদা আর সে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া নূতন আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। একটা অপ্রশস্ত গলিতে গাড়ী আসিয়া থামিল—তারপর দুইজনে বিছানাপত্র বহিয়া আরও কয়েকটি ঘিজি গলি ঘুরিয়া একটি বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সদর দরজার কাছে আসিয়া বিমলদা বারকয়েক কড়া নাড়িয়া সাঙ্কেতিক ভাবে তিনবার দরজায় টোকা মারিলেন—দরজা খুলিয়া গেল। বিমলদা আর অজয় ভিতরে ঢুকিলে পুনরায় দরজা বন্ধ হইল। সম্মুখে হাতদশেক একটি উঠান, তাহার সামনেই একখানি ছোট্ট ঘর। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া এইবার অজয় চাহিয়া দেখে, যে মেয়েটি দরজা খুলিয়া দিল তাহার বয়স কুড়ি বাইশের বেশী

হইবে না। মেয়েটির চোখে-মুখে অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য—অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাব—অজয়কে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল।

বিমলদা বলিলেন,—এই তোমার অতিথি অপর্ণা।

মেয়েটি অজয়কে নমস্কার করিল, অজয়ও প্রতি-নমস্কার জানাইল। পরে বিমলদা অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি অজয়—ইনি অপর্ণা সেন। আর অজয়ের কথা তো তোমাকে বহুবার বলেছি অপর্ণা।

অজয় প্রশ্ন করিল,—কোন্ অপর্ণা সেন?

বিমলদা হাসিয়া বলিলেন,—আমাদের দলে অপর্ণা সেন একজনই আছে অজয়—ইনিই সেই দার্জিলিং কেসের অপর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের মনে পড়িয়া গেল—ডিষ্ট্রিক্ট জজের কন্যা অপর্ণা সেন, তাঁর দাদা সমীর সেন। সমীর সেন পাকা বিপ্লবী—নিজের বোনকে লইয়া আসিলেন দলে টানিয়া। তারপর একদিন ধরা পড়িবার ভয়ে নিজের বুকে নিজে গুলী করিয়া মরিলেন—বোনকে দিলেন পালাইবার সুযোগ করিয়া—ইনিই সেই অপর্ণা?

অজয়ের শ্রদ্ধা অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। স্টোভ ধরাইয়া অপর্ণা ততক্ষণ চায়ের জল চড়াইয়া দিয়াছে—বিছানার উপরে বিমলদা আর অজয় চাপিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বিমলদা অপর্ণাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,—এই কয়েকটি দিনেই একেবারে যেন পাকা গৃহিণী হয়ে পড়েছো—বোন। অপর্ণা চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে বলিতে লাগিল—এবার এই অভিনয়ই করতে হবে যে।

বিমলদা গম্ভীরমুখে বলিলেন—ঠিক।—কিন্তু সব দিকে হুঁস রেখে কাজ করো—দুই একটা ত্রুটি যে এখনও রয়ে গেছে বোন্। সিঁথিতে তোমার সিন্দুর কই—হাতে শাঁখা! তা নইলে চট্ করে যে ধরে ফেলবে যে কেউ? তুমি হ'লে গৃহস্থ ঘরের বউ—পাশের বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে এসে যখন প্রশ্ন করবে—কি জবাব দেবে শুনি?

সহসা মেয়েটির দুই গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল—মাটির দিকে চোখ রাখিয়া বলিল—ওটা সেরে নেব দাদা।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমলদা পুনরায় বলিলেন—অপর্ণা কিন্তু দিব্যি চা করে অজয়! যাক্ তোমার ভাগ্যের প্রশংসা করি ভাই—এখন থেকে প্রতিদিন দুইবেলা—এই চা-ই তোমার ভাগ্যে জুটবে। অজয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—বুঝতে পারনি বুঝি? তুমি এখন থেকে অপর্ণার অধীন—অর্থাৎ অতিথি! কিন্তু তোমরা থাকবে স্বামী স্ত্রী সেজে! সবাইকে এই পরিচয় দিতে হ'বে! জান তো দার্জিলিং থেকে পালানর পর পুলিশ অপর্ণাকে ভীষণভাবে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছে আর তোমাকেও তারা সহজে ছাড়বে না—কাজেই এ ছাড়া আর অন্য পথ নাই। অজয় প্রতিবাদ করিল না বটে—কিন্তু এত বড় সাংঘাতিক জিনিস যে সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই তাহার চোখ মুখ দিয়া বিস্ময় যেন একেবারে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

বিমলদা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বিপ্লবীদের মনকে যে পাথর করে দিতে হ'বে অজয়! যে পরিচয় একান্ত মিথ্যে—যে পরিচয় একান্ত সঙ্কোচজনক তাও যখন বলতে হ'বে—তখন সর্বদা স্মরণ রাখবে—এ মিথ্যে-মিথ্যে নয়—যে প্রাণ দেশের জন্যে উৎসর্গ করা হ'য়েছে—সেই প্রাণ রক্ষার জন্যেই এই মিথ্যের প্রয়োজন। আর মনে রাখবে পাপ মিছে—সঙ্কোচ মিছে—সত্য আমার দেশ! দেশের যা মঙ্গলকর তা লোকচক্ষে পাপ হ'লেও আমার কাছে পুণ্যকর্ম, দেশের যা মঙ্গলকর নয় তা লোকচক্ষে পুণ্যকর্ম হ'লেও আমার কাছে—একেবারে বর্জনীয়।

চা পান করিয়া বিমলদা বিদায় লইলেন। অপর্ণা তাঁহাকে সদর দরজার বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। অজয় তেমনি চুপ করিয়া বিছানার উপরে বসিয়াছিল। অপর্ণা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বারান্দায় বাল্‌তিতে জল আর মগ আছে—হাত-মুখ ধুয়ে নিন। অজয় যন্ত্রচালিতের মত বাহিরে আসিয়া হাতে মুখে জল দিতে দিতে বিমলদার কথা স্মরণ করিয়া নিজের

মনে বারে বারে মহড়া দিতে লাগিল—এ তো সত্য নয়—এ তো অভিনয় মাত্র।—যে পরিচয় একান্ত সঙ্কোচজনক—দেশের জন্য দরকার হলে তাও বলতে হবে বই কি—বিপ্লবীদের মনকে করতে হবে যে পাথরের মত! কিন্তু বাহির হইতে এতক্ষণ ধরিয়া নিজের মনকে তালিম দিয়া যে শক্তি সঞ্চয় সে করিয়াছিল—ঘরে আসিয়া ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে এক নিমেষে তাহা যে কোথায় নিঃশেষ হইয়া উড়িয়া গেল—তাহা সে ঠিকও পাইল না।

একটি কেরোসিনের আলোর সামনে দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া অপর্ণা কি যেন করিতেছিল। অজয়ের সাড়া পাইতেই হাতের আয়নাখানা নামাইয়া আরক্ত মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—অসম্পূর্ণ কাজটুকু শেষ করে নিলাম—বিমলদার আদেশ! অজয় চাহিয়া দেখে অপর্ণা সিঁথির মাঝখান দিয়া লাল টকটকে সিঁদুরের রেখা টানিয়া দিয়াছে। মাত্র এই সিঁদুর রেখা তাহার চেহারার একি অদ্ভুত পরিবর্তন আনিয়াছে—চোখে-মুখে যেন একটা কি মাদকতার ছাপ কে মাখাইয়া দিয়াছে মনে হয়। অজয় তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। বুকের ভিতরে কাঁপিয়া উঠিল তাহার—গলা শুকাইয়া উঠিল—ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না সে। ঘরের একপাশে শোঁ শোঁ করিয়া স্টোভ জ্বলিতেছিল—তাহার উপরে হয়তো রান্না চড়িয়েছে।

অপর্ণা অজয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল—রান্না চাপিয়েছি—ঘণ্টাখানেক দেরি হবে—ইচ্ছে করলে ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়তে পারেন!

অজয় এবার জবাব দিল—সে হলে মন্দ হ'ত না—কিন্তু শোব কোথায়?

—ঐ যে আমার বিছানা!

—কিন্তু আপনি শোবেন কোথায়?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—সেটা একটা সমস্যা বটে—কিন্তু আমি তো আর এখনই ঘুমুচ্ছি না—সে ব্যবস্থা একটা হবেই।

—শুনছেন—উঠুন—খেতে আসুন প্রভৃতি শব্দেও যখন অজয়ের ঘুম ভাঙ্গিল না—তখন রীতিমত কয়েকটি ঠেলা দিয়া অজয়কে জাগাইতে হইল। স্পর্শ পাইয়া অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

অপর্ণা বলিল—বিপ্লবীদের কি এমনি ঘুমকাতুরে হতে হয় নাকি?

অজয় অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিল—অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেছেন বুঝি?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—সেও তো এক সমস্যা—কি বলে ডাকি বলুন?

—কেন অজয়বাবু?

—কিন্তু যদি কেউ শুনতে পায়? নিন্ হাতে মুখে জল দিয়ে খেতে বসুন।

আহারান্তে শয়নের এক চমৎকার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল অপর্ণা। ছোট ঘর—আর শুধু এই একটি মাত্রই ঘর—তাহারই দে'ওয়ালের দুই দিকে আড়াআড়ি একগাছি দড়ি বাঁধিয়া একটি পরদা টাঙ্গাইয়া ফেলিয়া দিব্যি ঘরখানিকে দুইটি ভাগ করিয়া ফেলিল। নিজের বিছানাটি অজয়কে ছাড়িয়া দিয়া অজয়ের বিছানাটি অপর পাশে লইয়া নিজের জন্যে পাতিয়া লইল।

অজয় হাসিয়া বলিল—ঠকলেন কিন্তু!

অপর্ণা বলিল—কেন?

একখানা পুরানো কম্বল আর শক্ত একটা বালিশ—বিছানার চাদর একটা আছে—কিন্তু সেটা পেতে শুতে আপনার প্রবৃত্তি হবে না। আর আমার ভাগ্যে তো দেখছি জুটলো যাকে সেই ইস্কুলের বইয়ের ভাষায় বলে—দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা!

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ও: এই—কিন্তু অতিথি নারায়ণ যে!

অজয় শুইয়া পড়িয়া বলিল—বেশ। বিমলদা কিন্তু এক অদ্ভুত—কোথাকার জল যে কখন কোথায় নিয়ে গড়ান—তা কেউ ভেবেও পায় না।

অপর্ণা ঘরের দরজা দিয়া পরদার ওপাশে যাইতে যাইতে বলিল

—মনে কোন সঙ্কোচ রাখবেন না—ভাবুন এটা কাপড়ের পরদা নয় —ইটের দেয়াল।

অজয় বলিল—তথাস্তু।

কিন্তু অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া চোখ বুঁজিয়া বার বার করিয়া ভাবিলেও কখনও কাপড়ের পরদা যে ইঁটের দেয়াল হইয়া যায় না, তাহা বুঝিতে অজয়ের এতটুকু অসুবিধা হইল না। কিন্তু এই মেয়েটি তো দিব্য সপ্রতিভ—সে তো সকল সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সহজ হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেছে—আর রাজ্যের সঙ্কোচ আসিয়া চাপিয়াছে কি তাহারই মনে? ওপাশ হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—পাশ ফিরিবার শব্দটি পর্যন্ত ভাসিয়া আসে—কতটুকুই বা ব্যবধান! এমনি একটি অপরিচিত তরুণীর সহিত তাহাকে এক ঘরে নিশি যাপন করিতে হইবে—ইহা যদি দুই দিন পূর্বেও কেহ তাহাকে বলিত—সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। অথচ এখন হইতে দিনের পর দিন এই তরুণীটির সহিত একই ঘরে শুধু বাস করিতে হইবে নয়—তাহাকে নিজের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে।

প্রথম দর্শনেই অজয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই সুন্দর মুখশ্রীর দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারে নাই। এখন অন্ধকারে তাহার নিমীলিত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল অপর্ণার অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি—তাহাই সে আপন মনের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া লুকাইয়া একান্ত মুগ্ধের মত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

দুই দিন পরের কথা। দুপুর বেলা আহারাদির পর অজয় নিজের বিছানায় শুইয়া গায়ের উপরে লেপ টানিয়া লইয়া একটি রীতিমত দীর্ঘ ঘুম দিবার যোগাড় করিতেছিল। ঘরের মাঝখানের পর্দাটি দিনের বেলা এক পাশে টানিয়া রাখা হয়। ঘরের ও-পাশে অপর্ণার

বিছানার উপরে একখানি সমাজতন্ত্রবাদের ইংরাজী বই পড়িয়া আছে। অপর্ণা জানালা খুলিয়া পাশের বাড়ির একটি বউয়ের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। অজয় লেপটি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। এই দুই দিনে আবহাওয়া অনেকখানি সহজ হইয়া আসিয়াছে—তাহারা দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া দিব্যি সহজভাবে মিশিতেছে। এ যেন দুইটি পুরুষ বন্ধু একসঙ্গে বিদেশের একটি ঘরে বাসা বাঁধিয়াছে। অজয়ের বাইরে যাইবার হুকুম নাই—বিমলদা সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—একটি বিশ্বাসী বৃদ্ধ প্রত্যহ দুইবার আসিয়া বাজার করিয়া দিয়া খবর লইয়া যায়।

বিমলদা আর আসেন নাই—বিশেষ দরকার না হইলে আর শীঘ্র হয়তো আসিবেনও না। জানালা বন্ধ করিয়া অপর্ণা বিছানায় আসিয়া বসিল।

অজয় মুখ তুলিয়া বলিল—কি এত গল্প হচ্ছিল আপনাদের ?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—ওসব আপনাদের শুনতে মানা। আমাদের ঘর-কন্নার ইতিহাস।

অজয়ও হাসিয়া বলিল,—না শোনাই ভাল—কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়া অসম্ভব নয়।

অপর্ণা বলিল—কপালে থাকলেই ওঠে। বউটি আজ কয়দিন ধরে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছিল। আজ একেবারে জানলার শিক ধরে ডাকলে—শুনুন না ভাই! অগত্যা দাঁড়াতে হলো—তারপর কত কথা, আগে কোথায় ছিলে ? নামটি কি ? কতদিন বিয়ে হয়েছে ? কর্তাটি কি করেন—কেমন মানুষ ? কতদূর পড়াশুনা করেছে ? টকি সিনেমা দেখেছো—কি আশ্চর্য—ছবিতে কথা কয় ? এই সব।

অজয় হাসিয়া জবাব দিল,—এ তো গেল প্রশ্ন, কিন্তু জবাবগুলো কি প্রকারের হলো শুনতে পাই কি ?

অপর্ণা বলিল—অদৃষ্টের লিখন—বলতেই হবে। বল্লাম—আগে

ছিলাম বালিগঞ্জের দিকে। নাম—সুষমা। বছর তুই বিয়ে হলো। উনি চাকরী বাকরী কিছু করেন না—দিনরাত বাসায় শুয়ে শুয়ে যাত্রার দলের গান বাঁধেন—তাতেই যা পান—দুটি মানুষের এক রকম চলে যায়। লেখাপড়া আমি বিশেষ করতে পারিনি ভাই—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—চিঠি-পত্তোর লিখতে পারি—কোন রকমে ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়তে পারি। টকি সিনেমা দেখবার পয়সা কোথায় ভাই—বল্লাম যে কর্তাটির চাক্‌রী বাক্‌রী নাই।

অজয় হাসিয়া বলিল,—ইস্‌ এ যে দেখছি, একেবারে পঞ্চতন্ত্রের বিষ্ণুশর্মাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। নিজে বি-এ পাশ করে যদি কোন রকমে ডিটেকটিভ নভেল পড়তে পারেন, তাতে আমার অবশ্য আপত্তির কোন কারণ নাই, কিন্তু আমাকে শেষটায় একেবারে যাত্রার দলের গান লিখিয়ে করে ছাড়লেন।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—তা ছাড়া উপায় কি বলুন। এমন সুস্থ সবল দেহ নিয়ে দিনরাত যে লোক ঘরের কোণে চুপটি করে বসে থাকে, তার অন্য আর কি পরিচয় দেওয়া চলতে পারে ?

অজয় বলিল—তাতো হলো, কিন্তু যদি বলতো—কর্তার লেখা একটা গান শুনিয়ে দাও তো ভাই—কি করতেন তা হ'লে ? অমনি কি সুর করে ধরে বসতেন—

রুহিদাস বাপ্‌ নীলমণি—
একবার মা বলে ডাক কানে শুনি ?

অপর্ণা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিয়া বলিল,—এই যে হয়ে এসেছে আর কি, আর একটু চেষ্টা করলেই একেবারে খাঁটি যাত্রাওয়ালা !

অজয় হাসিয়া বলিল—সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি ! তারপর উভয়ে হাসিমুখে খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল।

পরে অপর্ণা মুখ তুলিয়া বলিল,—সেদিন বিমলদা এসে যখন বল্লেন আপনার কথা, এমনি করে একসঙ্গে থাকার কথা—তখন সত্যিই ভারী ভয় হলো—কেমন মানুষ—কেমন স্বভাব কে জানে !

অজয় বলিল,—কিন্তু ভয় বলে কিছু একটা অন্ততঃ আপনার ভিতরে ছিল বলে তো আপনার মুখ দেখে মনে করতে পারি নাই। বরং আমার নিজের দিকটাই—

অপর্ণা বলিল,—ভয়কে জয় করেছিলাম—দুইদিন ধরে কেবল মনে মনে বলেছি—কিসের সঙ্কোচ—কিসের ভয়—আপনার মাথা যদি উঁচু করে রাখা যায়—কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না।

অজয় পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—কি আর করবেন বলুন! বিপাকে পড়লে—সাপে মানুষে একই স্থানে আশ্রয় লয়। কিন্তু কেমন মানুষ—কেমন স্বভাব—পরীক্ষার ফলাফলটা জানবার এখনও সময় হয় নাই বোধ হয়?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—পরের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনবার লোভ তো আপনার কম নয়।

অজয় বলিল,—কম নয় কি বলছেন বরং বলুন অত্যন্ত বেশী।

—যদি না নিরাশ হন।

—যদি নিয়ে আমার কারবার নয়—আমার কারবার সত্যি নিয়ে।

—সত্যও অপ্রিয় হলে বলতে নাই—সুতরাং কিছু বলছি না। আপাতত ঘুমোন।

রাত্রে আহারান্তে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—এখন ঘুমুবেন বুঝি?

অজয় বিছানায় গা এলাইয়া দিয়া বলিল,—কি আর করি?

—"ক্যাপিটাল"এর দুই একটা চ্যাপটার, বুঝিয়ে দিন না।

অজয় হাসিমুখে বলিল,—বেশ লোক ধরেছেন। আমিই ভাল বুঝে উঠতে পারি না—তা আবার অপরকে বুঝাব।

—ভাল না পারেন—মন্দ করেই বোঝাবেন। আমি যে দন্তস্ফুট করতেই পারছি না। একে অর্থনীতি—তার সঙ্গে আবার রাজনীতি মেশান।

—কিন্তু এখন ভাল লাগছে না। আপনি তো দেখছি রাতদিন একটা না একটা পলিটিকস-এর বই নিয়ে মেতে থাকতে পারেন। পলিটিকস-এর মত নীরস জিনিস সব সময় ভাল লাগে না আমার!

—কিন্তু কি ভাল লাগে শুনি ?

অজয় হাসিয়া বলিল,—ভাল লাগে ? ভাল লাগে কিছুই না করা—চুপ করে নীল আকাশের গায়ের সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা। মাঠের শেষে গ্রামের সবুজ রঙ যেখানে ফিকে হয়ে গেছে —সেই দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কিছুই না ভাবা।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—এ যে দেখছি রীতিমত কবিত্ব। কোন অসুখ বিসুখের পূর্বাবস্থা কি না তাই বা কে বলবে ?

অজয় বলিল,—কিন্তু কবিত্বকেই বা আপনি এত ছোট করে দেখছেন কেন বলুন তো ? এ সংসার মরুভূমির মাঝে একমাত্র ওয়েসিস্ হলো কবিতা।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল—কবিতা ? একদিন কবিতাও ভালবাসতাম অজয়বাবু—কিন্তু দুঃখের আগুনে পুড়ে মন যে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। বাবা ভাবনা চিন্তায় মারা গেলেন—দাদার কথা তো আপনারা সবই শুনেছেন। তাই আমারও বাকি জীবনটা এ ছাড়া অন্য চিন্তাও যে অন্যায় বলে মনে করি অজয়বাবু !

অজয় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—আপনার কথা, আপনার দাদা সমীর সেনের কথা বলুন না আজ সব খুলে। আপনাদের কথা শুনবার যে প্রবল আগ্রহ আমার।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল,—বাবা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ। কিন্তু সরকারী চাকুরে হলে হবে কি, মনটি ছিল তাঁর খাঁটি স্বদেশী। সে যুগে সুরেন ব্যানার্জিকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করতেন। বাড়িতে বসে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—স্বদেশের স্বাধীনতার আলোচনায় যখন তখন তিনি একেবারে মেতে উঠতেন। তাঁর শোবার ঘরে একখানা ছবি টাঙান ছিল —ছবিখানার নাম শিকার যাত্রা—মা পতি-পুত্রকে নিজ হাতে সাজিয়ে শিকারে পাঠাচ্ছেন। কতবার তিনি সেই ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলতেন, কবে আমাদের দেশের এমন দিন

আসবে—কবে আমাদের মেয়েরা এমনি করে নিজের হাতে সাজিয়ে পতি-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাবে। এমনি করে আমরা ছোট বেলা থেকেই স্বদেশী ভাবাপন্ন হয়ে উঠলাম। কিন্তু এরই মধ্যে দাদা কলেজে পড়তে পড়তে একেবারে ঘোর বিপ্লবী হয়ে উঠলেন—আমাকেও সমস্ত বুঝিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এলেন দলে টেনে। বাবা এর কিছুই জানতেন না—যখন জানলেন—তাঁর ভাবনার আর সীমা রইলো না। ছেলেকে তিনি বড় চাকুরে করতে চান নাই—চাকরির উপরে তাঁর নিতান্ত বিরাগ—দাদাকে তিনি তাই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন—ইচ্ছে ছিল মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করার পর বিলেত পাঠিয়ে এফ, আর, সি, এস কি ঐ রকম একটা কিছু পাস করিয়ে নিয়ে আসবেন। ফিফ্থ ইয়ারে যে-বার তিনি পরীক্ষা দিলেন—সেবার তিনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হলো না—মাস ছয়েক পরে দার্জিলিং-এর এক বাড়িতে দাদা, আমি আর যতীন নাম করে অন্য একটি ছেলে—এই তিন জনে মিলে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বোমার ফরমুলা নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। পুলিশ কেমন করে খবর পেয়ে বাড়ি ঘেরাও করে একেবারে দোতালা পর্যন্ত ধাওয়া করলে। উপায়ান্তর না দেখে দাদা—আমাকে জাপ্‌টে ধরে দোতলা থেকে দিলেন লাফ্। সঙ্গে সঙ্গে যতীনও লাফিয়ে নীচে পড়লো। আমি রইলাম অক্ষত কিন্তু দাদা দু'জনের চোট একা সাম্‌লাতে পারলেন না—পাশে একটা পাথরের উপরে তাঁর একখানা পা গিয়ে পড়লো—চেয়ে দেখি তাঁর পায়ের হাড় একেবারে ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছে—তীরবেগে রক্ত পড়ছে ঝরে। নিজের ভাঙ্গা পায়ের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই বুঝতে পারলেন—এবার আর তাঁর রক্ষা নাই। আদেশ করলেন আমাদের পালিয়ে যাবার। আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে নিজের কোমর থেকে পিস্তল বের করে বল্লেন—যদি না পালাও তবে গুলী করবো—পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া হবে না। আমি কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কি হবে দাদা?

তিনি বল্লেন—সে চিন্তা আমি করেছি—আমার আদেশ পালন কর শিগ্‌গীর। কিন্তু তবু অমনি করে তাঁকে ফেলে যেতে কেউ আমরা পারলাম না দেখে—তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটি নিজের বুকের উপরে ধরে ঘোড়া টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেহ তাঁর মাটিতে এলিয়ে পড়লো। আমার তখন জ্ঞান ছিল না—যতীন আমার হাত ধরে ছুটে একটা টিলার আড়ালে চলে এলো। সে আজ এক বছরের কথা। তারপর নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে বিমলদার কাছে এসে তাঁরই হাতে নিজের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছি। এইতো গেল ইতিহাস। কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ্‌চাপ থাকিবার পর অজয় বলিল—রাত হয়েছে এইবার ঘুমোন।

কয়েক দিন পরে একদিন সকালবেলা অজয় খবরের কাগজ খুলিয়া একেবারে বিস্ময় ও আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"হাওড়ার গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক লাহিড়ী আততায়ীর গুলিতে নিহত।" ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—শশাঙ্ক জন দুই সঙ্গী লইয়া হাওড়া হইতে আট দশ মাইল দূর পর্যন্ত বিপ্লবী সন্দেহ করিয়া জনৈক ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া গিয়াছিল—গতকল্য মধ্যরাত্রে এক মাঠের মধ্যে উক্ত বিপ্লবীটির সহিত তাহাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়—ফলে শশাঙ্ক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিপ্লবীটির কোন সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

অজয় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল—আজ বেলা বারোটায় তাহাদের স্টেসনে কলিকাতার যে-ট্রেনখানি পৌঁছিবে, সেই ট্রেনেই আজও নিত্যকার মত কাগজ গিয়া পৌঁছিবে। তারপর সেখান হইতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে তাহাদের গ্রামে। তাহার জ্যাঠামণি প্রত্যহ এমনি সময় কাগজের আশায় বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকেন। আজিও যথারীতি কাগজ গিয়া তাঁহার হাতে পৌঁছিবে—কাগজখানি খুলিয়াই কি যে অবস্থা হইবে তাঁহার —অজয় ভাবিতেও পারে না। হয়তো মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন—

দুর্বল শরীরে এ আঘাত তিনি সহ্য করিয়া উঠিতে পারিবেন তো? এ সময়ে যদি অজয় তাঁর কাছে থাকিতে পারিত তাহা হইলেও হয়তো অনেকখানি সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিত কিন্তু তাহার যে কোন উপায়ই নাই।

অপর্ণা সমস্ত শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। জ্যাঠামণি যে অজয়ের প্রাণের কতখানি জুড়িয়া আছেন তাহা সে ইতিমধ্যেই জানিতে পারিয়াছিল। সমস্তটা দিন রাত্রি এমনি ভাবিতে ভাবিতে অজয়ের কাটিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে বিমলদা আসিয়া বলিলেন—বাড়ি যাবে অজয়?

অজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল—যাবো বিমলদা—কোন খবর পেয়েছেন সেখানকার?

—তোমার জ্যাঠামণির খুব অসুখ অজয়—এত বড় আঘাতটা হয়তো সামলাতে পারবেন না। তোমার একবার দেখা করা উচিত।

অজয় বলিল—আমার মন যে জ্যাঠামণির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বিমলদা—কেবল আপনার দেখা পাইনি বলে যেতে পারিনি। আজই আমি যাবো—বিপদ যদি আসে আসবে, তাই বলে কি এ সময়েও এমনি আত্মগোপন করে থাকবো? বলিতে বলিতে অজয়ের দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল।

বিমলদা বলিলেন—আজ রাত বারোটার গাড়ীতে যেয়ো—দম্‌দম্ স্টেশন থেকে উঠবে। কিন্তু একটা দিনের বেশী থাকতে পারবে না অজয়—পুলিশে খোঁজ পেলে আর ফিরে আসতে দেবে না—নিশ্চয় জেনো।

বিদায়ের প্রাক্কালে ছোট একটি পুঁটুলীতে খানদুই কাপড় জামা গোছাইয়া লইয়া—অজয়ের হাতে দিয়া অপর্ণা বলিল—অজয়বাবু!

অজয় বলিল—কি বলছেন?

কিন্তু অপর্ণা মিনিটখানেক কোন কথা বলিতে পারিল না—মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে মুখ তুলিয়া

বলিল—খুব সাবধানে থাকবেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার মন কিন্তু কিছুতেই স্থির হবে না জান্‌বেন। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখের কোণ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ইহা অজয়ের নিকট এক অদ্ভুত ব্যাপার! মাত্র কয়টা দিনের পরিচয় তাহারই মাঝে যে, কেহ তাহার জন্য এমনি করিয়া চোখের জল ফেলিতে পারে ইহা তাহার ধারণার অতীত।

সে হাসিয়া বলিল—বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে পতিপুত্র নিয়ে পরম মঙ্গলময়ীরূপে যাঁরা বিরাজ কর্চ্ছেন, এ যে একেবারে তাদেরই মতো কথা হলো—বিপ্লবী অপর্ণা সেনের মত তো নয়।

—বিপ্লবী হতে পারি কিন্তু তাই বলে—নারীত্বকে তো বিসর্জন দিই নাই?

অজয় পরম হৃষ্টমনে বলিল—তোমার অনুরোধ মনে রাখবো অপর্ণা—খুব সাবধানেই থাক্‌বো।

অজয় বাহির হইয়া গেলে—কতক্ষণ বাহিরের দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া পথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অপর্ণা দরজা বন্ধ করিল।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

শেষরাত্রে অজয় আসিয়া নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করিল। স্টেশনে কোন পরিচিত লোকের চোখেই সে পড়ে নাই—আর অত রাত্রে কে-ই বা কাহাকে লক্ষ্য করে। সারাটা নির্জন পথের উপর দিয়া হাঁটিয়া গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছে—গ্রাম তো তখনও নিশুতির কোলে নিঝুম হইয়াছিল। চন্দনার আর আজকাল সেদিন নাই—পারাপার করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না—বর্ষার শেষে জল নীচে নামিয়া গিয়া অগ্রহায়ণ-পৌষের দিকে স্রোতধারা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং বর্ষার শেষে বাঁশের পুল বাঁধিয়া দিলেই লোকে সচ্ছন্দে পারাপার করিতে পারে। বাড়ির সংলগ্ন আমবাগানের

ভিতরে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল অজয়—বুক, তাহার কাঁপিয়া উঠিল। কেমন আছেন তাহার জ্যাঠামণি?—বাঁচিয়া আছেন তো? বাড়ির দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল—কই তাহার জ্যাঠামণির ঘর হইতে এতটুকু আলোর রশ্মি তো দেখা যাইতেছে না! কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া মনে খানিকটা বল সঞ্চয় করিয়া লইয়া তবে সে বাড়ির ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। না—এই তো জ্যাঠামণির ঘরে আলো রহিয়াছে—যাক্ বাঁচিয়া আছেন তাহা হইলে জ্যাঠামণি!! তাহার মন অনেকখানি হাল্কা হইয়া উঠিল। ঘরের নিকটে আ'সয়া দাঁড়াইতেই—তাহার মা ভিতর হইতে প্রশ্ন করিলেন—কে ওখানে?

অজয় বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া গলা খাট করিয়া জবাব দিল—আমি মা—দরজা খোল।

কল্যাণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলে, অজয় ভিতরে গিয়া ঢুকিল। কল্যাণী বলিলেন—তুই এতদিনে এলি বাবা!

অজয় চাহিয়া দেখে তাহার জ্যাঠামণির রোগশয্যার পাশে বসিয়া আছেন এ বাড়ির চিরসহচর তাহার সেই অক্ষয় কাকা। অক্ষয় উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—এসো অজয়, তোমার জ্যাঠামণির কাছে বসো। তোমার কথাই আজ দুটো দিন ধরে শুধু বলেছেন। সারা রাত্রির ভিতরে মাত্র দুই তিন বার সজ্ঞানে কথা বলেছেন—তখন শুধু তোমাকেই ডেকেছেন।

অজয় তাহার জ্যাঠামণির বিছানার উপরে বসিয়া মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—জ্যাঠামণি আমি এসেছি। কিন্তু তিনি তাহার দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছেড়ে দে—আমায় ছেড়ে দে—গুলী করবে—গুলী করবে।" তারপর আরও কয়েকবার শুধু ঝোঁকের মাথায়, 'আমায় গুলী করবে' এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অক্ষয় বলিলেন—খবরটা জেনে তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়েন—তারপর থেকে এমনি চল্‌ছে—কখনও এমনি বলেন—কখনও দুই একটা কথা সজ্ঞানে বলেন।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। অজয় জ্যাঠামণির বিছানায় তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কল্যাণী কাঁদিয়া বলিলেন—তোর জন্যেই বুঝি অঞ্জু, জীবনটা এতক্ষণ বেরোয়নি রে। অজয়ের দুই চোখের কোন্ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—জ্যাঠামণির শেষ সময়ে আমি কিছুই করতে পারলাম না—আমার এ দুঃখ যে কোন কালেও যাবে না মা! বেলা গোটা দশেকের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। শ্মশান হইতে যখন অজয় বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন আর সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই। অজয়কে যে এমনি করিয়া আই. বি-র লোক খোঁজ করিতেছে—সন্ধান পাইলে যে তাহাকে লইয়া বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিবে তাহা শুনিয়া কল্যাণী দেবী বলিলেন—তোকে আর আমি এখানে একটা দিনও তাহলে ধরে রাখবো না অঞ্জু—কলকাতাই যদি তোর নিরাপদ স্থান হয় আজই তুই ফিরে যা কলকাতায়। অজয় বলিল—একা বাড়িতে তুমি কি করে থাকবে মা?

—সে আমি পারবো অঞ্জু—তোর অক্ষয় কাকা বলেছেন—তিনিই সব ভার নেবেন—তাঁর ছেলে মেয়েরা রাত্রে এসে আমার কাছে থাকবে। আমার জন্যে তুই কিছু ভাবিস নে বাবা। আর একটা কথা—তাঁর পিণ্ডদানের তুই তো একমাত্র অধিকারী! একদিন সাবধানে কালীঘাট গিয়ে পিণ্ডটা দিয়ে আসিস্ বাবা। তুই ছাড়া তাঁর যে আর কেউ নাই রে। অজয় কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কল্যাণী বাধা দিয়া বলিলেন—কোন যুক্তি এখানে খাটবে না অঞ্জু! তোরা পরলোক না মান্‌তে পারিস—ভগবানে অবিশ্বাসী হ'তে পারিস্ কিন্তু তিনি তো মান্‌তেন—আমি তো মানি বাবা।

অজয় হাসিয়া বলিল—তুমি আমায় অযথা অনুযোগ করছ মা—পরলোক আছে কি নাই—ভগবান মানি কি মানি না—তা যে আমিই আজ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারি নি। কিন্তু তোমার কথা আমি রাখবো—জ্যাঠামণির শেষ কাজ আমি করবো মা।

গতকল্য শেষরাত্রে অজয় আসিয়া গ্রামে ঢুকিয়াছিল আর আজ শেষ রাত্রে চলিল গ্রাম ছাড়িয়া। অক্ষয় কাকা তাহার সঙ্গে চলিয়াছেন আগাইয়া দিতে। আজিও গ্রাম একেবারে নিশুতির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। নদীর পরপারের মাঠের ভিতরে সাদা সাদা কুয়াশা ও জ্যোৎস্নায় মিলিয়া যেন ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। নদীর বাঁশের পুল পার হইয়া—অজয় শেষবারের মত গ্রামের দিকে ফিরিয়া চাহিল। আবার কতদিন পরে ফিরিয়া আসিবে কে জানে? সংসারের দুইটি বন্ধনের একটি আজ খসিয়া গেল—জ্যাঠামণিকে সে আর দেখিতে পাইবে না—আর তাঁর অফুরন্ত স্নেহ সে ভোগ করিবে না। শৈশবের অতীত দিনগুলি একে একে মনে পড়িতে লাগিল—জ্যাঠামণি তাহাকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া গল্প বলিয়াছেন—কত আদর করিয়াছেন—পিতার অভাব একটা দিনের জন্যও তাহাকে বোধ করিতে দেন নাই। তারপর ইস্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ হইল। তারপর আসিল একুশ সালের অসহযোগ আন্দোলন—তাহারই উৎসাহে জ্যাঠামণি আসিয়া আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িলেন—এত বড় চাকরী দিলেন ছাড়িয়া। সেই হইতে সারাটা জীবন সন্ন্যাসীর মত কাটাইয়া দিলেন। সেই জ্যাঠামণি আর আজ নাই। পথ চলিতে চলিতে তাহার সারা অন্তর বারে বারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বাকী রহিলেন মা। তাঁহাকে নিরাশ্রয় করিয়া—একা একা ফেলিয়া রাখিয়া সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিল? বিপদে আপদে কে দেখিবে? তাঁহার অসুখ হইলে পথ্যটুকু করিয়া দিবে এমন মানুষও তো নাই। চির-দুখিনী মা তাহার—স্বামী তাঁহাকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন—আজ পুত্রও তাঁহাকে কাঁদাইয়াই চলিল—একটা দিনের জন্যও সুখের মুখ তিনি দেখিলেন না! স্টেসনের এক অন্ধকার কোণে অজয় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—অক্ষয় টিকিট করিয়া আনিয়া গাড়ি আসিলে তাহাকে তুলিয়া দিয়া তবে বিদায় লইলেন।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

দিনের বেলা পথের মধ্যে ছোট একটি স্টেসনে অজয় নামিয়া পড়িয়াছিল। সারাটা দিন এদিক ওদিক কাটাইয়া সন্ধ্যার দিকের গাড়ীতে চাপিয়া রাত্রি গোটা নয়েকের সময় দমদম্ স্টেশনে নামিয়া কলিকাতার বাসে চাপিয়া বসিল। সদর দরজায় সাঙ্কেতিক শব্দ করিতেই অপর্ণা দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা বন্ধ করিয়া হ্যারিকেন তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অপর্ণা শিহরিয়া উঠিল—এ কি চেহারা হইয়াছে তাহার—দুই চোখ লাল, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো, মুখ চোখ শুকাইয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল বাড়ির খবর কি—জ্যাঠামশাই কেমন আছেন?

অজয় নির্বিকারভাবে জবাব করিল—মারা গেছেন।

—মারা গেছেন?

অপর্ণার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। এক বাটী গরম দুধ আনিয়া অজয়ের সম্মুখে ধরিয়া অপর্ণা কহিল—দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ুন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে শরীর আপনার ভাল নাই—কাজেই রাত করে ভাত আর খাবেন না।

সকাল বেলা অজয়ের যখন ঘুম ভাঙ্গিল—তখন সারা গা তাহার জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। যে বৃদ্ধ প্রত্যহ বাজার করিয়া দিয়া যান—তাঁহাকে দিয়া অপর্ণা বিমলদার নিকট খবর পাঠাইল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল না। সন্ধ্যার পর অজয়ের কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া সে মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। অজয়ের জ্বরের তখন মগ্ন অবস্থা, সমস্ত শরীরে রীতিমত দাহ উপস্থিত হইয়াছে। অজয় অপর্ণার হাতখানা দুইহাত দিয়া নিজের কপালের উপরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আঃ

কি ঠাণ্ডা হাত—কি নরম হাত! অপর্ণা বলিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দেই?

—দাও!

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অপর্ণা বলিল—চিকিৎসার যে কোন বন্দোবস্ত হলো না অজয়বাবু—কি হবে বলুন তো?

অজয় বলিল—কোন ভয় নাই—জ্বর অমনি সেরে যাবে। আঃ, বেশ করে আমার মাথাটা টিপে দাও—চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দাও। অপর্ণা চুপ্‌টি করিয়া তাহার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। জ্বরের ঘোরে অজয়ের বক্তৃতার নেশা চাপিয়া গিয়াছিল—সে বলিতে লাগিল—এমনি করে সেবা তোমরা করতে পার বলেই তো তোমাদের গৃহলক্ষ্মী বলে অপর্ণা! সেবাযত্ন, স্নেহ ভালবাসা এ তো নারীরই দান—এতেই তো সংসার আজও চল্‌ছে—নইলে দুনিয়ার সবই যে অচল হয়ে যেতো। তুমি কিছু মনে করো না অপর্ণা—আমরা বিপ্লবী হ'তে পারি—গায়ের জোরে স্নেহ ভালবাসার বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারি কিন্তু জেনো সত্যিকারের স্নেহ যেখানে, ভালবাসা যেখানে—সেখানে কোন জোরই খাটে না। এমনি ঘণ্টাখানেক নানা বক্তৃতার পর অজয় ক্রমে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। অপর্ণা তাহার বক্তৃতাস্রোতে কোনপ্রকার বাধা না দিয়া কখনও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতেছিল —কখনও মনে মনে হাসিতেছিল।

পরের দিন সকালে সেই বৃদ্ধটির সহিত একজন ডাক্তার আসিয়া যখন হাজির হইলেন—তাহার পূর্বেই অজয়ের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তারটি তাহাকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন—ম্যালেরিয়া জ্বর—কয়েক দাগ কুইনাইন মিকশ্চার পাঠাইয়া দিবেন—ঠিকমত খাইলে সম্ভবতঃ আর জ্বর আসিবে না। সত্যই জ্বর আর আসিল না—অজয় বার কয়েক ভাত খাইতে চাহিয়া মিছামিছি অপর্ণার কাছে ধমক খাইল।

দিনতিনেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা অজয় আর অপর্ণা চায়ের পেয়ালা সম্মুখে করিয়া গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছিল—এমন সময় সদর

দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। অপর্ণা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিলেন বিমলদা। ভিতরে আসিয়া চায়ের গন্ধে তিনি যেন অনেকখানি সজীব হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—আমার ভাগ কই অপর্ণা! অপর্ণা হাসিয়া নিজের কাপ তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—এই আরম্ভ করুন!

—না ওতে হবে না দিদি—আমার পুরা কাঁচের গ্লাসের এক গ্লাস চাই—বেশী করে মিষ্টি দেবে—বেশী করে দুধ দেবে—তবেই না চা!

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ততক্ষণ আরম্ভ করুন—জল গরমই আছে দিচ্ছি করে! অজয় কথা কহে নাই—চুপ করিয়া বসিয়াছিল—এতক্ষণে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি ভাগ্যবান অজয়—রোজ রোজ দুবেলা এমনি চা খাচ্ছ! পরে অপর্ণাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—কেমন তোমার অতিথি সেবা ভালভাবে চলছে তো বোন!

অপর্ণা কথা না কহিয়া মুখ নামাইয়া চা করিতে লাগিল। অজয় বলিল—ইস আজ তো খুব ঠাট্টা করছেন বিমলদা—আমার মনটা যে কেমন কর্চ্ছে—তা তো আর বুঝছেন না—তা ছাড়া এই যে দুটো দিন ধরে আমার একশ চার পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হয়ে গেল—এসেছিলেন একবার? বিমলদা তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কণ্ঠে রাজ্যের স্নেহ টানিয়া আনিয়া বলিলেন—তুই যে জ্যাঠামণিকে কত ভালবাসতিস তা কি আর জানিনে ভাই! তবু তো দুঃখ আমাদের পেলে চলবে না—যেখানে নিজেদের কোন হাত নেই—তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? এই যে তোরা আমাকে এত ভালবাসিস—কাল যদি আমি মরি তোরা শত চেষ্টা করেও কি আমাকে রাখতে পারবি? আর জ্বরের কথা? তোকে অ-স্থানে রাখিনি ভাই—স্বয়ং অপর্ণা দিদি যে রয়েছেন আজ তোর বডিগার্ড হয়ে।

অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া পুনরায় মুখ নামাইল।

—তা ছাড়া আজ মস্ত বড় একটা সুখবর নিয়ে এসেছি ভাই—শুনলে সব মনখারাপ তোর ভাল হয়ে যাবে। অপর্ণা ও অজয় উভয়ে একই সঙ্গে প্রশ্ন করিল—কি খবর বিমলদা!

বিমলদা বলিলেন—তোর বাবা আন্দামান থেকে ফিরে এসেছেন অজয়। অজয় বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল—তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অপর্ণা বলিল—কবে এলেন—কোথায় আছেন তিনি?

—কাল এসেছেন—আছেন কলকাতায়ই!

অজয় এতক্ষণে কথা কহিতে পারিল—বলিল—পঁচিশ বছর তো হয়নি দাদা!

—না হয়নি—কিন্তু এমনি প্রায় সব বন্দীদেরই দীর্ঘদিন পরে আন্দামান থেকে ছেড়ে দিচ্ছে! তুই দেখা করতে যাবি না অজয়!

অজয় দুইচোখ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল—যাব, আমি যাব দাদা! কোথায় গেলে তাঁকে দেখতে পাব! আমাকে নিয়ে চলুন!

—আজ নয় ভাই। কাল ঠিক এমনি সময়ে আমি আবার আসবো—তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

বিমলদা বিদায় লইলে সারাটা রাত্রির মধ্যে অজয় একটা মিনিটও ঘুমাইতে পারিল না। মনে হইতেছিল কখন রাত্রি প্রভাত হইবে—কতক্ষণে আগামী কালের দিনটি শেষ হইয়া আবার সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে—বিমলদা আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, সে তাহার বাবাকে দেখিতে পাইবে। কতকাল পরে—উঃ কত দীর্ঘদিন সে! অজয় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল প্রায় পনর বৎসর। সেই কলিকাতার বাসার কথা অজয়ের মনে পড়ে—সে তখন কত ছোট। তাহার আবছা আবছা মনে পড়ে—তাহার বাবার কেমন সুন্দর শরীর ছিল—কেমন সুন্দর গায়ের রং ছিল। আজ এতদিন পরে চেহারা না জানি কেমন হইয়াছে। কিন্তু অজয়কে কি তিনি চিনিতে পারিবেন? না তাতো পারিবেন না!

আর সে-ই কি তাহার বাবাকে এতদিন পরে চিনিতে পারিবে ? না তাহাও তো পারিবে না! সেই যে উল্লাসদার নিকট হইতে বাবার ছবিখানা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা সে কতবার দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যে পনরটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—সে চেহারা—সে বয়স যে তাঁহার আর নাই। হায়রে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—আজ পিতাকে বলিয়া দিতে হইবে—এই তোমার পুত্র—পুত্রকে বলিয়া দিতে হইবে—এই তোমার পিতা! সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের মনে পড়িল—তাহার মাকে। আজ যদি মা কাছে থাকিতেন—কোনো ভাবনা থাকিত না তাহার! মা তাহার ঠিক চিনিতে পারিতেন। সে তাহার মায়ের আঁচল ধরিয়া বাবার কোলে গিয়া বসিত। অজয়ের মনে হইতে লাগিল—কোন মন্ত্র বলে যদি বয়সটা তাহার বছর পনর কমিয়া যাইত—তাহার বাবার কোলে চড়িয়া ছোট ছেলের আদর পুরাপুরি ভোগ করিয়া লইত।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল—ঘুম তাহার একটুও আসিল না। না—ঘুমাইবে না সে—সারারাত্রি ধরিয়া কত না কথা, কত না কল্পনার জাল বুনিয়া চলিতে লাগিল। কখন রাত্রির শেষে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিবে—কখন দিনের শেষে আবার সন্ধ্যা হইবে—এই শুধু তাহার প্রতীক্ষা।

সন্ধ্যার পর বিমলদা ও অজয় আসিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিলেন। নিচের তলায় অজয়কে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বিমলদা উপরে উঠিয়া গেলেন। একটু পরে নিচে নামিয়া আসিয়া ডাকিলেন—এসো অজয়! দোতলার একটি ঘরে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া কে একজন একখানা বই পড়িতেছিলেন। বয়সে তিনি প্রৌঢ়, মাথার চুল প্রায় আধাআধি পাকিয়া গিয়াছে—সারা মুখে কঠোর দুঃখ কষ্টের ছাপ যেন আঁকা রহিয়াছে। শরীর কিন্তু তাঁহার তথাপি মজবুত—দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা এখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। ঘরে উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বলিতেছিল। বিমলদা অজয়কে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সেইদিকে আঙুল তুলিয়া

বলিলেন—চিন্‌তে পারছো অজয়? অজয় কোন কথা না কহিয়া শুধু চিত্রার্পিতের মত সেইদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শব্দ পাইয়া অসিত মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। বিমলদা তাঁহার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিলেন—চিন্‌তে পারছেন না অসিতবাবু—ও যে অজয়—আপনার ছেলে।

মুহূর্ত মধ্যে অসিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন—মুখ দিয়া বাহির হইল—অঞ্জু—আমার অঞ্জুমণি! ছুটিয়া গিয়া অজয়কে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন। অজয় কোন কথাই কহিতে পারিল না—শুধু পিতার বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলদা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া দরজাটি বাহির হইতে টানিয়া দিলেন। পুনরায় বিমলদার সহিত যখন অজয় পথে নামিয়া আসিল—তখন পা তাহার মাটিতে পড়িতেছে কি শূন্যে হাঁটিয়া চলিয়াছে, সে খেয়াল তাহার ছিল না। তাহার মন বারে বারে আনন্দে ও গর্বে দুলিয়া উঠিতেছিল—এই তো তাহার পিতা—এমন পিতার সন্তানই তো সে! আর কিছু তার না থাক—পিতৃগর্ব সে সর্বসমক্ষে বুক ফুলাইয়া করিতে পারিবে।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

কয়েক মাস পরের কথা। আজ অনেক দিন পরে সন্ধ্যাবেলা বিমলদা আসিয়াছেন। অজয়, অপর্ণাকে লইয়া তিনি নানা আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—গান্ধীজী গভর্নমেণ্টের কূট চাল ধরে ফেলেছেন অজয়—রাউণ্ড টেবিল ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি তো তখন তোমায় বলেছি ভাই—গান্ধীজী রাজনীতিতে ছেলেমানুষ নন্‌—তাঁকে অত সহজে ভুলান যাবে না। মেকি স্বরাজের ফাঁদে তিনি কখনও পা দেবেন না। জাহাজেই তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন—ভারতের মাটিতে পা দেবার পূর্বেই। দেশে আবার পূর্ণভাবে আন্দোলন জেগে উঠেছে।

অজয় বলিল—কিন্তু আজ আমাদের কর্তব্য কি বিমলদা? আমরা কি দিনের পর দিন এমনি আত্মগোপন করে—পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব?

বিমলদা বলিলেন—সেই কথাই আজ আলোচনা করতে এসেছি ভাই।

এমনি করিয়া এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে বন্দী হইয়া থাকিতে অজয়ের মন আর কিছুতেই চাহিতেছিল না—সে রীতিমত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—গ্রেপ্তারের ভয় করে কোন লাভ নাই বিমলদা—যদি অনুমতি করেন আবার এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিমলদা হাসিয়া বলিলেন—অসহিষ্ণু হ'লে তো চলবে না ভাই—তোমার খোঁজ পেলে তো গভর্নমেণ্ট অমনি ছাড়বে না—বিনা বিচারে যে অনির্দিস্টকালের জন্য রাখবে আটকে—কি লাভ তাতে—দেশের কোন্ কাজটি করতে পারবে শুনি?

—কি তবে করতে চান?

—বলছি শোন্।

তারপর অপর্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমার কথাটা ভেবেছি বোন—ভেবে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।

অপর্ণা বলিল—পথটা কি?

—তোমাকে বিয়ে করতে হ'বে দিদি।

—বিয়ে? অপর্ণা অবাক হইয়া বিমলদার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হাসিয়া অজয়কে বলিলেন—তুমি ভেব না ভাই—তোমারও ঐ একই পথ। তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবাস—শ্রদ্ধা কর—এ আমি জানি। ভালবাসাকে গলা টিপে মারা বিপ্লবীদের শাস্ত্রে লেখে না—তারা চায় সংসার ভরে ভালবাসার সৃষ্টি করতে। তোমাদের বিয়ে করতে হ'বে। কিছু সংশয় মনে রেখো না বোন—কিছু অসম্মান এতে নাই অজয়। সে একদিন ছিল—যেদিন গুটিকয়েক মাত্র প্রাণী বেরিয়েছিলেন এই পথে—নিজেরা সন্ন্যাসী সেজে—সারাটা জীবন ধ'রে সাধনা করে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সে আজ কয়েক যুগের কথা। মস্ত বড় অলিখিত ইতিহাস আছে তার—তাঁদের কথা স্মরণ করে সব সময়েই আমরা মাথা নত করবো। কিন্তু ভাই এ পথ তো সন্ন্যাসীর পথ নয়—স্বাধীনতার কথা—ডালভাতের কথা। দেশের যে সংসারী শত সহস্র নরনারী শোষণে ও পীড়নে প্রতিদিন পশুর অধম জীবন যাপন করছে, তাদের কথা। তাই আজ এদের দুঃখ দূর করতে হ'লে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দিকে তাকালে চলবে না। যারা সংসারী তারাই করবে বিপ্লব—গাইবে মুক্ত মানবের সাম্যের জয়গান! তোমাদেরও সংসারী হতে হবে। আগামী সোমবার দিন রাত দশটার লগ্নে, তোমাদের বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে ফেলেছি। অমত কিন্তু করতে পারবে না দিদি। অপর্ণা কোন কথার জবাব না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিমলদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—কথা কিন্তু আমার এখনও শেষ হয়নি বোন—আজ আমি তোমাদের কাছে নানা অদ্ভুত প্রস্তাব এনে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করবো। বিয়ের পরেই তোমাদের দুইজনকেই এদেশ ছেড়ে যেতে হবে—সঙ্গে যাব আমি নিজে।

অজয় প্রশ্ন করিল—কোথায় যেতে হ'বে?

—প্রথমে মণিপুর হ'য়ে চিন্দুইন নদীর তীর ধরে চীনে—তারপর সেখান থেকে রাশিয়ায়।

অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল—এমনি করে স্বদেশ ছেড়ে যাওয়াই কি উচিত হবে বিমলদা?

—হাঁ হ'বে। শুধু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের জেলে পচার চেয়ে এতে অনেক কাজ হবে অজয়। বিদেশে নিজেদের দেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে প্রচারের দরকার আছে—তাছাড়া আরও নানা প্রয়োজনের কথা সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে।

বিমলদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তাহলে এবার চলি বোন। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে হাঁ কি না একটা কথাও তো শুনতে পেলাম না।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আজ কি আবার নূতন করে বলতে হবে দাদা—আমার নিজের সব ভার তো অনেক দিনই আপনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার হাঁ কি না-র জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে কেন?

বিমলদা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু দিদি, এ বিয়ের সম্বন্ধ যদি ভেঙে দিয়ে—ও পাড়ার শ্রীধর চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে করি—কেমন রাজি আছ তো?

অপর্ণা হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বিমলদা চলিয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া অপর্ণা অজয়ের কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। অজয় তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিল—মনে কোন দ্বিধা রেখো না অপর্ণা—দৃষ্টি যদি থাকে আমাদের উদার, সাহসে যদি থাকতে পারি দুর্জয়—আত্মসুখের কল্পনায় যদি না আমরা বিভোর হয়ে যাই—প্রেমের বন্ধন আমাদের নিচে নামিয়ে আনবে না বরং ঊর্ধ্বেই তুলে ধরবে। তোমার দাদা সমীর সেন যদি স্বর্গে থেকে দেখতে পান—দেখে সুখীই হবেন অপর্ণা! আজ যদি আমরা দুজনে বলতে পারি—

"উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।"

তবেই আমাদের প্রেম সার্থক হবে।

কাছাকাছি একটি বাড়িতে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে।

বাহিরে বাজিতেছিল রোশনচৌকী—আলোকমালায় বাড়িটি অত্যুজ্জ্বল করা হইয়াছিল। বিমলদার কিন্তু সাবধানতার অন্ত ছিল না—এক জোড়া নকল বর কনে পূর্ব হইতেই সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে অজয় ও অপর্ণাকে লইয়া বিমলদা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মত উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে বসিয়া কল্যাণী দেবী বরণডালা সাজাইতেছিলেন—অজয় অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—একি মা! তুমি এখানে? বলিয়া মায়ের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

কল্যাণী দেবী তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া অপর্ণার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—একা তোকে আদর করলে তো চলবে না অঞ্জু —এস মা আমার কাছে এসো—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! অপর্ণা প্রণাম করিয়া তাঁহার কোলের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী দেবী পিছনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন—ওঁকে তোরা প্রণাম করে আয় অঞ্জু।

অজয় পিছন ফিরিয়া দেখে—তাহার বাবা। আজিও সেদিনের মত চেয়ারে বসিয়া আছেন—হাতে তাঁহার কি একটা বই—কিন্তু তিনি নির্নিমেষ নয়নে তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন। অজয় তাঁহার দিকে আগাইয়া গিয়া ডাকিল—বাবা! অসিত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতেই অপর্ণা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি অপর্ণা ও অজয়কে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই চোখ দিয়া তাঁহার ঝর ঝর করিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে কিছুটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—এত বড় সুখের কল্পনা তো কোনদিন করিনি অঞ্জু— তোদের আমি এমনি ক'রে পাব! পঁচিশ বছর শেষ হ'তে যে আরও অনেক বাকী! পরে অপর্ণার মাথায় হাত রাখিয়া বলিতে লাগিলেন —তোমাকে আমি কি ব'লে আশীর্বাদ করবো অপর্ণা! আমার ভাব নাই—ভাষা নাই—দীর্ঘদিন সমাজ সভ্যতার বাইরে কাটিয়ে যে সব হারিয়ে ফেলেছি মা!

যথাসময়ে পুরোহিত আসিলেন—যথারীতি বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। এখন বিদায়ের পালা। আজই স্বদেশ ছাড়িয়া যাত্রা করিতে হইবে। বিমলদা দ্বারের বাহিরে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঘরের ভিতরে অসিত, কল্যাণী দেবী, অজয় ও অপর্ণা। কল্যাণী দেবীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। অসিত পুনরায় অজয় ও অপর্ণাকে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—বিচ্ছেদকে আমি দুঃখ ব'লে মানবো না অজয়। দুঃখ আমি অনেক সয়েছি—আরও হয়তো অনেক সইবো। তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা দুঃখ সহ্য করতে শেখো—পথ তোমাদের সুগম হোক্। অজয় ও অপর্ণা পুনরায় তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পনর দিন পরে—ইম্ফল হইতে প্রায় মাইল পঞ্চাশ দূরে চিন্দুইন নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছে তিনটি প্রাণী। বিমলদা আগে আগে মধ্যে অপর্ণা পিছনে অজয়। বিমলদা ও অজয় কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়াছেন—চায়ের ফ্লাস্ক—জলের পাত্র আর কিছু খাদ্য—কোমরে আছে এক জোড়া করিয়া পিস্তল। অসমান পাহাড়ী রাস্তা—বামে অতলস্পর্শী গহ্বর—দক্ষিণে পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমশঃ উঁচু হইয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া অনন্তকাল দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার কোথাও চড়াই—কোথাও উৎরাই—উঠিতে ও নামিতে পা একেবারে ধরিয়া যায়। এমনি রাস্তা ধরিয়াই প্রতিদিন তাহাদিগকে অন্তত-পক্ষে কুড়ি পঁচিশ মাইল করিয়া হাঁটিতে হইবে। গত রাত্রে মাইল পাঁচেক দূরে এক পাহাড়ীয়া পরিবারে তাহারা আশ্রয় লইয়া ছিল—আজ আরও কুড়ি মাইল অতিক্রম করিলে—তবে আর একটি আশ্রয় মিলিবার সম্ভাবনা আছে—পথের ভিতরে অন্য কোথাও আর আশ্রয় মিলিবে না। বেলা বোধ করি গোটা নয়েক হইবে। সোনালী সূর্যের আলোয় সারা পাহাড় ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে

গভীর নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে দুই একটি কি জাতীয় পাখী যেন—বিচিত্রসুরে ডাকিয়া উঠিতেছে—দুই একটি অজানা ফুলের গন্ধ আসিতেছে ভাসিয়া। বিমলদা চলিতে চলিতে গাহিয়া উঠিলেন—

—"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এল ঐ—
এল ঐ মুক্ত যুগান্তর······।"

সেই সঙ্গীত পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া—প্রতিকথা শতকথা হইয়া বাজিতে লাগিল।

—শেষ—